উদাসের নৌকা

নারায়ণ সান্যাল

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড

উৎসর্গ

প্রভাত কুমার ঘোষ

সুজনেষু

অবতরণিকা

ঝরাপাতা গো, আমি তোমারি দলে।
অনেক হাসি অনেক অশ্রুজলে
ফাগুন দিল বিদায়মন্ত্র আমার হিয়া তলে॥
ঝরাপাতা গো.........

—*রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

উপন্যাস

- দেবযানী
- নানা রঙের পুতুল
- অরণ্যছায়ায় ঘেরা
- পটভূমি
- সুখদুঃখের পদাবলী

গল্পের বই

- সপ্তদশী

এখন শীতকাল। ডিসেম্বর মাস। এই সময়ে যথেষ্ট শীত পড়ার কথা। কিন্তু তেমন শীত নেই। বরং বেলা হলে একটু গরম ভাব অনুভব করা যায়। বিগত কয়েকবছর ধরে এইরকম একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এর অর্থ একটাই, শীতের স্থায়িত্বকাল ক্রমশ কমছে এবং তার গভীরতাও। শীত আমাদের দেশে তিনমাস মাত্র। কিন্তু এভাবে যদি কমতে থাকে শীত, তাহলে তা শেষপর্যন্ত একমাসে দাঁড়াবে। শীত না থাকলে মাঠে ফসল ফলবে না। শীতের যে আরাম মানুষ পায় তার স্বাদ পাবে না। গোটা বিশ্ব জুড়ে গ্লোবাল ওয়ার্মিং চলছে। এটা যে অশনিসংকেত সব মানুষ বোঝে। বরফের পাহাড় গলে যাবে। সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস ঘটবে। নদীতে হবে প্লাবন। বহু জনপদ ভেসে যাবে। ডুবে যাবে। শেষ হবে।

উদাস হাঁটছে। সারা শীতকাল সে সাইকেলে চড়ে না। হেঁটে-হেঁটে গোটা শহর ঘুরে বেড়ায়। এ রাস্তা থেকে ওরাস্তা। শীতে হাঁটতে তার ভাল লাগে। কেমন একটা শীতলতা বাতাসে। হাফ সোয়েটার, তার সঙ্গে একটা চাদর, এই হল উদাসের পরিচ্ছদ। এর জোরে সে শীতকালটা কাটিয়ে দেয়। কোন অসুবিধে বোধ করে না। উদাস পাঞ্জাবী পাজামা পরে। আগে প্যান্ট এবং হাওয়াই শার্ট পড়ত। এখন সেটা ছেড়ে দিয়েছে। গ্রীষ্মে প্যান্ট-জামা কষ্টকর, পাঞ্জাবী পাজামা আরামদায়ক। আর গ্রীষ্ম, চোখ বন্ধ করে বলা যায় দীর্ঘ ন মাস। শীত! তিনমাস। তাও তার কোটা থেকে সময় কমে যাচ্ছে। শেষপর্যন্ত কি এটা হবে, গ্রীষ্ম এগারো মাস, শীত একমাস? হলেও অবশ্য অবাক হবার কিছু নেই। যেভাবে প্রকৃতি বদলাচ্ছে বা মানুষ তাকে বদলাতে বাধ্য করছে, তার জন্যে মানুষের নিয়তিতে অনেক দুর্ভোগ অপেক্ষা করছে।

উদাস যাচ্ছে বিদ্যাসাগর পল্লী। সে থাকে রেলওয়ে স্টেশনের কাছাকাছি এক পাড়ায়, যার ওয়ার্ড নম্বর কুড়ি। তাদের পাড়া সমৃদ্ধ অঞ্চল নয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং গরিব লোকের বসবাস। এই পাড়ার বেশির ভাগ মানুষ শ্রমজীবি। কেউ রিকশা চালায়, কেউ লেবার, কেউ রাজমিস্ত্রী বা কাঠের মিস্ত্রী, কেউ ছোটখাটো দোকানদার। মাটির বাড়ি, টিনের চালাঘর, টালিযুক্ত বাড়ি, দু-একটি দালান, এইসব দেখা যায়। চোখে পড়ে।

উদাসের নৌকা

উদাস এখন যে পল্লীতে যাচ্ছে, তা এস. পি. মোড় থেকে গড়িয়ে পশ্চিমদিকে নেমে গেছে। তারপর হাইওয়ে। হাইওয়ে পেরুলে গ্রামের পর গ্রাম। হাইওয়ের বুক চিরে ছুটে চলেছে, ট্রাক-, বাস, ট্যাক্সি, মোটর সাইকেল, স্কুটার। এক মুহূর্ত তাদের দাঁড়াবার সময় নেই। হুস হুস বেগের শব্দ শোনা যায়। রাস্তার এপার থেকে ওপার যাওয়া হেঁটে সহজ ব্যাপার নয়। পেরুবার আগে ভাল করে বাঁদিক, ডানদিক দেখে নিতে হয়, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে অথবা ছুটে রাস্তার ওপারে যেতে হয়। হাইওয়ে দুর্ঘটনাপ্রবণ। প্রায় বলি হয় মানুষ। তাই হাইওয়েকে কেউ কেউ বলেন, হায় হায় রোড।

এই বিদ্যাসাগর পল্লী ন'দশ বছর আগে ছিল ফাঁকা জমি। চাষের জমি। চরম চাষ হত। আশ্বিন মাসে ফসলের ডগা বাতাসে দোল খেত। অঘ্রাণের প্রথমে শিস নিয়ে ধানগাছগুলো বাতাসে লুটোপুটি খেত। সে এক মনোরম দৃশ্য। মনে হত, মা অন্নপূর্ণা যেন প্রকৃতির সঙ্গে খেলা করছেন। সে ধান দেখে মানুষের মনে আশ্বাস এবং ভরসা ভীড় করত। এখন সেসব ছবি উধাও। তার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখন সেসব জমির শরীরে গড়ে উঠেছে এক আধটা নয়, শত শত বাড়ি। যেদিকে তুমি তাকাও, বাড়ির লহরী শুধু। একতলা, দোতলা, তিনতলা। সাধারণ টাইপের বাড়ি নয়। হাল ফ্যাসানের বাড়ি। গ্রামে যাঁরা পয়সাওয়ালা লোক ছিলেন, তাঁরা এখানে বাড়ি করেছেন। আছেন শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী, ব্যাঙ্ক কর্মচারী, আয়কর অফিসের মানুষ, তাছাড়া আছেন অবসরপ্রাপ্ত মানুষরা। আছেন যাঁরা হয় তারা মধ্যবিত্ত অথবা উচ্চবিত্ত। গরীব বা নিম্ন মধ্যবিত্তের স্থান এখানে হয় না। ঠিক উদাসের পাড়ার বিপরীত পরিস্থিতি। এখানে জমির দাম আকাশছোঁয়া। গরিব বা নিম্নবিত্তের সাধ্য কি এত টাকা দিয়ে জমি কেনে! টাকা কোথায় তাদের! অতএব অন্য কোথাও যাও। অন্য কোথাও জায়গা দেখ। এখানে পা বাড়ালে তোমার ঠ্যাং জখম হবে। মনে গ্লানি।

উদাসের এক বন্ধু এখানে থাকে। সুনীল দে। সুনীল ব্যাঙ্কে কর্মরত। স্টেট ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্ক থেকে মোটা টাকা লোন পেয়েছে। তার দৌলতে ছিমছাম অথচ সুন্দর মোহময়ী এক দোতলা বাড়ি নির্মাণ করেছে সে। রাজমিস্ত্রী এখানকার নয়। প্ল্যান কলকাতার এক সুদক্ষ আর্কিটেক্টের এবং রাজমিস্ত্রী তার কনসার্নের। মোটা দক্ষিণা নিয়েছে তারা। তবে বাড়ি করেছে দেখবার মতো। পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উদাসের পরিচিত, এই পাড়াতে আর একজন থাকেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত মানুষ। গোপেন চৌধুরী। আশালতার বাবা। সে বাড়িতে আগে যেত উদাস। মাঝে মাঝে। এখন আর যাওয়া হয় না। তার এই না যাওয়া, একসময় কষ্ট দিয়েছে তাকে। তারপর যা হয়, সময় সইয়ে দিয়েছে। সময় মানুষের প্রভু।

আশালতা তার সঙ্গে পড়ত কলেজে। হিস্ট্রি অনার্স। উদাস এবং আশালতা বন্ধু হয়ে উঠেছিল। তারা বইপত্র এবং নোটস্ আদানপ্রদান করত। উদাসের বাড়তি বই কেনার সামর্থ্য নেই। সে সামর্থ্য আশালতার ছিল। সে প্রায়ই রেফারেন্স বই কিনত। উদাসকে দিত। উদাস নোটস্ তৈরি করে আশালতাকে দিত। এর ফলে দুজনে উপকৃত হচ্ছিল। পড়াশোনার অগ্রগতি ভাল হচ্ছিল। তখন লাস্ট ইয়ার। পরীক্ষা আসন্ন। হঠাৎ আশালতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। জানত না উদাস। আশালতা তাকে কিছু বলেনি। অন্য একজনের মুখে কলেজে শুনল। আশালতার বান্ধবী কাজল। সে বলল, তুমি কিছু জান না? সত্যি বলছ? তোমাকে বলেনি আশালতা?

—আমি সত্যিই জানি না কাজল। কোথায় বিয়ে, কবে বিয়ে, সে না বললে জানব কি করে?

—আমার ভারী আশ্চর্য লাগছে। তোমাকে গোপন করে গেল কেন আশালতা? তার বিয়ে হচ্ছে শিলিগুড়িতে। পাত্র কাঠ ব্যবসায়ী। বিশাল ধনী লোক। ট্রাক আছে। গাড়ি আছে। শিলিগুড়ি শহরে বিশাল বাড়ি। বেশ বড়মাপের বিয়ে হচ্ছে আশালতার। বলার মতো।

—বাঃ সুন্দর। শুনে ভাল লাগল কাজল। তবে খবরটা আশালতা নিজে বললে আরও ভাল লাগত।

—আমি আশালতাকে জিজ্ঞেস করব, কেন ও তোমাকে খবরটা গোপন করে গেল।

—না না কাজল, এ কাজ করো না। ও বলেনি, বলেনি। নিশ্চয় কোন অসুবিধা ছিল বলার। তাই বলেনি।

—সেই অসুবিধাটা জানতে চাইব।

—না, কোন দরকার নেই। তুমি ওকে কিছু বলো না কাজল। আমি বারণ করছি।

—বেশ তুমি যখন বারণ করছ, বলব না।

পরদিন বিদ্যাসাগর পল্লী গেল উদাস। আশালতার সঙ্গে আসন্ন পরীক্ষার পেপারগুলো নিয়ে আলোচনা করল। আশালতা অনেক কথা বলল, কিন্তু পরীক্ষার সাতদিন পর ওর বিয়ে হচ্ছে, একবারও উল্লেখ করল না। উদাসও কোন কথা তুলল না। আশালতার মা এলেন ঘরে। হাতে চায়ের কাপ এবং বিস্কুট। বললেন—চা খাও উদাস। উদাস চা পান করতে লাগল। বেশ ভাল চা। দামী পাতার চা। এর স্বাদ এবং গন্ধ দুই স্বতন্ত্র। এত ভাল চা উদাসের বাড়িতে হয় না। হওয়া সম্ভব না। তাদের আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট নয়। আশালতাদের আর্থিক অবস্থা বেশ ভাল। মজবুত। গোপেনবাবু ভাল পেনশন পান। আশালতার দাদা চাকরি করে। বিদেশি

কোম্পানিতে। বড় চাকরি। তাই অর্থের অপ্রতুলতা ওদের নেই, যেটা আছে উদাসদের, হাড়মজ্জায়। ঘরে বাইরে।

আশালতার মা বললেন—বাবা উদাস, তোমাকে একটা কথা বলি।

—বলুন।

—আশালতার বিয়ে ঠিক হয়েছে। পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর বিয়ে। তুমি বাবা আর আমাদের বাড়ি এসো না। বজ্রাহত হল উদাস। তোমার এই আসা-যাওয়া নিয়ে কথা উঠতে পারে। কে কোথায় খুঁচিয়ে বিয়ে ভেঙ্গে দেবে! কার মনে কি আছে বলা যায়! তাই বলছি উদাস, তুমি আর এসো না। আশালতার দিকে একবার তাকাল উদাস। সে এক মনে একটা বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছে। তবে পড়ছে না ঠিকই। উদাস ভাবল, আশালতা কিছু বলবে। বলবে, মা তুমি এসব কি বলছ? উদাস এল তো কি হল? কে কি বলল তাতে কি যায় আসে? না উদাস, তুমি আসবে। কেন আসবে না। না, এসব প্রত্যাশা বৃথা। আশালতা কিছু বলল না। চুপ। একদম চুপ।

—তুমি কি কিছু মনে করলে উদাস?

—না মাসীমা, এতে মনে করার কিছু নেই। আপনি যা বলছেন, ঠিক বলছেন। এমন তো হতেই পারে। সংসারে কি না ঘটে! আমি আসি বলে কথা উঠতে পারে। ঠিক আছে, আর আসব না। চা খাওয়া শেষ হয়েছে উদাসের। সে উঠে দাঁড়াল। বলল—চলি মাসীমা। চলি আশালতা।

—ঠিক আছে, এসো উদাস। মাসীমা বললেন। একটা কথাও উচ্চারিত হল না আশালতার মুখ থেকে। সে যেন একটা পাথর প্রতিমা। নিষ্প্রাণ অবয়ব। শূন্যতার প্রতিচ্ছবি।

বাড়ির সামনে বাগান। তার মাঝখানে কাঁকর দেওয়া সরু রাস্তা। পায়ে চলার পথ। সেটুকু অতিক্রম করে, বাড়ির গেট খুলে বেরিয়ে এসে, গেট লাগিয়ে দিয়ে বড় রাস্তায় পা দিল উদাস। গেটের পাশে এক নিমগাছ। তার পাতাগুলো হাওয়াতে কাঁপছে। উদাসের অন্তরটাও যেন কাঁপছে। কিন্তু কেন?

॥২॥

সুনীল বাড়িতে ছিল। আগে থেকে কথা ছিল। বলেছিল সুনীল—তুমি এগারোটা নাগাদ বাড়িতে এসো রবিবারে। তখন কথা হবে, আমার বাড়িটা হচ্ছে বলে যে ডিরেকশনটা দিল সুনীল, তা শুনে বলল উদাস—আমি এলাকাটা চিনি।

—কি করে?

—গোপেন চৌধুরীর বাড়ি গেছি আমি। অনেকবার গেছি।

—কি কারণে?

—গোপেনবাবুর মেয়ে আশালতা আমার সঙ্গে হিস্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ত। এখন আশালতার বিয়ে হয়ে গেছে।

—ও হো, মনে পড়েছে, পাড়াসূত্রে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল আশালতার বিয়েতে। আমি যেতে পারিনি। তবে আমার স্ত্রী, আর মেয়ে গেছিল। শিলিগুড়িতে না কোথায় যেন বিয়ে হয়েছে?

—হ্যাঁ, সেইরকম শুনেছি। আশালতা উদাসকে বিয়ের নিমন্ত্রণ পর্যন্ত করেনি। সে করেনি বা আশালতার মা করতে দেয়নি, তা জানে না উদাস। তবে জানে, ঐ বাড়ির দরজা তার সামনে বন্ধ হয়ে গেছে। চিরদিনের মতো। তবে এর জন্যে উদাস দায়ী নয়, এটাই সান্ত্বনা। সে কোন অন্যায় করেনি। করলে তার বিবেকদংশন হতো। এব্যাপারে তার কোন বিকার নেই। দুঃখ নেই। হতাশা নেই।

সুনীলের বাড়ি থেকে ফিরে আসার সময় যে রাস্তাটা চলে গেছে গোপেন চৌধুরীর বাড়ি হয়ে, বড় রাস্তায় মিশেছে, সেই রাস্তায় ফিরতে ফিরতে দেখতে পেল উদাস, গোপেন চৌধুরী শীতের রোদে গার্ডেন চেয়ারে বসে, একটা বই পড়ছেন। ভদ্রলোক ভাল পড়ুয়া। প্রায়সময় তাঁকে বই পড়তে দেখা যায়। গল্প, প্রবন্ধ, উপন্যাস, কবিতা সব ধরনের বইতে তাঁর রুচি। একথা উদাস জেনেছে আশালতার কাছ থেকে। বাবার কথা বলতে সে উৎসাহী। কিন্তু মায়ের কথা বলে না। উদাস জেনেছে, এই পরিবারে আশালতার মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে জোরালো। তাঁর নির্দেশমতো পরিবারটি চলে। গোপেন চৌধুরী সব ব্যাপারে স্ত্রীর উপর নির্ভরশীল। পারিবারিক ব্যাপারে গোপেন চৌধুরী কোন তর্কবিতর্কে যান না, স্ত্রী যা সিদ্ধান্ত করেন, মেনে চলেন। এর একটা দিক ভাল, পারিবারিক শান্তি বজায় আছে যেমন, অন্যদিকে গোপেনবাবু পড়াশোনা নিয়ে মগ্ন থাকার সুযোগ পেয়েছেন। গোপেনবা' বাড়ির একটা কাজ করেন। হাট বাজার। কোনদিন এস. পি. মোড়ের বাজার অথবা কোনদিন কোর্ট প্রাঙ্গণের বাজারে তাঁকে দেখা যায়। হাতে একটা স্লিপ। তাঁর স্ত্রীর তৈরি করা। তা মিলিয়ে মিলিয়ে বাজার করছেন গোপেনবাবু। শুধু আইটেম নয়, কোন জিনিস কত পরিমাণে, তাও লিখে দেন পূরবী চৌধুরী, আশালতার মা। তাঁর কথার বাইরে যাওয়ার সাধ্য গোপেনবাবুর নেই। তাঁর চেষ্টাও নেই। ইচ্ছে তো নয়ই।

বাজার করে মোপেড গাড়িতে দুপাশে দুটি ব্যাগ বেঁধে নিয়ে গোপেনবাবু রওনা দেন বাড়ির দিকে। হালকা গাড়ি। গোপেনবাবু চালানও হালকা চালে। রাস্তাঘাটে সবসময় ভীড়। বেলা দশটা নাগাদ রাস্তাঘাটে চলা কঠিন হয়ে পড়ে। মানুষ তখন অফিস যাচ্ছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে, কোর্টে উকিল যাচ্ছে, তার পিছনে মক্কেল, কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাইকেলে করে কলেজ যাচ্ছে। একটার পর একটা বাস এসে

পুরসভার অফিসের সামনে ভুঁড়ো পেট থেকে যাত্রী নামিয়ে, পেট হালকা করে ছুটে চলেছে বাসস্ট্যাণ্ডের দিকে, তার ফাঁকে ফাঁকে ট্যাক্সি, কত কত মানুষ গ্রাম থেকে শহরে আসছে নানা কাজে। না এসে উপায় নেই। দেশে মানুষ বাড়ছে নিরন্তর। এত মানুষ কেন, উদাস ভাবতে খেই হারিয়ে ফেলে। মানুষ একশো কোটি পেরিয়ে গেছে, একসময় দুশো কোটিতে পৌঁছে যাবে, তখন কি হবে, ভাবতে ভয় করে উদাসের। তখন কি দেশ জনবিস্ফোরণে গুঁড়িয়ে যাবে?

উদাস সুনীলের বাড়ি পৌঁছে গেল এগারোটায়। ওবাড়ি থেকে বেরিয়েছিল ঠিক দশটায়। সুনীলের টাইম ছিল এগারোটায়। যাক, কথার খেলাপ হয়নি। সুনীলের বাড়িটা অতি চমৎকার। যেমন বাড়ির রং, তেমনই সৌষ্ঠব। তাকিয়ে দেখতেই হয়। না, সুনীলের রুচি আছে বলতে হবে। বাড়ির নাম—আরণ্যক। এমন একটা বাড়ির মালিক উদাস কি কোনদিন হতে পারবে? আপন মনে হাসল উদাস।

সুনীলের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হল। তার মেয়ের সঙ্গেও। স্ত্রী সুশ্রী। দেখলে বোঝা যায়, পরিশীলিত আধুনিক মহিলা। তার কথার স্টাইল সুন্দর। উদাসের পোশাক-আশাক সাধারণ। পাঞ্জাবীর উপর একটা হাফ সোয়েটার। তার উপর একটা চাদর। চাদরটা সাধারণ মানের। দামী কিছু নয়। সুনীলের ড্রইং রুমে একটা সোফাতে বসে সে। নিজের মধ্যে একটা অস্বস্তি অনুভব করল উদাস। সে নিজেকে বোঝাল, এটা তো হতেই পারে। এই সময় দীপা, সুনীলের স্ত্রী, চা এবং পাঁপড়ভাজা নিয়ে এল। সেগুলো খেতে খেতে, তার চমৎকার স্বাদ উপভোগ করল উদাস। সে সুনীলকে বলল—আমার কথা বলেছিলে?

—তোমার সব কথা বলেছি মামাবাবুকে। টেলিফোনে কথাবার্তা হয়েছে। মামাবাবু, তোমাকে জয়েন করতে বলেছেন নতুন বছরে। পয়লা জানুয়ারি। সেদিন তো রবিবার পড়েছে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব সাইটে। এই দশটা নাগাদ তুমি চলে এসো আমার কাছে। দুজনে মোটর সাইকেলে চলে যাব। মামাবাবু থাকবেন। তুমি কাজপত্র সব বুঝে নেবে। সেদিনই তোমার স্যালারি বলে দেবেন মামাবাবু। আমি বলেছি, যতটা সম্ভব তোমাকে যেন বেশি দেওয়া হয়। মামাবাবু বলেছেন—চেষ্টা করব। কাজটাও একটু দেখতে হবে।

উদাস ফেরবার সময় দেখল গোপেনবাবু, আশালতার বাবা বই পড়ছেন। বাড়ির বাগানে অথবা বারান্দায় কেউ নেই। পূরবী দেবী বা আশালতা কাউকে দেখা গেল না। তারা কি ভিতরে আছে? তারপর মনে পড়ল, আশালতার থাকার কথা নয়। তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার থাকার কথা শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়িতে। তবু উদাস আশা করছিল, যদি বাপের বাড়ি এসে থাকে আশালতা! আর যদি এসে থাকে, যদি দেখা হয়, এটা সুনিশ্চিত, আশালতা ওকে ডাকবে না। তার মায়ের বারণ আছে। আর

ডাকলেও কি যেতে পারবে উদাস? সে তো কথা দিয়েছে পূরবীদেবীকে, আর সে যাবে না। না উদাস সত্যভঙ্গ করতে পারে না।

বাড়ি ফিরে যাচ্ছে উদাস। এস. পি. মোড়ের ওখানে বেশ ভীড়। মোটর সাইকেল, ট্রাক, বাস থিকথিক করছে। ট্রাফিক পুলিশ ভীড় সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে। হেঁটেই যেত উদাস। সে হাঁটার মাস্টার। কিন্তু দেখল, একটা বাস দাঁড়িয়ে। আটকে পড়েছে। তার ইঞ্জিনের শব্দ ঘড়ঘড়। গাড়িটা বাসস্ট্যাণ্ড যাচ্ছে। দক্ষিণমুখের সব বাস বাসস্ট্যাণ্ড যায়। দুমকা থেকে আসা বাসটিতে উঠে পড়ল উদাস। একটু পরে যানজটমুক্ত হল তার বাস। বাসটা জ্যামমুক্ত হয়ে হু হু করে ছুটে চলে স্ট্যাণ্ডের দিকে। খুব সম্ভব বাসটি স্ট্যাণ্ডে গিয়ে, পেট থেকে লোক খালাস করে, আবার যাত্রী নিয়ে ফিরে যাবে দুমকা। দেরী হলে অন্য বাস তার প্যাসেঞ্জার নিয়ে নেবে। তার সুযোগ সে অন্যাকে দিতে পারে না। বাসস্ট্যাণ্ড দশ মিনিটে পৌঁছে গেল উদাস। কন্ডাকটরকে পয়সা দিল। তারপর বাকি পথটুকু সে হেঁটেই যাবে মনে করে হাঁটতে লাগল। তার হাঁটতে ভাল লাগে। বিশেষ করে শীতকালে। আনন্দময় হাঁটা। এক সুখের স্বাদ।

॥৩॥

বাড়ি পৌঁছে খাওয়া-দাওয়া করতে বেলা দুটো হয়ে গেল। খাবার সময় মা বললেন—তা হ্যাঁরে, দেখা হল তোর বন্ধুর সঙ্গে? কাজের কথা কিছু হল?

—হ্যাঁ মা, দেখা হয়েছে। কথা হয়েছে। সামনের মাসে এক তারিখে জয়েন করতে হবে। বলল সুনীল।

—তা টাকা পয়সা?

—সেদিনই বলবেন দেবেশ দত্ত। সুনীলের মামা। তাঁকে আমি চোখে এখনো দেখিনি। সুনীল বলছিল, ওর মামা লোক ভাল। তাঁর কাছে আমি ভালই থাকব।

—তাই যেন করেন ঠাকুর। তোর জন্যে আমার বড় ভাবনা হয় বাবা। সবসময় হয়।

—কেন চাকরি পাইনি বলে? মা, আমার মতো লক্ষ লক্ষ ছেলে বেকার। তাদের কোয়ালিফিকেশন আছে, পরিশ্রম করার শক্তি আছে, কিন্তু কাজ পাবার কোন সুযোগ নেই। কোথাও কোন চাকরি-বাকরি নেই। ঘর থেকে বেরুলেই তুমি দুটো জিনিস দেখতে পাবে, গরিব মানুষ আর বেকার ছেলেমেয়ে। সর্বত্র এটা পাবে। দেশের যে প্রান্তে তুমি যাও না কেন। হাসল উদাস। আমরাও তো গরিব মা। কোনরকমে আমরা দুটো ভাত-কাপড় পাই। জমানো টাকা নেই আমাদের। হঠাৎ অসুখ-বিসুখ বড় কিছু হলে, আমরা বিপদে পড়ে যাব।

—হ্যাঁ বাবা, সেই চিন্তাতেই মরি। তোর একটা ব্যবস্থা যদি হয় কাজের, মরার আগে যদি দেখে যেতে পারি, তাহলে শান্তিতে চোখ বন্ধ করতে পারব। নইলে মরেও শান্তি পাব না।

—মা, দিনরাত মরার কথা বলো না তো। বাঁচার কথা ভাব। এত ভেঙে পড়লে চলে মা? নাও চোখ মোছ। মা আঁচলের প্রান্ত দিয়ে চোখ মোছেন।

উদাসের একটা চাকরি দরকার। খুবই দরকার। ইতিহাসে অনার্স করেছে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোন চাকরি পায়নি। সেই বেকার। উদাসের মা ঠোঙা তৈরি করেন। সুপারি কাটেন। তাতে সামান্য কিছু আয় হয়। উদাস বাড়িতে সকালে টিউশনির টোল খুলেছে। সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে ন'টা পর্যন্ত সে পড়ায় বাচ্চাদের ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। অঙ্ক, বাংলা ইংরাজি, বিজ্ঞান। তার টোলে ছাত্রছাত্রী অনেক। সে তুলনায় টাকা পয়সা পায় না। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীরা গরিব ঘরের। তারা ঠিকঠাক পয়সা দিতে পারে না। দুবেলা পেটভরে খেতে পায় না, টিউশনির টাকা দেবে কি করে? উদাস ওদের কিছু বলে না। আহা, ওরা না হয় টাকা দিতে পারে না, তাই বলে শিক্ষালাভ থেকে বঞ্চিত হবে কেন? উদাস শিক্ষিত ছেলে। তার একটা সামাজিক দায়দায়িত্ব আছে। সে দায়িত্ব সে স্বীকার করে। শিক্ষার অধিকার সবার। গরিব বলে সে লেখাপড়া শিখতে পারবে না? উদাস সিনসিয়ারলি পড়ায়। কোনরকম ফাঁকি দেয় না। এটা ভেবে সে আরাম পায়, তার ছেলে-মেয়েরা শিখছে, উন্নতি করছে, অনেক কিছু জানতে পারছে, বুঝতে পারছে। ছাত্র যদি ঠিকঠাক শেখে, গুরুর আনন্দ সেটাই। সেই আনন্দে বিভোর উদাস। শনি-রবিবার তার ছুটি। টোল বন্ধ। ছাত্রছাত্রীদের হোম টাস্ক দিয়ে দেয়। তারা বাড়িতে প্র্যাকটিশ করে। সোমবারে সবকিছু বুঝে নেয়। তার টোলে কোনরকম শাস্তির ব্যবস্থা নেই। নীলডাউন নেই, কান ধরে ওঠাবসা নেই, ছড়ির আঘাত নেই, বকাবকি নেই। উদাস সে ছেলেকে বোঝায়। বারবার বোঝায়। শিক্ষকের ভালবাসা পেয়ে সে ছাত্র আরও মনোযোগী হয়। আরও চেষ্টা করে। উদাস শিক্ষাদানের যে উদার পরিবেশ রচনা করেছে, তাতে ভাল সাড়া পায়। উদাসের মন ভরে ওঠে। শিশুদের শেখাতে হলে, শাস্তি নয়, দরকার ভালবাসার। ভালবাসায় সবকিছু হয়। উদাসের টিউশনিতে ছেলেমেয়েরা কামাই করে না। আনন্দপাঠে তারা প্রতিদিন হাজির। শিক্ষক হিসাবে উদাসের নাম ব্যপ্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রছাত্রী বাড়ছে। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা আসছে। তাদের মা বাবারা উদাসের উপর আস্থা রাখছেন। এখানে ছেলেরা শেখে, শিক্ষা পায়, মনে করেন অভিভাবকরা। দেখেশুনে তৃপ্তি পায় উদাস।

কিন্তু এই আয়ে তো সংসার চলে না। ঠিকঠাক চলে না। আরও টাকা পয়সার প্রয়োজন। উদাসের বাবা পতিতপাবন মণ্ডল একটা দোকান করতেন। তাতে

মনোহারীর মাল যেমন থাকত, তেমন লটকনার দ্রব্যাদি। তবে দোকানটা হৈ হৈ করে চলত না। মোটামুটি চলত। তার আয়ে একটা ছোটখাট দু কামরার বাড়ি পতিতপাবন করেছিলেন। গ্রীষ্মের দিনে সে একতলা ঘর উত্তপ্ত হতো। শীতের দিনে শীতল। রান্নাঘরটা ছিল খড়ের। খুব গরম পড়লে সে ঘরে দড়ির খাট পেতে ঘুমুতে হতো। পতিতপাবনের বড় আশা ছিল, ছেলে লেখাপড়া অন্তে একটা চাকরি পেয়ে যাবে ঠিক। সংসারে আর্থিক উন্নতি হবে। সংসারে টাকাটাই সব। টাকা না থাকলে সব শূন্য। দোতলা দালান ঘর হবে। ঘরে টিভি, ফ্রিজ হবে, দামি খাট হবে, আলমারী হবে। ছেলের বিয়ে দেবেন। নাতি বা নাতনি কোলে নেবেন। না, এর কোনটাই হয়নি। চাকরি পায়নি উদাস। চেষ্টা করেও না। অগত্যা টিউশনির টোল খুলতে হয়েছে। বাবার মৃত্যুর পর পরিচিত একজনকে দোকানটা লিজ দিতে হয়েছে। মাসে মাসে কিছু টাকা পাওয়া যায়। উদাস দোকানে বসতে পারত। পারেনি এ কারণে তার কোন ব্যবসাবুদ্ধি নেই, সংসারে সবাই কি সব পারে? উদাস কিছুটা ছটফটে মানুষ। এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে পছন্দ করে। রেলওয়ে স্টেশন কাছেই। স্টেশনের বেঞ্চে বসে থাকে। ট্রেন দেখে। মানুষ দেখে। প্রকৃতি দেখতে সে ছুটে যায় ময়ূরাক্ষীর তীরে। তার জলকে ছোঁয়। পানকৌড়ির জলে ভাসা দেখে। তার জলে ডোবে তারা আবার ভেসে ওঠে। নদীর তীরে তীরে যে গাছপালা, তার ডালে ডালে পাখির কোলাহল। আকাশে ওড়াওড়ি। আগে কিছু গাছপালা আরও বেশি ছিল। মানুষের লোভে তারা আত্মবলি দিয়েছে। প্রকৃতিকে হত্যা করে মানুষের আনন্দ। দূরের মাঠে শরবন। সব মিলিয়ে এক আশ্চর্য প্রশান্তি। একটা স্নিগ্ধতা। উদাস প্রাণভরে নিঃশ্বাস নেয়। শহরের বাতাসে বিষ থাকে। এখানে অমৃত।

দুপুরে উদাস খবরের কাগজ পড়ে। একজনের বাড়ি থেকে চেয়ে আনে। আবার বিকেলে ফেরৎ দেয়। তার মা দুপুরে কোনদিন ঘুমোন না। বসে বসে ঠোঙ্গা তৈরি করেন। সুপারি কাটেন। বড়ি দেন। দোকানদারের লোক সেগুলো নিয়ে যায়। পয়সা মিটিয়ে দেয়। মা খুব যত্ন করে পয়সাগুলো নেন। বড় দুঃখ এবং কষ্টের টাকা। সংসারে টাকা যতই অনর্থের মূল হোক না কেন, অর্থ ছাড়া সংসার জল অচল। পৃথিবীও ঘোরে না।

॥ ৪ ॥

মার্চ মাস এসে গেল। বেশ গরম পড়ে গেছে। আবহাওয়াবিদ্‌দের মতে, যত দিন যাবে পৃথিবীতে গরমের পরিমাণ এবং স্থায়িত্ব দুই বাড়বে। মেরুপ্রদেশের বরফ গলবে। সমুদ্রের জল বাড়বে। তার ফলে নদী উত্তাল হবে। সে ডোবাবে মানুষ, ঘর, বাড়ি। এখন সে সুন্দরবনকে গ্রাস করছে। কয়েকটি দ্বীপ ডুবিয়েছে। বছর তিরিশের

মধ্যে সব দ্বীপকে জলের তলায় পৌঁছে দেবে। সলিল সমাধি। সৃষ্টির ধ্বংসের সূচনা এইভাবে হয়।

এর আগে ডিসেম্বরে শীত পড়ল না। জানুয়ারির মাঝামাঝি তার কোন পাত্তা পাওয়া গেল না। কিন্তু হঠাৎ জানুয়ারির শেষ দিকে এবং ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে শীত পড়ে গেল। কনকনে বাতাস। ঝড়ো হাওয়া। বরফ পতন, বৃষ্টি সব একসঙ্গে হাজির। মানুষকে দুরমুশ করে ছেড়ে দিল। পাহাড়ী এলাকায় বহু লোক মারা গেল। মারা গেল মানুষ সমতলের, বিহার ঝাড়খণ্ড উত্তরপ্রদেশ রাজস্থানেও। যারা মারা গেল তারা গরিব। ভাল খাদ্য নেই, শীতবস্ত্র নেই, মৃত্যু ছাড়া গতি কি?

আবার ফেব্রুয়ারির শেষে গরম এসে গেল। শীতের মহানির্বাণ যাত্রা। গরম বাড়তে বাড়তে মার্চ মাসে কঠিন হয়ে গেল। পুকুর নদী বিল নালা সব শুকাতে শুরু করল। জলকষ্ট দেখা দিল। এই জলকষ্ট দিনে দিনে বাড়বে, বুঝল উদাস।

কথামতো জয়েন করেছে 'শিল্পা ব্রিকস্' কোম্পানিতে উদাস। এই কনসার্নটা সুনীলের মামা দেবেশ দত্তের। তিনি বড় ব্যবসায়ী। নামকরা। তাঁর বাস আছে একাধিক, প্রমোটিং আছে, তারপর ইট ব্যবসা। তাঁর কত টাকা কেউ জানে না। সুনীলও না। সে বলে— মামাবাবুর টাকার পরিমাণ আমার অজানা। শুধু জানি, মামাবাবুর প্রচুর সোনার বিস্কুট আছে। মামীমা ব্যাঙ্কের লকারে গিয়ে সেগুলো গুণে গুণে দেখেন, কত বাড়ল। দেবেশবাবু সুনীলের নিজের মামা নন। সম্পর্কে মামা। শোনা যায়, মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক মধুর হয় না। মহাভারত-এর প্রমাণ। কিন্তু এ তথ্য সুনীল বা দেবেশবাবুর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। মামাবাবুকে ধরলে, সেটা সাধ্যে থাকলে মামাবাবু কাজ করে দেন সুনীলের। দেবেশবাবুর কানেকশন অনেক। উপরমহলে খাতির আছে। এসব কথা সব ধনীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কোন সরকার গরিবদের দেখতে পারে না, শুধু তাদের ভোটটি ছাড়া। তাদের যত ভালবাসা ধনীদের সঙ্গে। শিল্পপতির সঙ্গে। সেখানে লাভ আছে। সুখের ব্যবস্থা আছে।

উদাসের ডিউটি পড়েছে প্রতিদিন বেলা বারোটা থেকে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত। একমাত্র ছুটি রবিবার। বাকি দিন ছুটি নিতে গেলে দেবেশবাবুর পারমিশন লাগবে। মাইনে যা বললেন দেবেশবাবু, তা খুব ভাল নয়, আবার খারাপও নয়। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল উদাস। না হয়ে উপায় কি? সে হিসাব করে দেখল, সকালে তার টিউশনির টোল ঠিক থাকছে। বেলা ন'টা পর্যন্ত। তারপর হাতে থাকছে তিন ঘণ্টা। তার মধ্যে বাজার-হাট করা যাবে। স্নানাহার সেরে সাড়ে এগারোটার বাস ধরলে দিব্যি বারোটার মধ্যে পৌঁছে যাবে সাইট। সাইটটা হচ্চে ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী এক গ্রামের ধারে বেশ কিছু জমিতে। এগুলো অকৃষি জমি। কৃষিকে হত্যা করে শিল্প নয়। কৃষক না বাঁচলে দেশ বাঁচে না। এক দালালের মাধ্যমে জমিগুলো কিনেছেন

দেবেশবাবু। তিনি গ্রাম্য মোড়ল। ভাল দাম দিয়েছেন। কোথাও কোন অভিযোগ নেই।

তারপর ব্যবসা করেছেন চিমনি ইঁটের। এটা তাঁর স্থায়ী প্রজেক্ট। কিছু স্থানীয় লেবার আছে। স্থানীয়কে বাদ দিয়ে কোনকিছু হয় না। এছাড়া আছে বিহার আসাম এবং ঝাড়খণ্ডের লেবার। শতাধিক লোক কাজ করে। তৈরি ইঁট চলে যাচ্ছে আসানসোল দুর্গাপুর সন্নিহিত এলাকায়। সেখানে ব্যাপক বাড়ি নির্মাণ হচ্ছে। স্থানীয় বাজারেও মাল ছাড়া হচ্ছে। সর্বত্রই বাড়ি নির্মাণের হিড়িক। চাষের জমি ভরিয়ে ফেলার প্রতিযোগিতা। শিল্পা দেবেশবাবুর বড় মেয়ে। তার বিয়ে হয়েছে এক ধনাঢ্য পরিবারে। বড়লোকের বিয়ে গরিবের ঘরে হয় না কখনো। বড়লোক বড়লোকই খোঁজে। মেজ মেয়ের বিয়ে হয়েছে জামশেদপুরে। তারাও ব্যবসায়ী। ছোট মেয়ে পড়াশোনা করে।

উদাসের কাজ হওয়াতে বড় খুশী হলেন মা। যাই হোক, সংসারের আয় বাড়ল। হতে পারে বেসরকারি কাজ, পরিশ্রমের কাজ, ছুটিছাটা নেই, তবু মাস গেলে টাকা পাওয়া যাবে। এই সংসারে এখন টাকাপয়সার বড় দরকার। এতদিন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সংসার চলছিল, এবার থেকে তার গতি মসৃণ হবে। অতটা কষ্ট আর থাকবে না। উদাসকে নিয়ে তার মায়ের বড় চিন্তা। রাত্রে ঘুম হয় না। বড় ভাল ছেলে, শান্ত ছেলে উদাস, ঠিক ওর বাবার মতো। কোন ঝুট ঝামেলায় নেই। কত ছেলের কত বদনাম, মদ্যপায়ী গাঁজাখোর সমাজবিরোধী ঠকবাজ গুন্ডা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু উদাসের নামে একটা শব্দও প্রযোজ্য নয়। ছেলেকে নিয়ে উদাসের মায়ের গর্ব আছে! ছেলেমেয়ে বদমাশ হলে মা বাবার যে কত বেদনা, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সে মা বাবাকে লোকের কাছে নিচু হয়ে থাকতে হয়। কথায় কথায় লোকে বলে, শুনতে হয়—যান যান, আপনি কত ভদ্রলোক জানা আছে। ওই তো আপনার ছেলে, তাকে দেখেই বুঝছি আপনি কেমন মানুষ, কেমন আপনার পরিবার, ছিঃ ছিঃ আপনার গলায় দড়ি জোটে না! দড়ি কেনার পয়সা নেই বুঝি? ঠিক আছে, আমরা চাঁদা করে দড়ি কিনে দিচ্ছি।

উদাসের বাবা পতিতপাবন মণ্ডল সারাদিন দোকানেই থাকতেন। টুকটাক ব্যবসা চলত। কখনও কারুর কাছে বেশি দাম নিতেন না। ন্যায্য লাভ করতেন। প্রতারণাকে মহাপাপ মনে করতেন। শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও যেতেন না। যাওয়ার দরকার হতো না। এজেণ্ট অর্ডার নিয়ে দোকানে মাল পৌঁছে দিত। পতিতপাবন পেমেণ্ট করে দিতেন। ধারবাকী রাখতেন না। বলতেন—'ধারবাকী করে, যদি হঠাৎ মারা যাই, তোমার টাকাটার কি হবে! সেটা আমার পাপ। না বাপু, তুমি তোমার পাওনা টাকা নিয়ে যাও। আমাকে মুক্তি দাও।

পতিতপাবন শনিবার একবেলা দোকান করে সন্ধ্যাবেলা কালীমন্দিরে চলে যেতেন। আবার একবার রবিবার সকালে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম কোনদিন হয়েছে কিনা উদাস জানে না। মা সৌদামিনীও না। মন্দিরটা এ পাড়া থেকে অনেকটা দূর। বলতে গেলে শহরের মাঝখানে। এক ক্লাবের প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী মায়ের কালীমন্দির। প্রচলিত মন্দিরের পাশে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ চলছে। ঠিক দক্ষিণেশ্বরের আদলে। সে এক দেখার জিনিস। কি বিরাট উঁচু। সে মন্দির নির্মাণে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হচ্ছে। ভক্ত মানুষরা দুহাতে অর্থদান করছেন। কেউ না বলছেন না। মায়ের কাজ মা নিজে করে নিচ্ছেন।

তা পতিতপাবন হাঁটতে পারেন বটে। এ পাড়ায় বাস দাঁড়ায়। স্টপেজ আছে। কিন্তু পতিতপাবন বাসে ওঠেন না। ঠিক পায়ে হেঁটে যাবেন, হেঁটে ফিরবেন। মায়ের কাছে যাচ্ছেন। একটু কষ্ট করবেন না? যখন ফেরেন তাঁর কপালে সিঁদুর। হাতে প্রসাদের প্যাকেট। মুখে এক অপার্থিব তৃপ্তি। পতিতপাবন শুধু নিজে যান না, স্ত্রীকে ধরে নিয়ে যান। প্রতি অমাবস্যায় কালীমন্দিরে বিশেষ পূজাপাঠ হয়। সেদিন মন্দিরে ভীড় বেশ বেশি। পতিতপাবন স্ত্রীকে বলেন—চল আমার সঙ্গে। স্ত্রী খুশি হয়ে বলেন—হ্যাঁ চল চল। মায়ের কাছে যাই।

অত কষ্ট করে হেঁটে যেতে পারবেন না সৌদামিনী। হাঁটুতে ব্যথা আছে। বেশি হাঁটলে জানান দেয়। বাসে বড় ভিড়। দাঁড়িয়ে যাওয়ার শক্তি নেই। তখন পতিতপাবন রিক্সা করেন। এ-পাড়ায় অনেক রিক্সা, অনেকে রিক্সার চালক, সবাই চেনা পতিতপাবনের। যাকে ডাকেন সেই দৌড়ে আসে। পৌঁছে দেয় কালীমন্দিরে। ভাড়া নেয় নামমাত্র। যা হওয়া উচিত, তার হাফও নয়।

তা শেষজীবনে মা বাবা কালীভক্ত হয়ে গেলেন। উদাস মনে করে, ধর্মবোধ ভাল। ধর্মের প্রতি সব মানুষের টান থাকা উচিত। যদি ধর্মবোধ থাকে, তাকে পাপ করার আগে দুবার ভাবতে হয়। সেই বাবা হঠাৎ চলে গেলেন। বাবার ছিল হাই প্রেসার, ডায়াবেটিস দেখা দিয়েছিল, বুকে একটু আধটু ব্যথা হত যখন তখন, ডাক্তার দেখানো হয়েছিল, কিন্তু বাবার ওষুধ খেতে অনীহা। তার ফল ফলে গেল। দৌড়ে ডাক্তার ডাকতে গেল উদাস। ডাক্তার পাওয়া গেল না। বুবুন বলল—আমি দেখছি উদাসদা। সাইকেল নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল বুবুন। রিক্সা করে এক ডাক্তারকে ধরে আনল। বুবুন অসাধ্যসাধন করতে পারে। ডাক্তার এসে বাবাকে পরীক্ষা করলেন। দেখার কিছু ছিল না অবশ্য। তখন বাবা মহাপ্রস্থানের যাত্রী। মা পাশে বসে। আশে-পাশের অনেক প্রতিবেশী ঘরের মধ্যে ভিড় করেছে। ডাক্তারবাবু ব্যাগ থেকে বের করে দুটো ইঞ্জেকশন করলেন। তারপর উদাসকে বললেন—যা করার ছিল, করলাম। এর বেশি কিছু করার নেই। ডাক্তারবাবু ব্যাগ গুছিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বুবুন

সঙ্গো গেল। ডাক্তারবাবুকে পৌঁছে দিতে। এরপর কতক্ষণ বেঁচে রইলেন বাবা? পতিতপাবন মণ্ডল? বড়জোর মিনিট কুড়ি। তারপর হেঁচকি উঠল। কয়েকটা হেঁচকি তুলে পতিতপাবন থেমে গেলেন। তারপর ঘাড় কাৎ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ। মা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। উদাস ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। দেখল, প্রতিদিনকার মতো সূর্য উঠেছে। সামনের রাস্তা দিয়ে বাস দ্রুত মানুষ চলে যাচ্ছে ঠিক ঠিক। কোথাও কিছু কম নেই। কিসের শোক! উদাস কাঁদল না। শুধু বলল বিড়বিড়িয়ে—বাবা, তুমি চলে গেলে। কেন গেলে? আমি একা হয়ে গেলাম।

॥৫॥

এরপর যা কিছু করণীয়, করল বুবুন। সেই একে ওকে ডেকে আনল। ফুল খাটিয়া জোগাড় করল। তারপর শ্মশানযাত্রা। সতীঘাটা যাবেন পতিতপাবন। এই শহরের একমাত্র শ্মশান। এই শহরকে ভালবাসতেন তিনি। মা বললেন—তোর বাবা সতীঘাটের কথা বলে গেছে। সেই সতীঘাটের পাশে তিলপাড়া ব্যারেজ। নদীকে জলবন্দী করে রেখেছে। নদীর বুকে ব্যারেজ দাঁড়িয়ে মহীরুহের মতো।

পতিতপাবন ভষ্মীভূত হলেন। সব মানুষ এমনি করে একদিন না একদিন হয়। সব দায়দায়িত্ব বুবুনের। কলেজ পড়া ছেলে। সে এ যুগের এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সে নিজের কথা এতটুকু ভাবে না। নিজের স্বার্থ দেখে না। মানুষের বিপদে ছুটে যায়। বুক আগলে দাঁড়ায়। কোন গরিবের মৃতদেহ দাহ হচ্ছে না, বুবুন দৌড়ে যাবে, চাঁদা তুলবে। তারপর তার দেহ ঢেকে দেবে ফুলে। যে জীবনে একটি ফুলও পায়নি, বুবুন তাকে ফুলের শয্যায় নিয়ে যাবে শ্মশানে। অবহেলায় নয়, গভীর মমতায় এবং শ্রদ্ধায় তার দেহ দাহ করে। দরকার হলে মুখাগ্নি। বুবুনের একটা টিম আছে। তারই বয়সী ছেলেরা। বুবুনের হুকুম শোনার জন্যে তারা খাড়া। বুবুন যা নির্দেশ দেবে, অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করবে। এইসব ছেলেরা মা বাবার কথা অনেক সময় শোনে না, কিন্তু বুবুনের হুকুম শুনবে না, এ হতেই পারে না। এইসব ছেলেরা অসুস্থ লোককে হাসপাতালে ভর্তি করে, ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে অ্যাডমিশন করায়, লোকের বাজার করে দেয়, রেশন তুলে দেয়, গরিবের মেয়ের বিয়ের খরচ জোগাড় করে। এরা অলিখিত সমাজসেবী। দেশ এবং জাতির সম্পদ। উদাস বলে— বুবুন, তুই পুরসভার ভোটে দাঁড়িয়ে যা, তোর যা পপুলারিটি, এই কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডে সহজে জিতে যাবি। আমি তোর ক্যাম্পেন করব। বুবুন বলে—উদাসদা, আমি কোন অসৎ পথে নেই।

বাবার মৃত্যুর পর মাকে নিয়ে সমস্যা হল। উদাস শোক সামলে নিল। কিন্তু মা পারছেন না। যখন তখন কাঁদেন। উদাস বলে—মা, কেঁদে কি করবে? পৃথিবীতে

কেউ কি চিরকাল থাকে? মৃত্যু তো থাকবেই। জন্ম হলেই মৃত্যু হয়। যে ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু ছিল, তিনিও মৃত্যু চেয়ে নিলেন একদিন। মাগো চোখ মোছ। খাওয়াদাওয়া কর। কিন্তু মা উদাসের কথা শোনেন না। তাঁর শোক প্রশমিত হয় না। বরং তা বেড়ে চলে। রাত্রে মা ঘুমান না। কথাবার্তা বলেন না। এক জায়গায় বসে থাকেন। চিন্তায় পড়ল উদাস। সে ঠিক করল, মাকে সাইক্রিয়াটিস্ট দেখাবে। এক্ষেত্রে তাঁদের ওষুধ ভাল কাজ করে। মানুষকে সুস্থ করে। শহরে কিছুদিন হল, এক মনোরোগ বিশেষজ্ঞ এসেছেন। তিনি সদর হাসপাতালের ডাক্তার। তাঁকে দেখেছে উদাস। বয়স কম, সুন্দর চেহারা, মুখে হালকা দাড়ি, হাসিমুখ সর্বদা, তিনি এক মেডিকেল ডিসপেনসারির পিছনের চেম্বারে রোগী দেখেন। প্রচুর রোগী। আজকাল মনোরোগীর অভাব নেই। জীবন জটিল, মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও জটিল, জীবনযাত্রা যান্ত্রিক, তার সঙ্গে আছে ভেঙে-পড়া সমাজব্যবস্থা, বেকারত্ব, খুন হয়ে যাওয়ার ভয়, কে বাঁচবে অথবা মরবে তা নির্ভর করে প্রতিটা পাড়ার মস্তান দাদাদের উপর, কোন প্রতিবাদ চলবে না, গাছপালা নিধন, কংক্রীটের জঙ্গাল শহরে—সব মিলিয়ে এক অসুস্থ পরিবেশ। গ্রামের পরিবেশ রাজনীতি। এই পরিবেশে মানুষ মানসিক ভারসাম্য কি করে বজায় রাখবে? সে পিছলে যাচ্ছে। প্রকৃতি নেই, বনজঙ্গল নেই, জলাশয় নেই, রুক্ষ এক পরিবেশ, নিদারুণ গ্রীষ্ম, জলকষ্ট, পানীয় জল নেই, মানুষ লড়াই করতে করতে ক্লান্ত, নিজের মধ্যে মুক্তি খুঁজছে মানুষ, পাচ্ছে না। ঘরে বাইরে সে বন্দী, ক্রীতদাস—ফলে মানসিক রোগ।

মনোবিদ এম. মুখার্জি দেখলেন মাকে যত্ন করে। অনেক প্রশ্ন করলেন। রোগের প্রকোপ এবং লক্ষণগুলো নোট করে নিলেন। তারপর প্রেসক্রিপশন করলেন। দুটো ওষুধ দিলেন। দুপুরে একটি, রাত্রে একটি, খাবার পর। উদাস বলল—ডাক্তারবাবু, মায়ের নরম্যাল হতে কতদিন লাগবে?

—মাস তিনেকের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবেন। তবে এরপরও ওষুধ চালাতে হবে। কতদিন, সে পরিস্থিতি অনুসারে ঠিক করব। ওষুধগুলো ঠিকঠাক খাওয়ান। ভাল ঘুম হবে। মনের জটিলতা কেটে যাবে। একমাস পর আসুন।

কয়েকদিন ওষুধ খাওয়ার পর মায়ের পরিবর্তন এল। মা দুপুরে এবং রাত্রে ঘুমোচ্ছেন ভাল। খাওয়াদাওয়াও বেড়েছে। কাজে বসছেন। হাসছেন। সব মিলিয়ে ভালর দিকে যাচ্ছেন মা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল উদাস। মা ছাড়া তার আর কেউ নেই। না, একজন আছে। সে বুবুন। সমস্ত মানুষের বন্ধু সে। বিষাদে দুঃখে সে সবসময় মানুষের পাশে পাশে। সদাই সে ব্যস্ত। রাত্রি জেগে সে পড়াশোনা করে। ভোরে ওঠে। সংসারের কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, হতাশা নেই—সবসময় প্রাণবেগে টগবগ করে ফুটছে। উদাস ভাবে, এমন এক একটা ছেলে

যদি প্রতি পাড়ায় থাকত অথবা গ্রামে গ্রামে, দেশের চেহারা বদলে যেত। এরা যেন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এদের দেখে কোন মানুষ আত্মকেন্দ্রিক হবার আগে ভাববে। অন্যায় করার আগে থমকে যাবে।

উদাস মাঝে মাঝে বুবুনদের বাড়ি যায়। বুবুনকে ধরতে হলে খুব সকালে যেতে হয় অথবা রাত্রে। তাছাড়া পাওয়া কঠিন। সেখানে রাণী আছে। বুবুনের একমাত্র দিদি। রাণী ক্লাস সেভেনে তিন তিনবার ফেল করে স্কুল থেকে অবসর নিয়েছে। খুশি হয়ে নিয়েছে। পড়াশোনায় বুবুন কিন্তু ভাল। বেশ ভাল। বুদ্ধিমান সে। মাধ্যমিকে স্টার, উচ্চ মাধ্যমিকে ফার্স্ট ডিভিশন, এখন কলেজে পড়ছে। স্যারদের প্রিয়পাত্র সে।

রাণী পড়াশোনাতে লবডঙ্কা হলেও সেলাই ফোঁড়ে চমৎকার। একটা সেলাই স্কুল থেকে ডিপ্লোমা করছে। বাড়িতে মেয়েদের ফ্রক জামা তৈরি করে। বাজাবে সেগুলো বিক্রি হয়। ফুটপাতের দোকানে কমদামে সেগুলো পাওয়া যায়। দেশের লোক অধিকাংশ গরিব। বেশ গরিব। ভাবতবর্ষের মতো গরিব দেশ এই পৃথিবীতে কটা আছে জানে না উদাস, তবে জানে, বেশি নেই। সবাই নিজেদের উন্নতি করছে। ভারত চলেছে অবনতির রাস্তায।

গরিব লোকেরা বড় দোকানে ঢুকতে পারে না। ভয় পায়। কি করে ঢুকবে তারা? হাতে যে রেস্ত নেই। কোথায় পাবে তারা টাকা? তারা লেবার ক্লাসের লোক। গরিবরা কেউ দোকান কর্মচারী, কেউ রিক্সাচালক, কেউ গুমটি করে। কি তাদের আয় যে বড় বড় সাজানো গোছান ঝকঝকে দোকানে ঢুকবে? সেখানে সুন্দরী মেয়েরা বসে আছে হাসিমুখে। কাপড় প্যাকেট করে দেয়, মোটা বিল করে দামের; কি করে গরিবরা সেখান থেকে কাপড়জামা কিনবে? সুন্দরী মেয়েদের নমস্কার এবং 'আবার আসবেন কিন্তু' এই বাণী তাদের কপালে নেই। অতএব তাদের ফুটপাত ভরসা। ফুটপাত তাদের ঈশ্বর। তারা রাণীর নির্মাণ করা জামাকাপড়ের গ্রাহক। এছাড়া রাণী ভাল সোয়েটার বুনতে পারে। উদাসকে দুবছর আগে করে দিয়েছে। সেটিই উদাসের একমাত্র শীতবস্ত্র। বেশি শীত হলে তার উপর একটা কমদামী চাদর জড়ায় উদাস। এই দুই বেশে তার শীতকাল যাপন। তিনমাস শীতের সঙ্গে তার প্রেম ভালবাসা।

এ পাড়ার অনেক ছেলেমেয়ের গায়ে যে সোয়েটার দেখা যায়, তা রাণীর বানানো। সব ছেলেমেয়ের অবশ্য সোয়েটার নেই। রাণী না হয় মজুরি নেবে না, কিন্তু তাকে উল কিনে দিতে হবে তো। সেটাই অনেক মানুষ পারে না। পারে না বলে সেই ছেলেমেয়েরা শীত সহ্য করে। কষ্ট পায়। তবু করে উপায় নেই বলে। দরকার হলে একটা জামার উপর আর একটা জামা চড়ায়। রোদে বসে শীত তাড়ায়।

উদাস বলে—বুবুন কোথায় রে রাণী?

রাণী সেলাই মেশিন চালাচ্ছে। ঘড়ঘড় আওয়াজ।

—ও কি ঘরে থাকে?

—তা অবশ্য থাকে না। যখন আসবে বলবি আমি ডেকেছি।

—বলব। উদাসদা চা খাবে? উদাস ভাবল।

—এখন খাবার সময় নেই। কাজ আছে।

—তুমি দেখছি—আজকাল বড় ব্যস্ত হয়ে পড়েছ। আমাদের বাড়ি তো আসছই না। হাসল উদাস।

—একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে কাজ পেয়েছি।

—জানি। সে খবর রাখি। মাসীমা কেমন গো?

—ভাল। তা তুই তো যেতে পারিস। যাস না কেন?

—আমার যাবার সময় আছে? সবসময় সেলাই মেশিন। পেটের ধান্দায় ব্যস্ত। কখন খোঁজ খবর করব? এ ব্যাপারে বুবুন ভাল। দুনিয়ার খবর রাখে।

উদাস বলল—তা ঠিক। রাণীদের বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে এল। ভাবল, আজকাল রাণী বেশ রোজগার করছে। তাদের খড়ের চালের বাড়ি ছিল, সেখানে এখন টিন পড়েছে। ঘরে বাথরুম হয়েছে। আগে রাণীরা পুকুরঘাটে স্নান করতে যেত। উঠানে বসেছে টিউবওয়েল। আগে রাণী রাস্তার কল থেকে জল ভরত। মানুষের এই যে কষ্ট করে বড় হওয়া, পরিশ্রম করে, লড়াই করে, নিজের পায়ে দাঁড়ানো, এসবের মূল্য উদাসের কাছে অপরিসীম।

সবাই তো হরিদাস সাহা নয়। লোকটা প্রচণ্ড দুনম্বরী। অত্যন্ত বাজে। কত কত পয়সা লোকটার। রাতারাতি ধনী। মাত্র ক বছরে। বিরাট বাড়ি। বিদেশি গাড়ি। লোকটা ভেলকি জানে। হরিদাস স্বচ্ছ দুনিয়ার লোক নয়। অন্ধকারের জীব। গভীর গহন অন্ধকারের।

রাণীর সঙ্গে উদাসের একটা সম্পর্ক আছে। উদাসের বোন নেই। সে বাবা-মার একমাত্র সন্তান। বোন না থাকলে সব ভাইয়ের দুঃখ হয়। কার সঙ্গে সে খুনসুটি করবে? কার সঙ্গে খেলবে? কে ভাইফোঁটা দেবে? এই শেষের অভাবটাই দূর করেছে রাণী। প্রতিবছর উদাসের বাড়ি এসে ভাইফোঁটা দিয়ে যায়। শাঁখ বাজায়। ধান দুর্বা চন্দন দিয়ে সে অনুষ্ঠান হয় জমকালো। রাণী সুর করে বলে—ভাইয়ের কপালে দিলেম ফোঁটা। যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা।

একটা করে শাড়ী উপহার দেয় রাণীকে প্রতিবছর এই শুভদিনে উদাস। দিয়ে তৃপ্তি পায়। শাড়ি নেড়েচেড়ে দেখে বলে রাণী—এত দামি শাড়ি কেন দাও উদাসদা? কেন দাও? এ যে অনেক টাকা দাম। আর্ডিনারি শাড়ি দিতে পার না? আমি তো সবসময় অর্ডিনারি শাড়ি পরি। বিয়ে বাড়ি গেলেও। তাহলে?

—বছরে তোকে মাত্র একবার শাড়ি দিই। একটু ভাল না দিলে চলে?

—দামি শাড়ি না দিলে বুঝি ভালবাসা জানানো হয় না। রাণীর কথা শুনে অপ্রতিভ হয়ে পড়ে উদাস। বলে—রাণী, তুই খুব লজ্জা দিতে পারিস। বড্ড বেশি ঠোঁটকাটা তুই।

—ঠোঁটকাটা কিসের? যা মনে হয়, তাই বলি। আমি কি মিথ্যে বলেছি?

রাত্রি ৯টা নাগাদ এল বুবুন। তখন টিভি দেখছে উদাস। খবর দেখছে। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট টিভি। মায়ের জন্যে সে কিনেছে। মা একা একা থাকেন সন্ধ্যাবেলায়। কোন কোন দিন সন্ধ্যায় এর বাড়ি ওর বাড়ি করে বেড়ান। মা যাতে সময়টা ভালভাবে কাটাতে পারেন, তার ব্যবস্থা করেছে উদাস। ইনস্টলমেণ্টে একটা ১৪ ইঞ্চি কিনেছে। কেনা সম্ভব হতো না, এতদিন কেনা সম্ভব হয়নি, এখন হয়েছ ইঁট কোম্পানির কাজটা পেয়ে। মাইনে থেকে ইনস্টলমেণ্টে শোধ করে দেবে। সময় একবছর।

বাসস্ট্যাণ্ডের ভিতরে একটা বড়-সড় টিভির দোকান। ইউনিভার্সাল ইলেকট্রনিক্স। তার মালিককে চেনে উদাস। তার ইচ্ছাটা জানাল একদিন। মালিক দীননাথবাবু বললেন—ঠিক আছে, কিনে নিন টিভি। আপনাকে আমি চিনি। স্টেশন বাজারের ওখানে থাকেন। কি যেন আপনার নাম?

—উদাস মণ্ডল।

—ঠিক আছে উদাসবাবু। ইনস্টলমেণ্টেই দাম দেবেন। শুধু একটা ফর্মে সই করে দেবেন। খুশি হয়ে উঠল উদাস। তার বহুদিনের ইচ্ছে একটা টিভি কেনে। অর্থের অভাবে হচ্ছিল না এতদিন। এখন সে সুযোগ হয়েছে। রাণীকে ডেকে আনল উদাস। টিভির মডেল পছন্দ করতে হবে। দোকানে কত কত মডেল। বাঁশবনে ডোম কানা। এর মধ্যে একটা পছন্দ করা সহজ কাজ নয়। রাণীর জিনিস পছন্দের ব্যাপারে নাম আছে। ভাল শাড়ি পছন্দ করতে পারে। স্টাইলিশ জিনিস কিনতে পারে। এসবের কিছু পারে না উদাস। সে কেমন এলোমেলো হয়ে পড়ে। রাণী টিভির দোকানে এসে দশ মিনিটে মডেল পছন্দ করে ফেলল। খুশি হল উদাস। তার মন বলছিল, এই মডেলটাই সেরা।

বুবুন বলল—উদাসদা ডেকেছ আমাকে?

—হ্যাঁ।

—কি ব্যাপার? কোন কাজ?

—শোন বুবুন, লাইনের ওপারে এক ভদ্রলোক বাড়ি করেছেন। অনিল নায়েক। বড় পোস্টে চাকরি করেন ট্রেজারিতে। তাঁর স্ত্রী এসেছিলেন আমার কাছে। ছেলে পড়ে ক্লাস সিক্সে, মেয়ে ফাইভে। তাদের পড়াতে হবে বাড়ি গিয়ে। যেকোন টাকা

দিতে রাজি। আমি রাজি হতে পারিনি। আমার সময় নেই। তুই টিউশনিটা করবি তো রে। ভাল টাকা পাবি। একটু চিন্তা করে নিল বুবুন, তারপর বলল—আমি করব না। আমার এক বন্ধু আছে। নাম সুধাকর। পড়াশোনায় দারুন। কিন্তু বড় অভাবী। গরিব। ও টিউশনি খুঁজছে। ওকে তাহলে বলব। ভাল টাকা দেবে বলছ?

—তা দেবে। ভাল পড়ালে যা চাইবি। ভদ্রমহিলা বললেন, মানি নো ম্যাটার।

একদিন বুবুন সুধাকর এবং উদাস গেল অনিল নায়েকের বাড়ি। রবিবার। কথাবার্তা হল। সুধাকরকে ওঁরা বললেন—কাল থেকে শুরু করে দাও। ঠিক হল, সোম থেকে শুক্রবার পড়াবে সুধাকর। সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত। শুরু হল সুধাকরের পড়ানো। একমাস পড়ানোর পর, সুধাকরকে যা ওঁরা মাইনে দিলেন, সেটা যথেষ্ট ভাল। এতটা আশা করেনি সুধাকর। বুবুন না। উদাসও না।

একদিন অনিলবাবুর সঙ্গে রাস্তায় দেখা উদাসের। তিনি বললেন—সুধাকর খুব ভাল টীচার উদাসবাবু। যথেষ্ট যত্ন এবং দায়িত্ব নিয়ে পড়ায়। যেন নিজের ভাইবোনকে পড়াচ্ছে। একজন ভাল টীচার দেখে দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ আপনাকে।

—সুধাকরকে আমি ঠিক করিনি। করেছে বুবুন। ওরা বন্ধু।

—বুবুনের কথা বলছেন? ওকে তো জানি; যে ছেলেটা শুধুই পরের ভাল করে বেড়ায়?

—আপনার ধারণা ঠিক অনিলবাবু।

—আপনি তাহলে আমার এবং আমার স্ত্রীর ধন্যবাদ পৌঁছে দেবেন বুবুনকে।

—তা দেব। ঠিক সময়ে বুবুনকে ধন্যবাদ পৌঁছে দিল উদাস। বলল বুবুন—সুধাকর বলছিল, ওঁরা চমৎকার মানুষ। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই। এমনটা বড় দেখা যায় না। ওঁরা শুধু ভাল মাইনে দেন না, ভাল একটা টিফিনও দেন। এত দেন যে পেট ভরে যায়।

—তাহলে সুধাকর খুশি তো?

—খুব খুশি। বলল বুবুন। আমিও খুশি উদাসদা।

উদাস বলল—তাহলে আমিও।

॥৬॥

রেলওয়ে স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসে উদাস। পশ্চিম প্রান্তের বেঞ্চে। আগে প্রায় আসত উদাস, তখন ও প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করত না। বেকার জীবন। এখন রবিবার ছাড়া ছুটি নেই। হাতে সময় কমে গেছে। ব্যস্ততা বেড়েছে। সকালে টিউটোরিয়াল হোম, বেলা ৯টা নাগাদ ছাত্রছাত্রীদের ছুটি দেয় উদাস, তারপর হাট-বাজার করে। স্নান খাওয়া সেরে সাড়ে এগারোটায় বাস ধরে। ময়ূরাক্ষী নদীর

তীরে ব্রিকস্ সাইটে চলে যায়। পাশে ময়ূরাক্ষীর স্রোত বয়ে চলে কুলকুল। চিরপ্রবাহিনী। বারোটা থেকে উদাসের ডিউটি শুরু। শেষ সন্ধ্যা ছ'টায়। আবার বাস ধরে ফেরা। ও লাইনে বাস চলে রাত্রি ১০টা পর্যন্ত। তাই পড়ে থাকার ব্যাপার নেই। কর্মব্যস্ত দিন কেটে যায় এক সুন্দর ছন্দে। আগের থেকে আর্থিক অবস্থা ভাল হয়েছে উদাসের। হবারই কথা। হাতে টাকা আসছে। দেবেশবাবু এখন মোটামুটি মাইনে দিচ্ছেন। বছর বছর বাড়িয়ে দেবেন কাজ দেখে। প্রাইভেট কোম্পানির এটাই নিয়ম। উদাস অফিসে কাজ করে। একাউন্টস সামলায়। সে আর্টসের ছাত্র। তাহলেও উদাস অঙ্কটা ভাল জানে। বেশ জানে। এই জানাটা তাকে চাকরি পেতে সাহায্য করেছে। তবে তার বন্ধু সুনীল না থাকলে এ চাকরিটাও হতো না। মামাবাবুকে ধরে অভাবী এবং দুঃখী উদাসের একটা ব্যবস্থা করে দিল। হিল্লে করে দিল। বেকার জীবন যে কত ভয়ঙ্কর, কি নিষ্ঠুর, কি তার দংশন, জানে উদাস। ভাল করেই জানে। হাতে অর্থ না থাকলে সবই শূন্য। দরিদ্রের দারিদ্র্য ছাড়া কিছু নেই। এত এত মানুষ বেকার, এত জীবনশক্তির অপচয়, এসব মেনে নিতে পারে না উদাস। তার বড় কষ্ট হয়। যদি এমনটা হতো, যারা ধনী, তারা যদি নিজেদের বাড়িতে একটা করে কাজের লোক রাখত, খেতে পরতে দিত, মাইনে দিত, তাহলে বহু লোক বাঁচার অর্থ পেত। এতটা হতাশা এবং অন্ধকার তাদের গ্রাস করত না। নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে প্রায় মধ্যবিত্তের কাছাকাছি গেছে উদাস। এখন সে পেটভরে দুবেলা খেতে পায় ভাল করে। কত কত মানুষ দুবেলা খেতে পায় না। বস্ত্র পায় না। মাথার উপরে ছাদ নেই। শেষপর্যন্ত এদের হবে কি? তারা পশুর জীবনযাপন করে। ধুঁকে ধুঁকে বেঁচে থাকে। এটাকে কি বাঁচা বলে? উদাস জানে, দেশে যত ধনী বাড়বে, তার বহু গুণ বাড়বে গরিব।

অণ্ডাল থেকে একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল। বিপুল শব্দ তুলে। স্টিম ইঞ্জিন। গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন থেকে। কালো ধোঁয়া রাশি রাশি। আকাশ মলিন হচ্ছে। ব্যথিত হচ্ছে। তারপর প্রতি কামরা থেকে কালিঝুলি মাখা, নোংরা শরীর একশ্রেণির জীব বেরিয়ে এল। তাদের কোমরে বস্তা। এরা কয়লাচোর বলে খ্যাত এবং পরিচিত। এসব দলে ছেলে বুড়ো জওয়ান যুবতী বৃদ্ধা সবাই থাকে। উদাস জানে, এরা সকাল ৭টার ট্রেন ধরে চলে যায় পাণ্ডবেশ্বর উখরা সিধুলি কাজোড়া অণ্ডাল। সকলের হাতে বস্তা। এক বা একাধিক। তারা ছড়িয়ে পড়ে নানা স্থানে। এলাকা ভাগ করা। কেউ কারুর এলাকায় নাক গলায় না। যদি গলায় ধুন্ধুমার কাণ্ড বেঁধে যায় যায়। খিস্তিখেউর চলে। সে শব্দগুচ্ছ কানে তোলে, এমন কার সাধ্য! তারপর গালাগাল ছেড়ে মারপিট। নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি। একসময় সে লড়াই থেমে যায়। সমঝোতা হয়। আপোষ হয়। ভাব হয়। গলাগলি হয়। বিড়ি

আদানপ্রদান। সেগুলো জ্বলে ওঠে ঠোঁটে ঠোঁটে। ধোঁয়া ওড়ে নাক মুখ থেকে। চারদিক ভরে ওঠে বিড়ির কটূ গন্ধে।

সকালের ট্রেনে যাওয়া। সাড়ে পাঁচটার ট্রেনে ফেরা। প্রতিদিন এক কাজ। একঘেয়ে বিবর্ণ অন্ধকারময় কাজ। কয়লা এনে, সে কয়লা চলে যায় হরিদাস সাহার গুদামে। মহাজন যা কয়লা নেয়, তার তুলনায় দাম দেবে কম। তাই সই। মেনে নিতে হয় পেটের তাগিদে। তারা চাল কেনে। বস্তিতে কুঁড়ে ঘরে ঘরে উনুন জ্বলে কয়লার। হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত লাফায়। সাদা সাদা যূঁই ফুল যেন। সারা কুঁড়ে ঘর সুঘ্রাণে ভরে ওঠে। সে মধুর ঘ্রাণ কুঁড়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে আকাশে বাতাসে। বাতাস হয় মধুময়। পৃথিবী হয় অর্থবহ।

হরিদাস সাহা শুধু চোরাই কয়লা কেনে তা নয়, তার সঙ্গে কেনে লোহালক্কর, গমভর্তি বস্তা, সিমেন্ট আরও কত কি। সব ওয়াগনভাঙা মাল। স্মাগলাররা এসব পৌঁছে দেয় হরিদাস সাহার গোডাউনে। হরিদাস তাড়া তাড়া নোট নিয়ে বসে। ঠিক যেন একটা ব্যাঙ্ক। মাল দাও টাকা নাও। এই করে করে লোকটা কি না করল! বড় বাড়ি। প্রাসাদোপম। বিদেশি গাড়ি। জমি জায়গা প্রচুর। লোক দিয়ে চাষ করায়। মুনাফা লোটে। এছাড়া লাইসেন্সহীন সুদের কারবার। এত বেআইনি কাজ, এত কালোবাজারি তার, কিন্তু পুলিশ ঢোকে না হরিদাস সাহার আড়তে। কেউ বলে না—এসব হচ্ছেটা কি? শুধু দেখা যায়, বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের ঘোরাঘুরি। সব দলের। আর হরিদাস সাহা তার বিদেশি গাড়িতে চড়ে চলে আসে থানায়। বড়বাবুর সঙ্গে চা সিগারেটের ছড়াছড়ি। ফুসফাস গুজগাজ। কাজ সেরে উঠে আসার সময়, পোর্টফলিও ব্যাগ খুলে নোটের বান্ডিল বের করে হরিদাস সাহা। বড়বাবুর টেবিলে সাজিয়ে দেয়। হরিদাস বলে—আর দেব? বড়বাবু হাসেন। বলেন—আপাতত এতেই হবে। আনন্দে বড়বাবুর চোখ চকচক করে। পুলিশ মানুষ নয়। ভিন্ন প্রজাতি।

হরিদাস বলে—একটু দেখবেন স্যার।

তিনি বলেন—নিশ্চয়। আপনি যদি আমাদের দেখেন, তাহলে আমরাই বা আপনাকে দেখব না কেন? বড়বাবুর কুলপ্লাবিত হাসি। তার সঙ্গে হরিদাস যোগ দেয়। হরিদাস সাহার একটিই গুণ, সে নিজে নগ্ন হয়। পুলিশকে করে। তার সঙ্গে দেশকেও। এটাই তার কৃতিত্ব।

প্লাটফর্ম থেকে সবাই যখন কয়লার বস্তা ঘাড়ে করে, অথবা কোমরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন উদাসের চোখে পড়ল ময়নাকে। তার ময়নাদি। বছর তিরিশ বয়স। কিন্তু দেখায় পঁচিশ। সুন্দর তার শরীরের গড়ন। গায়ের রং কালো। কিন্তু মুখটা বড় আকর্ষণীয়। মাথাভর্তি নোংরা ময়লা উস্কোখুস্কো চুল। জট পাকিয়ে আছে। দেখে মনে হয়, বাবুই পাখির বাসা। উদাস জানে, আগে কয়লাচোর ছিল না

ময়না। গৃহবধূ ছিল। তার স্বামী ছিল। ঘরসংসার ছিল। কিন্তু এখন কিছু নেই। একা সে। একদম একা। বাধ্য হয়ে বাঁচার তাগিদে, পেটের জ্বালার তাগিদে সে কয়লাচোর হয়েছে। দলের রিং লিডার ময়না। মাঝে মাঝে পুলিশ ঝামেলা করে। কয়লা কেড়ে নেয়। লাঠি দিয়ে মারে। পেটায়। তাদেরকে পয়সা দিতে হয়। পয়সা ছাড়া ময়নাকে আরো কিছু দিতে হয়। সে জওয়ানি। তার কাছে অনেকের প্রাপ্য থাকে। দলকে বাঁচাতে, মানুষগুলোকে রক্ষা করতে, ময়না যেকোন কাজ করতে পারে। এতগুলো ক্ষুধার্ত মুখ তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাদের কি করে বঞ্চিত করবে সে!

উদাসকে দেখতে পেয়েছে ময়না।

—আরে উদাস ভাই, আছ কেমন?

—ভাল।

—আজকাল তোমাকে দেখতে পাই না কেন? কতদিন পর দেখলাম তোমাকে, এদিকে বুঝি আস না আর?

—আসি। তবে কম। আমি একটা কাজ পেয়েছি ময়নাদি।

—কি কাজ? তখন বলল উদাস তার কাজের কথা। হতে পারে প্রাইভেট কোম্পানি, তবু তো কাজ। চাকরি। তার বিনিময়ে সে অর্থ পায়।

—তুমি কেমন আছ ময়নাদি?

—আমি? একরকম আছি ভাই। তুমি তো জানো, আমাদের লাইনের দস্তুর। বড় কষ্টের কাজ। বড় বিপদের কাজ। ঝক্কি ঝামেলা লেগেই আছে। তবু করতে হয়। বেঁচে থাকতে হবে তো। হাসল ময়না। চলি উদাসভাই, এখনও কাজ শেষ হয়নি। হরিদাস সাহার গুদামে যেতে হবে। উদাসভাই, কে যেন বলল, তোমার মায়ের শরীর খারাপ। কি হয়েছে?

—একদিন এস না কেন ময়নাদি?

—তাই করব। একদিন যাব। সময় পাই না যে। সকালে যাওয়া। সন্ধ্যায় ফেরা। প্রতিদিন এক কাজ। প্রাণ হাঁফিয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে, সব ছেড়েছুড়ে কোথাও চলে যাই। কিন্তু যাবই বা কোথায়! পোড়া পেটটা সঙ্গে থাকবে। পেট থাকলে ক্ষিদেও থাকবে। তাকে চুপ করাতে হবে তো!

ময়না চলে গেল। এক বস্তা কয়লা কাঁখে। পরনের শাড়িটা এককালে বোধহয় সাদা রঙের ছিল। কয়লার কালিতে সে রং ধুয়ে মুছে কালো কাপড় হয়ে গেছে। নোংরা কাপড় ময়নাকে নোংরা করে ছেড়েছে।

সন্ধ্যা নামছে। গরমকাল। মাস এপ্রিল। যত দিন অতিবাহিত হবে, গরম বাড়বে। সামনে মে মাস। বাংলা জ্যৈষ্ঠ। তখন সবচেয়ে উষ্ণ রাতদিন। মানুষ হাঁসফাঁস করবে।

কলকল করে ঘামবে। রাত্রে ঘুম আসবে না। উদাস গ্রীষ্মকালে ভাল থাকে না। গরম সইতে পারে না। তবু সইতে হয়।

একটা ট্রেন এসে দাঁড়াল সাঁইথিয়ার দিক থেকে। বিরাট বিপুল ট্রেন। প্লাটফর্মে ধরে না যেন। গৌহাটি চেন্নাই এক্সপ্রেস। অসম পশ্চিমবঙ্গ ওড়িশা অন্ধ্রপ্রদেশ পার হয়ে সে চলে যাবে তামিলনাড়ুর চেন্নাই। তার শরীরের অভ্যন্তরে কত কত লোক। এই ট্রেনটা হওয়াতে বহু মানুষের ব্যাপক সুবিধা হয়েছে।

একসময় ডিজেল ইঞ্জিন কথা বলে উঠল। গর্জন করে উঠল। নড়ে উঠল অজগর সাপের দেহ। অজগর একটু একটু করে তার গতি বাড়াতে লাগল। পশ্চিমদিকের রেললাইনের একটা বাঁধের মুখে হারিয়ে গেল ট্রেনটা। শুধু দূর থেকে ভেসে আসে তার ধকধক ধ্বনি।

কোথায় যেন চলে গিয়েছিল উদাস। হারিয়ে গেছিল। এমনটা তার মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। রাণী বলে, পাগলামী। হতেও পারে। স্টেশন প্রাঙ্গণের আলোগুলো একসময় জ্বলে ওঠে। সারা স্টেশন টিউব এবং হ্যালোজেনের জাদুতে ঝকঝক করে। দিনের রুক্ষ স্টেশন সুন্দরী হয়। সেইসময় একজন ডাকল।

—উদাসদা।

—কে? উদাস সচেতন হল। সামনে দাঁড়িয়ে বুবুন।

—কি ব্যাপার বুবুন, তুই এখানে?

—আমার মা তোমাকে ডাকছে? একবার দেখা করতে বলল।

—কি ব্যাপার?

—জানি না।

—তুই জানলি কি করে, আমি এখানে আছি?

হাসল বুবুন। বলল—আমি জানি তো, তুমি মাঝে মাঝে এখানে এসে বসে থাক। মানুষ দেখ, গাছপালা দেখ, ট্রেন দেখ। এখানে এলে তোমার মন ভাল হয়ে যায়। যায় না?

—তা হয়।

—আর এক জায়গায় তুমি যাও। বলে দিতে পারি।

—কোথায়?

—কেন সতীঘাটা শ্মশানে! সেখানে একটা উঁচু পাথরের উপর বসে তুমি নদীতে বেঁধে রাখা জল দেখ। মড়া আসে শ্মশানে, তাদের দাহ করা হয়। দরকার পড়লে তুমি সাহায্য কর। হাত লাগাও।

—হ্যাঁ বুবুন, তোর সব ইনফরমেশন ঠিক।

—তুমি জীবনকে নিয়ে বড় বেশি ভাব উদাসদা। কেন ভাব এত?

—কেন ভাবি, জানি না। তবে ভাবি এটা ঠিক। উদাস উদাসভাবে বলল।

॥ ৭ ॥

রাণীর মা ডাকছে। উদাস চলে এল বুবুনদের বাড়ি। বুবুন কোথায় যেন গেল। এখন তার বাড়ি ফেরার সময় নয়। রাণী নেই। সে সিনেমা গেছে পাড়ার বৌদিদের সঙ্গে। রাণী সিনেমা দেখতে ভালবাসে। বাংলা হিন্দি যাই হোক না কেন। সব নায়ক-নায়িকাদের সে নাম জানে, কে দেখতে সুন্দর, কে নয়, কে ভাল অভিনয় করে, কে করে না এসব তার মুখস্থ। একবার কথা তুললেই হল। হিন্দি সিনেমা দেখে দেখে, হিন্দি বলতে শিখেছে রাণী। হিন্দি সিনেমা বুঝতে তার এতটুকু কষ্ট নেই।

—মাসিমা, আমাকে ডেকেছেন, উদাস বলল।

—হ্যাঁ বাবা, এস বস। চা খাও। তারপর বলছি। রাণীদের গ্রিলঘেরা বারান্দায় তিনটি সেলাই মেশিন। একটা মেশিন থেকে তিন মেশিন। তার মানে রাণীর ব্যবসা বাড়ছে। সে অর্ডার পাচ্ছে ভাল। উদাস বুঝল ব্যাপারটা। মাসিমা চা উদাসের হাতে দিলেন। বললেন তারপর—পাড়ার আরো দুটো মেয়েকে নিয়েছে রাণী। ওরা কাজ শিখছে। কিছু টাকাপয়সা পাচ্ছে। রাণী দিচ্ছে।

—তাহলে বলুন, রাণী এখন ভাল রোজগার করছে।

—তা করছে বাবা। এতদিন তো আমাদের হাতে টাকাপয়সা জমত না। এখন জমে। পোস্ট অফিসে বই খুলেছে রাণী। মাসে মাসে টাকা জমা করে।

--বাঃ বেশ। এই তো চাই। তা কি জন্যে ডেকেছেন আমাকে?

—রাণীর কথা বলতে।

—রাণীর কথা! কি কথা!

এরপর মাসিমা যা বললেন, তা সাজালে এইরকম দাঁড়ায়। রাণী লাইনের ওপারে একটি যুবককে ভালবাসে। তার নাম তরুণ দাশ। যুবকটি লেখাপড়া শিখলেও তেমন রোজগার করে না। একটা গুমটি চালায়। আয়-চায় ভাল নয়। একটা গুমটি থেকে কি-ই বা রোজগার হতে পারে! আবার তরুণের মা বাবা সুস্থ নয়। তাদের সেবা যত্ন করতে হয় তরুণকেই। একটা খরচের ব্যাপারও আছে। সে পেরে উঠছে না। রাণী বলছে, সে তরুণকে বিয়ে করবে। তার সংসারের ভার নেবে।

—তা আপনার কি মত মাসিমা?

—আমার মত নেই। তরুণকে বিয়ে করুক রাণী আমি তা চাই না। রাণী আমাদের সংসার চালাচ্ছে, আবার তরুণের সংসার চালাবে! এত কিছু হয় নাকি! খেটে খেটে

মরে যাবে যে মেয়েটা! মুখে রক্ত উঠে যাবে। তুমি ওকে বোঝাও। ও তোমার কথা শোনে।

—এক্ষেত্রে শুনবে কি? এটা তো প্রেমের ব্যাপার।

—তা জানি। তবু চেষ্টা করে দেখ।

—জানেন তো মাসিমা, রাণী কত জেদি মেয়ে। বড় একরোখা।

—তা আর বলতে বাবা। নিজের মেয়েকে চিনি না। হাড়ে হাড়ে চিনি। যা বলবে তাই করে ছাড়বে। মরবে তবু নিজের গোঁ ছাড়বে না। স্কুলের পড়া ছেড়ে দিল। কতবার বললাম, ঠিক আছে, তুই অন্য স্কুলে ভর্তি হ'। ফেল করেছিল তো কি হয়েছে। মেয়ে বলল, না, আমি আর পড়ব না। তাহলে কি করবি? না, আমি রোজগার করব। তা বাবা রোজগার করছে। ভালই করছে বলব। এই জিদটা ঠিক আছে। কিন্তু তরুণকেই বিয়ে করব, এ জিদটা ঠিক নয়। ভুল। তুমি একটু বলে কয়ে দেখ। আমি রাণীর বিয়ে দেব রোজগেরে ছেলের সঙ্গে। হাফ বেকারের সঙ্গে কেন দেব? কি কারণে দেব?

—ঠিক আছে মাসিমা। সব শুনলাম। একটু ভেবে নিই। কিভাবে বলব ঠিক করে নিই। তারপর বলব।

—তোমাকে বলতেই হবে বাবা! রাণীকে বোঝাতে হবে। না হলে মেয়ে আমার ভেসে যাবে। সর্বনাশ হবে। মা হয়ে আমি তা হতে দিতে পারি না।

—এতটা উতলা হবেন না মাসিমা। আমি চেষ্টা করে দেখব। রাণীর সঙ্গে কথা বলব। তারপর আপনাকে খবর দেব।

—বেশ বাবা, বেশ। তাই করো।

বাইরে এসে হঠাৎ উদাসের মনে হল, একটা খেলে হয়। তার এখন পান খেতে ইচ্ছে করছে। না, নিয়মিত পান সে খায় না। হঠাৎ যদি ইচ্ছে হয়, মনে বাসনা জাগে, এক-আধদিন খেয়ে থাকে। মিষ্টি পান খেলে মুখের স্বাদটা বদলে যায়। মুখের ভিতর থেকে একটা সুবাস বেরিয়ে আসে।

মোড়ের দোকানটায় গেল উদাস। দোকানের মাথায় বোর্ড 'বসন্তের পানের দোকান'। বেশ চলে দোকানটা। পান ছাড়াও আরো অনেক কিছু বিক্রি হয়। সব গুমটি দোকান সমান চলে না। কোন কোনটা চলে। পান খাওয়ার জন্য লোকে অপেক্ষা করে। ভিড় করে থাকে। উদাস দাঁড়িয়ে। তখন সে দেখল, মাধুরীদিকে। তার মাধুদিকে। সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। কপালে বড় টিপ। চোখে কাজল। এখন সে পান খাবে, ঠোঁট রাঙাবে। মাধুদিও দেখেছে উদাসকে। ভিড় থেকে সরে এসে মাধুদি দাঁড়াল উদাসের সামনে। বলল—উদাস কেমন আছিস?

—ভাল আছি মাধুদি। তুমি কেমন?

—আর আমাদের থাকা। নরকের জীবন।

—তোমার ছেলের খবর?

—আমার ছেলে এক আত্মীয়ের কাছে মানুষ হচ্ছে। কিছুদিন আগে ঝাড়খণ্ড গেছিলাম। দুমকার কাছে এক গ্রামে থাকে অজয়। গ্রামের নাম হাড়ুকা। দুমকাতে পড়ছে অজয়। বাসের সুবিধা আছে। তিনমাস আগে গেছিলাম, ছেলে বেশ লম্বা হয়েছে। পড়াশোনায় মন্দ নয়। আমি আরও ভাল করে পড়তে বললাম। বললাম, মন দিয়ে পড় বাবা। লেখাপড়া না জানলে কিছু জানা হয় না। তুই যতদূর পড়তে চাস, তোকে পড়াবো। টাকার কথা ভাবিস না। আমি সব জোগাব। লেখাপড়া শিখে চাকরি করবি। আমি তোর কাছে চলে আসব। বাকি জীবন তোর কাছে থাকব। তোর মা বড় দুঃখী রে।

—তা ছেলে কি বলল মাধুদি?

—বলল, বেশ মা তাই হবে। তোমার দুঃখ আমি ঠিক দূর করব। আমার একটাই ভয় উদাস, আমি কি করে টাকা কামাই, যদি ছেলে সেটা জেনে ফেলে, সেই ভেবে কাঁটা হয়ে থাকি। ছেলে জানে, আমি এক ধনী মাড়োয়ারি বাড়িতে রান্না করি, তাদের ছেলেমেয়েদের মানুষ করি, তারা খুব ভাল লোক। অনেক টাকাপয়সা দেয় আমাকে। যখন যা চাই, গিন্নিমা দিয়ে দেন। ছেলে তো জানে না তার মা গণিকা। স্টেশন বাজারের পতিতা। দেহ বিক্রি করে টাকা কামাই করে। একদিন অজয় ঠিক জানবে। তখন আমার কি হবে উদাস? সীতার থেকে বড় অগ্নিপরীক্ষা আমার। সীতা পাশ করেছিল, আমি কি পাশ করব উদাস?

—ঠিক পাশ করে যাবে।

—তুই ঠিক বলছিস?

—হ্যাঁ বলছি।

—অজয় আমাকে ঘেন্না করবে না, যখন সে জানবে, তার মা নোংরা।

—না করবে না মাধুদি। তুমি তো ইচ্ছে করে এ লাইনে আসনি। তুমি আসতে বাধ্য হয়েছ। তুমি ভুল সমাজব্যবস্থার শিকার। দায়ী তো আমরা এবং সমাজ। তুমি কেন দায়ী হতে যাবে? তুমি সংসারে অত্যাচারিত,. নির্যাতিত। তোমার প্রতি সব মানুষের সহানুভূতি এবং ভালবাসা থাকা দরকার।

—সবাই কি তোর মতো? লোকে আমাদেরকে ঘেন্না করে।

হাসল উদাস—তারা ঘেন্না করে, আবার তোমাদের কাছে যায়ও। বেশ মজার ব্যাপার মাধুদি। আমার খুব হাসি পায়। সংসারের সব বিষ তোমরা হজম করছ। না মাধুদি, তোমরা ঘেন্নার বস্তু নও। পবিত্র তোমরা।

—তোর মতো মানুষ যদি সবাই হতো, তাহলে এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত নির্যাতন সইতে হতো না। পেটের জন্য কি না করি বল? ছেলের জন্যে সব সইছি। চলি রে উদাস, খদ্দের বসিয়ে রেখেছি ঘরে। দেরি হলে গাল দেবে।

চলে গেল মাধুদি পশ্চিমের পিচ রাস্তা ধরে। কিছুটা গেলে সারি সারি মাটির বাড়ি ডানদিকে। উপরে খড়ের চাল। কিছু খাপড়ার। আবার দু-একটা দালান। দু-একটা হোটেল। এই এলাকা শহরে পতিতাপল্লী বলে পরিচিত। দিনে ঘুমোয়। রাত্রে জাগে। গ্রামের মেয়ে, বিহারি মেয়ে, নেপালি মেয়ে, বাংলাদেশী মেয়ে, কে নেই? যত বিকাল গড়াবে, দিন শেষ হয়ে আসবে, পশ্চিম প্রান্তে সূর্য ঢলে পড়বে বিশ্রামের জন্য, আবার কাল ভোরে তাকে উঠতে হবে, মানুষকে আলো দিতে হবে, জগৎসংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে—ঠিক সেই সন্ধ্যার মুখে, স্ট্রিট লাইটগুলো জ্বলে উঠবে, স্টেশনে ট্রেন আসবে আবার ছাড়বে গাড়ি, তখন দেখা যাবে, নানা শ্রেণির মানুষ এখানে ভিড় করছে। কেউ খদ্দের, কেউ দালাল, কেউ পুলিশ যারা আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে নিজেরাই আইন ভাঙে, পতিতাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে অথবা দেহ। পতিতারা দেয়। বাড়িওয়ালী টাকা নেয়। দালালে নেয়। গুণ্ডারা নেয়। না দিলে নির্যাতন। ভয়াবহ। গালমন্দ মার অপমান। মানবাত্মার চরম দুর্গতি। বিদ্রোহিনী মেয়েকে নগ্ন করে ডেরার বাইরে বের করে দেওয়া হয়। শতচক্ষুর সামনে সেই নগ্ন নারী লজ্জা ঢাকতে মধুসূদনকে স্মরণ করে। দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণের জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাকে অদৃশ্য থেকে শাড়ি যুগিয়েছিলেন, রক্ষা করেছিলেন দ্রৌপদীর সম্মান, দুঃশাসন শাড়ি কাড়তে কাড়তে একসময় ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে ভূমিশয্যা নিয়েছিল, কিন্তু এ যুগে কোন শ্রীকৃষ্ণ এই যৌনপল্লিতে আবির্ভূত হন না। কাউকে উদ্ধার করেন না। তার উপর আছে বিকারগ্রস্থ কাস্টমারের রুচিবিকৃতি। তারা ব্লেড ব্যবহার করে অথবা ইলেকট্রিকের তার। আঁচড়ায় কামড়ায়। প্রতি মুহূর্তে মাধুরীরা এত যন্ত্রণার মধ্যে বেঁচে থাকে। জীবনযাপন করে। না, এদের জন্য এতটুকু ঘৃণা নেই উদাসের মনে। আছে শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা।

মাধুদির কথা ভাবল উদাস। মাধুদির বাপের বাড়ি উত্তর দিনাজপুর। বাবা দিনমজুর, মা লোকের বাড়িতে ঝিগিরি করে। মাধুদি বড় হলে পাঁচটা বাবা-মায়ের মতো তার বিয়ের ভাবনা ছিল। হঠাৎ একটা যোগাযোগ ঘটে গেল। ঘটক যোগাযোগ করল। মাধুরীর চেহারা সুন্দর। ডাগরডোগর। গরিব ঘরের মেয়েদের মতো তার চেহারা জীর্ণ শীর্ণ কালো রোগা নয়। বলা চলে তার উল্টো মাধুরী। মোটামুটি ফর্সা, সুমুখশ্রীযুক্তা, সুস্বাস্থ্য, উচ্চতাও মন্দ নয়। চোখে পড়ে তার চেহারা। দেওঘরের কাছের গ্রাম দীঘলপুর। সেখানকার পাত্র সূরজপ্রসাদ। অর্থবান লোক তারা। জমিজিরেত আছে। মহাজনী কারবার। দাপট তার থেকে বেশি। সুরজপ্রসাদ

তিন বোনের পর একমাত্র পুত্র। তার খাতিরযত্ন আলাদা। তার বাবা-মায়ের চোখের মণি। সুরজপ্রসাদের সুন্দরী বৌয়ের সখ। ঘটক ভাল টাকা নিয়ে বলল—হুজুর, এনে দিচ্ছি। আমার সন্ধানে আছে। মেয়ে দেখলে পছন্দ না হয়ে যায় না।

ঘটক যোগাযোগ করল মাধুরীর বাবা যতীন পালের সঙ্গে। ঘটক বলল—এ বিয়েতে তোমাকে কোন খরচ করতে হবে না যতীন। সব খরচ দেবে সুরজপ্রসাদের বাবা। বরং যদি চাও, তোমাকে কয়েক হাজার টাকা দিতে পারি। ওদের প্রচুর টাকা। এ বিয়ে হলে আমার কপাল যেমন খুলবে, তেমন তোমারও। তুমি রাজি হয়ে যাও যতীন। মেয়ে তোমার দুধেভাতে থাকবে।

অনেক ভেবে এ বিয়েতে রাজি হল যতীন পাল। মহাজনী সুরজের বাবা বেশ কয়েক হাজার টাকা যতীনকে উপহার দিল। ঘটক পেল। মহাসমারোহে বিয়ে হল। পাত্রপক্ষের বৈভব দেখে লোকে হাঁ হয়ে গেল। চলে গেল মাধুরী স্বামীগৃহে। দেওঘরের দীঘলপুর।

দুবছর সুন্দর জীবন কাটল মাধুরীর। এত সুখ সে জীবনে ভাবেনি। অতি গরিব ঘরের কন্যা। স্বামীগৃহে বৈভব তাকে চমকিত করেছে। এর পরের জীবন মাধুরীর অন্ধকার যুগ। একসময় তা এল। সুরজপ্রসাদের আসল গুণ প্রকাশ পেতে শুরু করল। সে মদ্যপায়ী, চরিত্রহীন, লম্পট এবং নামকরা গুণ্ডা। গরিবদের উপর হামলা করে। দলবল নিয়ে তাদেরকে মারধোর করে। কুঁড়েতে আগুন লাগায়। তার বাড়তি মেয়েমানুষ আছে। এসবে আপত্তি করে মাধুরী। প্রতিবাদ করে। কলহ শুরু হয়। সুরজপ্রসাদ ক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সে মাধুরীর গায়ে হাত তোলে। সুখের বিয়ে, স্বপ্নের বিয়ে, ধুলোয় মিশে যায়। খানখান হয়ে পড়ে কারুকার্যময় কাঁচের বাসন। একদিন সুরজপ্রসাদ তার রক্ষিতাকে নিয়ে বাড়িতে এল। এখন থেকে নয়া চিড়িয়া এই হাভেলীতেই থাকবে। মাধুরী বুঝল, এখানে তার থাকা আর সম্ভব নয়। তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। সে শ্বশুরমশাইকে অভিযোগ করে। মহাজনী শ্বশুর বলল—বহু তুমি সবকিছু মেনে নাও। তাহলে কোন গোলমাল থাকে না। না মানালে সুরজপ্রসাদ তোমাকে হাভেলী থেকে বের করে দেবে। লেড়কার বিরুদ্ধে আমি কিছু করতে পারব না। তুমি আমাকে মাফ করো।

একদিন সুরজপ্রসাদ প্রতিবাদী মাধুরীকে বড় মার মারল। হাভেলী থেকে বের করে দিল। কোথায় যাবে মাধুরী? সে ফিরে এল পশ্চিম দিনাজপুর। তার বাপের বাড়ি। এদিকে তার বাবা অসুস্থ। বাতের ব্যাধি। হাঁটাচলা করতে পারে না। কাজে বেরুতে পারে না। মায়ের উপর ভরসা। মাধুরীর দারিদ্র এবং চেহারা দেখে এক আড়কাঠি এগিয়ে এল। এরা এখন শহর গ্রাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। নারী পাচারকারী। মোটা মোটা টাকার কারবার। মাধুরীর পেটে বাচ্চা এসে গেছে।

মাধুরীকে নিয়ে গেল আড়কাঠি জলপাইগুড়িতে। সেখানে আশ্রয় দিল এক পতিতা মাসি। এছাড়া মাধুরীর বাঁচার আর কি পথ আছে? এ সমাজব্যবস্থা মেয়েদেরকে আর কি বেশী দিতে পারে? নারীরা মূলত পণ্য হয়েই আছে। যতই নারীবাদের কথা বলা হোক, যতই নারীমুক্তির কথা বলা হোক, মাধুরীদের দেহব্যবসাতে নামতে হয়। তাদেরকে নামাতে চায় একদল মানুষ। দেশের সর্বত্র এদের বাস। হাতে আছে টাকার থলি। মাধুরী এই জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়। না হলে বাঁচার উপায় কি? কে তার অভিমানের এবং দুঃখের দাম দেবে?

তারপর মাধুরীর বাচ্চা জন্মাল এই জলপাইগুড়ির পতিতালয়ে। কিছুদিন রেহাই দিল বাড়িওয়ালী মাসি। মাধুরী একটু সুস্থ হতে, গায়ে শক্তি পেতে, আবার তাকে প্রতিদিনের জীবনে ফিরে যেতে হল। মাসি বাধ্য করল। তার টাকা চাই। ঝনঝনিয়ে টাকার বাজনা না শুনলে মাসির রাত্রের ঘুম হয় না। বাজারে কত তার খাতির। ভাল ভাল বাবুরা আসে পল্লিতে। তারা বলে—মাসী নয়া কোন কবুতর এসেছে নাকি?

জলপাইগুড়িতেও থাকল না মাধুরী। মাসি হঠাৎ মারা গেল। মাধুরী ঘর ছেড়ে এ-জায়গা ও-জায়গা করে। শেষে উদাসের শহরে স্টেশন বাজার পতিতাপল্লিতে আশ্রয় নিল। উদাস বলল—বড় কষ্টের জীবন তোমার। বড় দুঃখের। কি ছিল, কি হল!

—শুধু আমার নয় উদাস। আমাদের দেশে বহু মেয়ে আমার মতো আশ্রয়হীনা। তারা ঘর বাঁধে সুখের জন্যে। সুখ থাকে না। ঘর ভেঙে যায়। শেষে আশ্রয় মেলে, ঠাঁই হয় কোন পতিতাপল্লিতে। শুধুমাত্র বাঁচার তাগিদে, পেটের ক্ষুধা মেটাতে, এ জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে।

—এ কলঙ্ক তোমার একার নয় মাধুদি। আমাদের সকলের। মাধুদি ফিরে গেল তার কোঠীতে। সেখানে তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে একদল ক্ষুধার্ত নেকড়ে।

॥৮॥

উদাস সাইট থেকে ফিরে এল আটটা নাগাদ। কোম্পানির প্রোডাকশন বাড়ছে। বাড়ছে তার সঙ্গে উদাসের কাজ। আরো লেবার নিয়োগ করা হয়েছে। তাদের টাকাপয়সার হিসেব রাখতে হয় উদাসকে। সে অফিস সামলায়। দুজন সুপার ভাইজার আছে। ম্যানেজার একজন। সাইটে উদাসকে ঘোরাঘুরি করতে হয় না। এয়ারকুলার-শোভিত অফিসঘরে কাজ উদাসের। খাতাপত্র দেখে। আর্থিক লাভক্ষতি দেখে। উদাসকে টাইপ রাইটার মেশিন দিয়েছেন, ক্যালকুলেটর দিয়েছেন দেবেশবাবু। এরপর দেবেন কম্পিউটার। সর্টকোর্সে ভর্তি হতে হবে উদাসকে কোন ট্রেনিং সেন্টারে। উদাস ঠিক করেছে, সে রাত্রের দিকে উইন্ডো কোর্স শিখবে। শহরে

ট্রেনিং সেন্টারের অভাব নেই। রাত্রি ১০টা পর্যন্ত খোলা। উদাস এখন দেবেশ দত্তের প্রিয়পাত্র। একান্ত বিশ্বাসভাজন। তিনি বলেন—উদাস, তুমি বড় কাজের ছেলে। ভাগ্নে সুনীলকে বলেছেন—উদাস খুব সৎ। আজকাল সৎ লোক পাওয়া খুব কঠিন। এমন কাজের লোক পাওয়া যেকোন কোম্পানির পক্ষে সৌভাগ্যের ব্যাপার।

আজকাল বাড়িতে ফিরে তেমন একটা টিফিন করতে হয় না উদাসকে। সে ব্যবস্থা সাইটে করে দিয়েছেন দেবেশ দত্ত। দেবেশ প্রায় আসানসোল চলে যান। তখন সব কাজ উদাসের উপর। এখানে থাকার কটেজ আছে। তিনখানা ঘর। সুসজ্জিত। দেবেশ মাঝে মাঝে থাকেন। ইচ্ছে করলে উদাসও থাকতে পারে।

ফেরার সময় স্টেশন বাজারের স্টপেজে নেমে দেখল উদাস, বুবুন কয়েকটি ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে। ওরা গল্প করছে। সোজা কথায় আড্ডা মারছে। তখন কথাটা মনে পড়ল। উদাস বলল ডেকে বুবুনকে—হ্যাঁ রে বুবুন, তোর বন্ধু সুধাকর ঠিক ঠিক পড়াচ্ছে তো?

—হ্যাঁ উদাসদা, একেবারে ঠিকঠাক। সুধাকর এখন নায়েক পরিবারের সদস্য বলতে পার। দুই ছেলেমেয়ের দায়দায়িত্ব সুধাকরের। সন্ধ্যায় পড়াতে গেলে বাড়ি ফিরতে সুধাকরের রাত্রি দশটা। রাতের খাবার ওখানেই খায় সুধাকর। নায়ককাকুর নির্দেশ। বলতে পার, নায়েক কাকিমার হুকুম।

—বাঃ সুন্দর। শুনে ভাল লাগছে বুবুন।

—এখন সুধাকরকে দেখলে তোমার অচেনা মনে হবে। রোগা চেহারা আর নেই। চকচকে হয়েছে। পরনে দামী প্যান্টশার্ট। পায়ে জুতো। আগে ছিল চটি। সব নায়েককাকুর খরচ। মায়া বসে গেছে সুধাকরের উপর। মায়ার বন্ধন বড় কঠিন উদাসদা।

—তা আর বলতে। যেমন তুই আমাকে, আরও দশজনকে মায়ার বন্ধনে বেঁধে রেখেছিস। ইচ্ছে করলেও সে বন্ধন কাটানো যাবে না। বুবুন লজ্জা পেল। বলল—কি যে বল উদাসদা। বরং তোমরাই আমাকে ভালবাসার বন্ধনে আটকে দিয়েছ। আমি পালাতে পারছি না।

—বেড়ে বলেছিস বুবুন। বুবুনের পিঠে একটা সস্নেহে চাপড় মারে উদাস।

বাড়ি এল উদাস। মা বললেন—তুই এলি, আমি যাই রাণীদের বাড়ি একটু ঘুরে আসি। রাণীর মা ডেকেছে। তখন মনে পড়ে গেল উদাসের। রাণীকে কথাটা বলা দরকার। এখনও তো তার মায়ের আপত্তির কথা বলা হয়নি রাণীকে।

—মা, তুমি তো ওদের বাড়ি যাচ্ছ, রাণী যদি ঘরে থাকে, একটু ডেকে দিও। বলবে, আমি ডাকছি।

—পাঠিয়ে দিচ্ছি রাণীকে।

মা চলে গেলেন। মিনিট ২৫ পর রাণী এসে হাজির। উদাস তখন টিভি দেখছে। রাণী বলল—তুমি আমাকে ডেকেছ উদাসদা?

—হ্যাঁ রাণী।

—কিছু বলবে?

—বোস। তোর সঙ্গে আলোচনা আছে। টিভির সাউণ্ডটা কমিয়ে দিল উদাস। রাণী তার সামনে বসল। মোড়ায়। বলল সে, বল কি বলবে?

—বলছিলাম কি, তুই তরুণ দাসকে চিনিস?

—ওমা, চিনব না কেন? ভাল করেই চিনি। খুব চিনি। কিন্তু কেন?

—তুই ওকে বিয়ে করতে চাস?

—ও হরি, তুমি এসব কথা জানলে কি করে? নিশ্চয় মা তোমাকে বলেছে।

—ইয়ে, হ্যাঁ বলেছেন মাসিমা।

—মা কি বলেছে তা বল? অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন?

—না, ব্যাপারটা হচ্ছে, তুই তরুণ দাসকে বিয়ে করতে চাস, মানে চাইছিস, তোর মা সেটা চাইছেন না।

—কি চাইছে মা তাহলে?

—তোর মা তোর বিয়ে দিতে চাইছে অন্যত্র।

—কিন্তু কেন? তরুণদা ভাল ছেলে। দেখতে সুন্দর। আমি তাকে ভালবাসি। তাকে আমি বিয়ে করব। মাকে জানিয়েছি। এ-নিয়ে এত কথা উঠছে কেন?

—তোর মা বলছিলেন, তরুণ দাস একটা গুমটি করে, ব্যবসা ভাল চলে না, রোজগারপাতি তেমন নেই। ওর বাবা মা অসুস্থ। বিয়ে হলে তোর কষ্ট হবে। খাওয়া পরার কষ্ট।

—তরুণকে নিয়ে আমার একটা প্ল্যান আছে। দারুণ প্ল্যান। থাক, এখন তোমাকে সেসব বলব না। বিয়ে হলে ক্রমশ জানতে পারবে। আর্থিক কষ্ট কেন হবে? আমি ভাল রোজগার করি। আজ তরুণ ভাল রোজগার করে না ঠিকই, কিন্তু কাল করতে পারে। পারে না?

—তা পারে। তাহলে তুই তরুণকেই বিয়ে করছিস?

—একশবার। ওর সঙ্গে আমার ভালবাসা গভীর। মায়ের কথা তো বললে, তা তোমার মতামত কি?

—আমার আবার কিসের মতামত? তুই যদি তরুণকে বিয়ে করে সুখী হোস, তাহলে আমি খুশী। রাণী হঠাৎ একটু হাসল। উদাস লক্ষ্য করল না। রাণী বলল তারপর—

—এ বিয়ে আমি এক্ষুণি ভেঙে দিতে পারি, তবে একটা শর্ত আছে।

—কি শর্ত?

—তুমি আমাকে বিয়ে কর উদাসদা। আমি তরুণকে বাদ দিয়ে দেব। উদাস আঁৎকে উঠল। প্রায় চীৎকার করে উঠল—

—তুই বলছিস কি রাণী? তুই কি সুস্থ? তুই প্রতিবছর আমাকে ভাইফোঁটা দিস। আমি তোর দাদা। এমন কথা বলিস কি করে?

—অন্তরের তাগিদ থেকে বলি। আর তোমার সঙ্গে ভাইফোঁটার কথা বলছ, মন থেকে করি না। বাধ্য হয়ে করি। একটা সম্পর্ক রাখতে হবে তো। সব আমার লোকদেখানো।

—উঃ রাণী, তুই চুপ কর। এসব কথা আমার সহ্য হচ্ছে না। মাথা ধরিয়ে দিলি।

—তাহলে তুমি আমাকে সাপোর্ট কর। মাকে বুঝিয়ে বল। আমি তরুণদাকে বিয়ে করি। না হলে তুমি আমাকে বিয়ে কর। তাতে মা খুশী হবে। আমিও হব।

—তুই এখন আয় রাণী। আমাকে একটু একা থাকতে দে।

—তুমি আমাকে ডেকে পাঠালে, আমি এলাম, আবার তুমিই চলে যেতে বলছ। ভারী অদ্ভুত লোক তুমি উদাসদা।

—হ্যাঁ বলছি। তোর ইয়ার্কি আমি সহ্য করতে পারছি না।

—ঠিক আছে, চললাম। তুমি সারারাত ধরে ভেবে, কাল আমাকে বলবে, তুমি কি চাও। আমি তোমাদের দুজনকেই ভালবাসি। যে কেউ আমার স্বামী হতে পারে। আমার এতটুকু আপত্তি নেই। রাণী চলে গেল হাসতে হাসতে।

উদাসের টিভি দেখা মাথায় উঠল। সে টিভি বন্ধ করে দিল। উঃ কি সাংঘাতিক মেয়ে রাণী! কেমন ফাঁসিয়ে দেওয়ার মতলব উদাসকে। তুই তরুণকে বিয়ে কর রাণী। আমার কোন আপত্তি নেই। ঠিক আছে, আমি তোর মাকে বোঝাব। রাজি করাব। না করতে পারলে বিপদ তো আমারই। কালই তোদের বাড়ি যাব। তোর মাকে বলব। হাত ধরব মাসিমার। দরকার হলে পায়ে ধরব। আরে, মা এখনও কেন আসছে না? কত গল্প করবে মা রাণীদের বাড়িতে? এদিকে ক্ষিদে পেয়ে গেছে উদাসের। ক্ষিদে জাগিয়ে দিল রাণী। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে বাঁচে উদাস। কিন্তু ঘুম আসবে কি? রাণীর কথাবার্তা কি ঘুম আসতে দেবে?

।।৯।।

পরদিন সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি সাইট থেকে ফিরল উদাস। তারপর গেল রাণীদের বাড়ি। রাণী তখন ছিট কাটছে। সঙ্গে তিনটে মেয়ে। তারা সেলাই মেশিন চালাচ্ছে। এ॰ন প্যান্ট শার্ট তৈরি করছে রাণী। আগে শুধু ফ্রক বানাত। এখন নাম হয়েছে রাণীর। ব্যাপক অর্ডার পাচ্ছে। রাণী বলল—কি খবর উদাসদা? কি মনে করে?

—কেন আসতে নেই নাকি?

—আমি কি তাই বলেছি? এ তো তোমারও বাড়ি। যখন খুশি আসবে। কে বারণ করছে? রাণীর কথা শুনে উদাসের গা জ্বলে গেল। রাণী কি ওকে বিদ্রূপ করছে? সব জেনে না জানার ভান করছে! গম্ভীরভাবে বলল উদাস—মাসিমার সঙ্গো দরকার আছে। তাই এসেছি।

—ও, তাহলে আমার সঙ্গো নয়! ঠিক আছে, যাও, মা রান্নাঘরে। রান্নাঘরটা পিছন দিকে। উদাস গেল। মাসিমা রাঁধছেন।

—মাসিমা?

—কে? আরে উদাস? এস বাবা এস। কিছু বলবে?

—হ্যাঁ মাসিমা।

—তাহলে ভিতরে এস। এই পিঁড়িটায় বস। বল কি খবর? রাণীর সব কথা ভাবল উদাস। তবে কিছুটা অংশ বাদ দিয়ে। বলল, মাসিমা, আমি অনেক চেষ্টা করে দেখলাম। হল না। রাণী তরুণকেই বিয়ে করবে। আপনি চান, বা না চান, ও যখন সিদ্ধান্ত নিজে নিয়েই ফেলেছে, তখন কোন উপায় নেই। এ বিয়ে হবেই। আপনি বাধা দেবেন না। শুধু শুধু অপ্রিয় হওয়া। ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হওয়া। কেন অশান্তি ডেকে আনা? এই দেখুন না, কাল রাত্রে আমার ভাল ঘুম হল না। প্রায় বলতে পারেন, সারা রাত্রি জেগে।

—কেন বাবা?

—ওই যে তরুণকে বিয়ে করার ব্যাপারে। আমি না বলাতে খেপে গেল রাণী। যা মুখে এল বলল। বলল—এসব ব্যাপারে আমি কেন কথা বলছি। আমি তরুণকে ভালবাসি। তরুণকেই বিয়ে করব। দেখি, কার সাধ্য, কে আটকায়? আমি রাণীকে ম্যানেজ করতে পারলাম না। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনার কাজ আমি করে দিতে পারলাম না। এইসব নিয়ে আমার টেনশন হল। ফল, রাত্রে ঘুমের দফারফা।

—তোমার মতো আমারও একই অবস্থা বাবা। রাত্রে আমার ঘুম আসে না। রাণী আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

—তাই তো বলছি মাসিমা, আপনি হ্যাঁ বলে দিন। সমস্যার সমাধান হয়ে যাক।

—তাহলে এ বিয়ে কিছুতেই আটকানো যাবে না বলছ?

—একদম না।

—রাণী কি নিজের ক্ষতি বুঝতে পারছে না?

—ও বলছে, এ বিয়েতে ওর কোন ক্ষতি হবে না। সবটাই লাভ। তারপর কি সব প্ল্যান আছে বলল।

—কি প্ল্যান?

—তা তো জানি না। রাণী শুধু বলল, আমার একটা প্ল্যান আছে। কথাটা ভাঙল না। পরে বলবে বলল।

—কি জানি বাবা, ভগবানের কি ইচ্ছে। শেষে মেয়েটা ভেসে না যায়!

—রাজি না হলে আপনি ভেসে যাবেন। রাণী আপনাকে ভাসিয়ে দেবে। তা মেশোমশাই কি বলছেন?

—ওঁর কথা বল না। উনি বলছেন, রাণী যা চাইছে, তাই করতে দাও। বাধা দিও না। দিলে ফল খারাপ হবে। রাণীকে ভয় করেন তো।

—মেশোমশাই কিন্তু ঠিকই বলছেন মাসিমা। বুদ্ধিমান লোক।

—তোমার মেশোমশাই বুদ্ধিমান লোক! কবে হল? উনি চিরকালই বোকা।

—ওটা উপরে মাসিমা। আসলে মেসোমশাই খুবই চালাক।

—কি জানি বাবা, তোমার কথাবার্তা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কেমন গোলমাল ঠেকছে।

—মাসিমা, ব্যাপারটাই যে গোলমেলে। ঠিক আছে, এখন আমি উঠি। মেসোমশাই কই? একটু কথা বলে যাই।

বুবুনের বাবা, রাণীর বাবা, গোপালবাবু একেবারে সাদামাটা লোক। করেন কোর্ট প্রাঙ্গণের মুহুরীগিরি। সকাল সাড়ে ৯'টায় বেরিয়ে যান বাড়ি থেকে। স্টেশন মোড় থেকে বাস ধরে একেবারে বাসস্ট্যাণ্ড। সেখান থেকে উত্তরমুখী রাস্তা ধরলে কোর্ট কম্পাউণ্ড। বগলে থাকে তাঁর দপ্তরী। হাতের থলেতে নানা ফাইল। নির্দিষ্ট বসার জায়গা আছে। সেখানে মাদুর পেতে দপ্তরী খুলে বসেন। টুকটাক মক্কেলের উঁকিঝুঁকি শুরু হয়।

—মুহুরীবাবু, আজ আমার দিন আছে, দেখুন তো।

—মুহুরীবাবু, উকিলবাবু ক'টায় আসবেন?

—আরে রোসো রোসো। সব হবে। মামলা হবে, উকিলবাবু আসবেন, সব ঠিকঠাক হবে। ডায়েরি খুলে দেখছি। হ্যাঁ উকিলবাবু আসবেন ঠিক এগারোটায়। কোন চিন্তা নেই। আজ তোমার মামলার দিন বটে। তা টাকাপয়সা কিছু এনেছ?

—টাকাপয়সা কোথায় পাব মুহুরীবাবু। আমি গরিব মানুষ। পরের ঘরে খেটে খাই।

—তাহলে কেস করার সখ কেন বাপু? কোর্ট কাছারী মানে তো পয়সা। যার নেই সে সুবিচার পাবে না। গরিব লোকের জন্যে কোর্ট নয়। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের নাম শুনেছ?

—আমাদের গাঁয়ে এক বঙ্কিমবাবু আছেন, খুব টাকার গরম। অনেক জমিজমা, সুদের কারবার। লোকের উপর অত্যাচার করেন, জবরদস্তি জায়গা দখল করেন। তাকে চিনি আমি।

—না হে, ও বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলছি না। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র। লেখাপড়া তো শিখলে না। চিরকাল ডাং মুখ্যু থেকে গেলে। আসল বঙ্কিমচন্দ্রকে চিনবে কি করে?

—লেখাপড়া শিখে কি হবে বাবু? গাঁয়ে থাকি, পরের জমিতে খাটি, গরিব মানুষ, তা বাবু বেশ আছি। যেদিন কাজ পাই, সেদিন খাই। না জুটলে কাজ, সেদিন উপোষ করি। তা আজ্ঞে ঠাকুরের কৃপাতে অনেক উপোষ করেছি। এখন আর কষ্ট হয় না। ভালই লাগে।

—আমড়াশোলের নাম শুনেছ?

—না বাবু। আমড়া গাছ চিনি।

—তাহলে থাক ওকথা। শোন বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, কোর্ট কাছারি তামাশার জায়গামাত্র। বড়লোকেরা পয়সা খরচ করিয়া তাহা দেখিতে যায়। কিছু বুঝলে?

—আজ্ঞে না।

—তোমার বোঝাবুঝিতে কাজ নেই। দাও দেখি, দশ টাকা, না হয় পাঁচ টাকা দাও। বউনিটা করি। নিবারণ মক্কেল পকেট থেকে একটা টাকা বের করে মুহুরী গোপালবাবুর হাতে দিল। বলল, এই নিন বাবু, ষোলআনা দিলাম।

—এই ষোলআনায় কি হবে? এটা কি ঠাকুর দেবতার স্থান? এটা তো আদালত। দেখি দেখি তোমার পকেট দেখি, পকেটে হাত ভরে দিলেন গোপালবাবু, পাঁচ টাকা বের করে আনলেন। এটা কি হে?

—না বাবু, ওটা নিয়েন না। দু টাকার চপ মুড়ি খাব, তিন টাকা বাসভাড়া। পয়সা না দিলে বাসওয়ালা ঘণ্টা মেরে বাস দাঁড় করিয়ে মাঝরাস্তায় নামিয়ে দেবে। কোন কথা শুনবে না। তখন হাঁটা ছাড়া গতি থাকবে না।

—ও। তাহলে ফেরৎ দিচ্ছি। মক্কেলের পকেটের পাঁচ টাকা ফিরিয়ে দিলেন মুহুরীবাবু। আজ তোমাকে ছেড়ে দিলাম বটে, পরের দিন কিন্তু ছাড়ব না। আজ তো তোমার দিন আছে হে। তা বলি—উকিলবাবুর টাকাটা এনেছ?

—আজ্ঞে না। ফীটা বাকি রাখব।

—তাহলে উকিলবাবু তোমার কেস খারাপ করে দেবে। তখন কি হবে?

—পরের দিন ঠিক সুদে-আসলে মিটিয়ে দেব। আপনি আমার হয়ে একটু বলে দেবেন। উকিলবাবু আপনার কথা শুনবে। আপনার দয়ার শরীর। গরিবের বন্ধু। ঘরে একটা গাই বিয়োবে বাবু। আজকালের মধ্যে বাছুর হবে। পাঁচ কেজি করে দুধ দেয়, ভাল খাওয়ালে সাত কেজি পর্যন্ত হতে পারে, সে

দুধ বিক্রি করে সব টাকা শোধ করে দেব। না হয় পাঁচ টাকা বেশিই দেব আপনাকে।

—না হে না, বেশি কেন দেবে? ধর্মের ভয় আছে না? যা আমার প্রাপ্য তাই নেব। ঠিক আছে, তোমার নামে খরচ লিখে রাখছি, পরের দিন মিটিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

—কোন্ শালা না দেয়, বলে নিবারণ কাঁচুমাচু হয়ে গেল। এ হে বাবু, কিছু মনে করবেন না, খারাপ কথা বলে ফেললাম।

—আদালতে খিস্তিখেউর চলে হে। না হলে আদালত মানাবে কেন? শুনতে পাও না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে উকিলবাবুরা নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়া করে মক্কেল নিয়ে, তখন কত কি হয়। শোননি নিবারণ?

—আজ্ঞে তা শুনেছি। তবে কথা হচ্ছে, উকিলবাবুরা শিক্ষিত লোক। তাঁদের মুখে যা মানায়, আমরা মুখ্যু লোক, আমাদের মুখে তা মানায় না মুহুরীবাবু।

—তুমি তো বড় রসিক হে নিবারণ। তুমি বোকা নও। বোকা সেজে থাক। উকিলের কানকাটা মক্কেল মনে হচ্ছে।

—বাবু এখন একটু আসি। বড় ক্ষিদে পেয়েছে। সকাল থেকে কিছু খাওয়া হয়নি। চা মুড়ি খেয়ে আসি। ওদিকে উকিলবাবু আসুন।

এই ধরনের মক্কেল গোপাল ভট্টাচার্যের। তাঁর উকিলেরও জোর নেই। মুখ নেই। আইন ভাল বোঝেন, ড্রাফ্ট মন্দ করেন না, কিন্তু যদুপতি উকিল ভাল সওয়াল করতে পারেন না। তো তো করেন। মক্কেলরা এ ধরনের উকিল পছন্দ করে না। তারা চায় টাট্টু ঘোড়ার মতো উকিল। যে কোর্টরুমে লাফাবে ঝাঁপাবে, সাক্ষীকে জেরা করে জিব বের করে দেবে, বাংলা বলবে না, ফরফর করে ইংরেজি বলবে জজ সাহেবকে, আরে হারজিৎ তো মক্কেলের ভাগ্য, জজসাহেবের ব্যাপার, তাতে উকিলবাবুর দোষ কি? কেসে হার হল বটে, কিন্তু উকিলবাবু কেমন লড়লেন দেখলে হে? কোর্টরুম গমগম করছিল। শূন্যে ঘুসি মারলেন কয়েকটা। কারুর গায়ে লাগলে কি হতো বল তো। এই হল গিয়ে আসল উকিল। উকিলের বাবা। উকিলবাবু বলেন—হার হয়েছে তো কি হয়েছে. এবার আমরা হাইকোর্টে যাব। সেখানে হারলে সুপ্রিম কোর্টে। একসময় ন্যায়বিচার পাবই। জিতবই। ঘাবড়িও না। যাও হে, টাকাপয়সা জোগাড় কর। টাকাপয়সা ছাড়া মামলা হয় না। জেতাও যায় না। আমার চেনা কলকাতার এক ব্যারিস্টার আছে, অনেক টাকা ফিজ, তা আমি বলে কমে-সমে করে দেব। সম্পর্কে আমার ভগ্নিপতি। আমার কথা না শুনে উপায় নেই তারাচরণবাবুর।

—তা কত টাকা লাগবে উকিলবাবু?

—হাজার কয়েক তো লাগবেই। তা সেসব হিসেব পরে হবে। কাল অন্তত হাজারখানেক এনে আমাকে দেবে। শিগ্‌গ্রী কেস ফাইল করতে হবে। দেরি হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। তুমি গাঁছাড়া হবে।

তা যদুপতি উকিল এত শত পারেন না। সবাই কি সবকিছু পারে? তাই তার রোজগারপাতি কম। মক্কেল কম বলে মুহুরি গোপাল ভট্টাচার্যের আয়-চায় ভাল নয়। এককালে খুব কষ্টে কেটেছে গোপালবাবুর। সংসারে দুবেলা দুমুঠো জোটাতে জিব ঝুলে গেছে। বাজারে, দোকানে দেনা। এখন আর সেসব নেই। মেয়ে রাণী ভাল রোজগার করে। সে টেলারিং ব্যবসাতে নাম করেছে। অর্ডারের পর অর্ডার। গোপালবাবু মেয়ের রোজগারে দাঁড়িয়ে গেছেন। মেয়েকে সবসময় খুশি রাখতে চেষ্টা করেন। তাকে ভয় পান। রাণী যাতে বিগড়ে না যায়। তাই রাণী যখন বলল—বাবা, আমি তরুণকে বিয়ে করব, তরুণকে চেনেন গোপালবাবু, তিনি বললেন—ভেবেচিন্তে বলছিস তো রাণী?

—হ্যাঁ বাবা।

—তাহলে ঠিক আছে। তোর যখন ইচ্ছে, তাই হবে। তা তোর মা কি বলছে রে?

—তরুণের সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলছে। ঘোর আপত্তি। তুমি একটু মাকে বোঝাও।

—দেখছি, কি করা যায়। বুঝলি, তোর মা'টা ভারি অবুঝ। বড় জেদী। ভালমন্দ বোঝে না। আরে বাবা, নিজের ভাল পাগলেও বোঝে। তোর মা আর কবে বুঝবে? আমি কিন্তু বুঝি।

—জানি বাবা। রাণী বলল।

॥ ১০॥

মা বললেন—বাবা উদাস।

—কি মা?

—তোকে একটা কথা বলছিলাম। আমি একবার তারাপীঠ যাব কালীদর্শনে। তোর কবে সময় হবে বাবা?

—তারাপীঠ যাবে? বেশ তো চল না। সামনের রবিবার চল। রবিবার তো আমার ছুটির দিন মা। সকাল ৭টায় নর্থ বেঙ্গলের বাস। ৯টার মধ্যে তারাপীঠ পৌঁছে যাব। তুমি পুজো দেবে। প্রসাদ খাবে। তারপর বিকেলের বাসে ফেরা। সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছে যাব।

—কত বছর আগে তারাপীঠ গেছি। অখন আর ভাল মনে পড়ে না। শুনেছি, আজকাল বড় ভীড় হয়।

—তুমি যে তারাপীঠ দেখেছ, এখন সে তারাপীঠ নেই মা। কত কত লজ, হোটেল, মানুষের ভীড়ে একাকার। কলকাতা ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে দলে দলে লোক আসে। উত্তরপ্রদেশ রাজস্থান দিল্লি মধ্যপ্রদেশ থেকেও আসে মানুষ। তারাপীঠ এখন ভারতবিখ্যাত এক পীঠ। সাহেব মেমরাও বাদ যায় না।

রবিবারের সকাল। বেরুচ্ছে মাকে নিয়ে উদাস। সে দেখল, গুটি গুটি পায়ে এদিকে আসছে রাণী। হাতে তার ব্যাগ।

—কোথায় যাবি রাণী?

—তারাপীঠ।

—তার মানে?

—বাঃ তোমরা তারাপীঠ যাবে, আর আমি যাব না? মাসিমা আমাকে যেতে বলেছেন। আসুন মাসিমা, পা চালান, দেরি হলে বাস ফসকে যাবে। উদাস বুঝল, মা নিশ্চয়ই রাণীদের বাড়িতে গল্প করেছেন রবিবার তারাপীঠ যাচ্ছেন। রাণী শুনেছে। তখনই সে আবদার করেছে, মাসিমা আমিও যাব। কেউ যেতে চাইলে মা কাউকে না বলেন না। উল্টে বলেন—তুমি যাবে? বেশ তো চল না। তাহলে ভালই হয়।

রাণীকে লক্ষ্য করল উদাস। বেশ একটা শাড়ি পড়েছে রাণী। শাড়িটার কালার কম্বিনেশন ভাল। দারুন। রাণী বেশ ম্যাচিং শাড়ি কেনে। কোন্ মেয়েকে কোন্ শাড়িতে মানাবে, তা ঠিক করতে হলে রাণীর সঙ্গে পরামর্শ জরুরি। রাণীর চেহারাটাও আজকাল বদলে গেছে। আগে রাণীর চেহারা ছিল দুর্বল, কেমন রোগা-পাতলা, তাকে ঢ্যাঙা দেখাত। সারাদিন রাণী ঘরের কাজ করে। বাসনমাজা, জল আনা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, মোছা, তার সঙ্গে মাকে রান্নার জোগান দেওয়া, ঘরসংসারের কাজ কি কম, একটা শেষ হলে আর একটা। এইসব করে রাণীর সারাদিন কাটত।

এখন রাণী সেসব করে না। শুধু কাপড় ছিট কাটে, মেশিনে চড়ায়, ঘড় ঘড় করে মেসিন চলে, সৃষ্টি হয় প্যাণ্ট জামা ফ্রক সায়া ব্লাউজ আরো কত কি। সময় নেই বাড়তি রাণীর হাতে। তাই ঘরসংসারের কাজ তার করা হয় না। তার জন্যে রাণী একটা কাজের মেয়ে রেখে দিয়েছে। আভা। কাজেকর্মে সে দক্ষ। চটপটে। বয়স কম। কাজ করতেই তার আনন্দ। সেই চালাচ্ছে সংসার। রাণী খুশি। মা খুশি। খেয়াল করে দেখল উদাস, রাণীর স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে। তাকে মজবুত দেখাচ্ছে। ঢ্যাঙা লাগছে না। চোখেমুখে একটা আলাদা সৌন্দর্য ভাসছে। গায়ের চাপা রঙ উজ্জ্বল এখন। না, স্বীকার করতে হয়, রাণী এখন সুশ্রী এবং কান্তিময়ী। শেষ পর্যন্ত রাণী কি সুন্দরী হয়ে উঠবে?

বাস এসে গেল। নর্থ বেঙ্গল বাস। বাসটা নতুন। ঝকঝক করছে। বাসে উঠে পড়ল মা রাণী উদাস। বাস ছাড়ল। ছুটে চলেছে গাড়ি। হু হু করে বাতাস ঢুকছে। আমেজে শরীর মন জুড়িয়ে গেল উদাসের।

তারপর তারাপীঠ পৌঁছে গেল একসময়। মা বাস থেকে নেমে চারদিক দেখে বললেন—হ্যাঁরে উদাস, এ যে সব বদলে গেছে। আগের মতো কিছু নেই। এত এত বাড়ি, এত এত মানুষ, ভাবা যায় না।

—চিরদিন কি একরকম থাকে মা সবকিছু? ঠিক বদলে যায়। এই রাণীকেই দেখ না, আগে কেমন পটকা ছিল, মনে হতো হাঁটতে গেলে উল্টে যাবে, এত রোগা, আর এখন দেখ কেমন স্বাস্থ্যবতী হয়ে উঠেছে।

রাণী বলল—চেহারা নিয়ে খুঁটবে না উদাসদা, কত কষ্ট করে আমি চেহারাটা বাগিয়েছি। কেন তুমি নজর দিচ্ছ! অভিশাপ লেগে যাবে। আবার ঠিক মরা মরা হয়ে যাব। মা হাসলেন—তোদের দুজনের সবসময় ঝগড়া।

রাণী বলল—আমার ক্ষিদে পেয়েছে মাসিমা।

মা বললেন—ক্ষিদের আর দোষ কি? চল উদাস, কিছু খেয়ে নিই। আমারও ক্ষিদে ক্ষিদে লাগছে। মায়ের ক্ষিদে না পেলেও মা একথা বলবেন। রাণীকে সাপোর্ট দিতে হবে যে।

একটা সমৃদ্ধ দোকানে তারা কিছু খেয়ে নিল। রাণী টাকা বের করতে যাচ্ছিল, এখন তো ওর অনেক টাকাপয়সা, উদাস বলল—রাণী একদম বাহাদুরি করবি না।

—আমি দিই না!

—বলছি দিবি না। আমাকে পয়সা দেখাচ্ছিস? মা বললেন—রাণী, তুই আমাদের সঙ্গে এসেছিস, তুই কেন পয়সা খরচ করবি? তুই আমার মেয়ে। উদাস তোর দাদা। দাদা বোনের খরচা দেবে, যেমন মায়ের দিচ্ছে। এটা উদাসের কর্তব্য।

এরপর ঘোরা। শ্মশান দেখা হল। সেখানে একটা মৃতদেহ দাহ হচ্ছে। আর একটা অপেক্ষা করছে। পঞ্চভূতে বিলীনের অপেক্ষায়। এই তো জীবন। একদিকে চলাচল। অন্যদিকে থেমে যাওয়া। উদাস দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করল। বলল—চল মা, এখানে আর নয়। একাধিক মন্দির দর্শন হল। মা তারামায়ের পুজো দিলেন। রাণীও। উদাস বলল—মা আমার জন্যে পুজো দিলেন, তুই কার জন্যে দিলি রাণী?

—বলব না।

—না বললেও জানি আমি।

—কে?

—তরুণের জন্যে। হঠাৎ লজ্জা পেয়ে গেল রাণী। তার লজ্জানত মুখে একটা খুশির আলো। হলুদ ফুলের রং। রাণী বলল—তুমি ভারি লজ্জা দিতে পার

·উদাসদা। তারপর প্রসাদ খাওয়া হল। মা প্রবলভাবে দেবদেবী বিশ্বাসী। বাবাও ছিলেন। মা নানান ধরনের পট কিনলেন। প্রসাদ দেবার জন্যে গজা, নকুলদানা, মণ্ডা কিনলেন। বিকেল গড়িয়ে এল। এবার ফেরার বাস ধরার পালা। মা বললেন—খুব ঘুরলাম। মন ভরে গেল। আজ রাতে আমার পায়ে ব্যথা হবে ঠিক।

—বাড়ি ফিরে তুমি রাণীকে নিয়ে গা হাত পা টিপিয়ে নিও।

—ঠিক আছে, টিপে দেব। তা বলে তোমার নয়।

—আমি কারুর সেবা নিই না।

—মুখে সবাই ওটা বলে। শেষ পর্যন্ত কারোর সাহায্য নিতেই হয়। সময় আসুক। প্রমাণ হয়ে যাবে। বউয়ের সেবা নেবে না?

—না নেব না। বরং বউকেই আমি সেবা করব। মা কথা শুনে হেসে উঠলেন—তুই একটা পাগল ছেলে উদাস। কখন যে কি বলিস তার ঠিক নেই।

রাণী বলল—সেয়ানা পাগল। এরপর ঝগড়া হয়ে যাওয়ার কথা। উদাস নিজেকে সামলে নিল।

ফেরার সময়, বাসে উঠে, মা গলগল করে কথা বলছিলেন। অনেকদিনের বদ্ধ জীবন থেকে মা একদিনের জন্যে মুক্তি পেয়েছেন। নিত্য নৈমিকতার মধ্যে একটা ক্লান্তি থাকে, একটা বিষণ্নতা থাকে, আজ সেসব থেকে ছুটি। বদ্ধ জল ছাড়া পেয়েছে। সে তো তুফান তুলবেই। যদিও একদিনের মুক্তি! সেটাই বা কম কিসের!

মা বললেন—আজ একটা ইচ্ছে তোকে পূরণ করতে হবে আমার।

—কি মা?

—আমি একবার পুরী যাব। কত কত লোক যায়। যে যায় সে আনন্দে পাগল হয়ে যায়। জগন্নাথদেব তাকে পাগল করে দেন। তাঁর দর্শনে সব পাপ ধুয়ে যায়। শরীর মন সব পবিত্র হয়ে যায়। সে পরম সুখ। আমি একবার যাব।

—বেশ তো মা, ঠিক যাবে, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। গৌড়ীয় মঠের লোকেরা ভক্ত যাত্রী নিয়ে বাস ছাড়ছে। তোমাকে সে গাড়িতে তুলে দেব। ঘুরে আসবে পুরী।

—না বাবা, একা নয়, তোকেও যেতে হবে সঙ্গে।

—আমি কেন মা?

—তুই যে বাবা আমার জগন্নাথ। এক জগন্নাথ আর এক জগন্নাথকে দর্শন করবে না? না করলে সব অসম্পূর্ণ থেকে যায় বাবা।

রাণী বলল—আমি সঙ্গে যাব মাসিমা।

—তুই কেন যাবি রাণী আমাদের সঙ্গে? ততদিনে তোর বিয়ে হয়ে যাবে। তুই যাবি তোর বরের সঙ্গে।

—আমি কার সঙ্গে যাব, সেটা আমার ব্যাপার। আমি ঠিক করব। তুমি কথা বলার কে? আমাদের মা মেয়ের বিষয়ে তুমি আসছ কেন?

মা বললেন—তোরা ঝগড়া করিস না। হ্যাঁ রাণী, তুই আমার সঙ্গে যাবি। তোকে ছাড়া আমি যাব না।

রাণী বলল—দেখলে তো উদাসদা, আমার কেমন পজিশন। তোমার বাধা উড়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত মায়ের পুরী যাওয়া সম্ভব হল না। ইচ্ছেটা অপূর্ণ থেকে গেল। মানুষের সব সাধ, সব ইচ্ছে কি পূর্ণ হয়? বাকি থেকে যায় না? কিছু না কিছু থাকেই।

॥ ১১ ॥

সাইট থেকে ফিরে বিশ্রাম নিচ্ছিল উদাস। খবরের কাগজ পড়ছে। এখন সে চেয়েচিন্তে কাগজ পড়ে না। দুটো কাগজ নেয়। একটা বাংলা অন্যটা ইংরেজি। খবরের কাগজ পড়তে খুব পছন্দ করে উদাস। এই সংসারে, এই বিশ্বে, কত কি জানার আছে, খবরের কাগজে তার প্রতিফলন পাওয়া যায়। মা এখন রান্নাঘরে। কিছু একটা ভাজছেন মা। মায়ের নাকে ঝাঁজ লেগেছে। মাঝে মাঝে খুকখুক করে দু-একবার কাশছেন। রান্নার সুরভি এ ঘরে বাতাসে ভর করে পৌঁচেছে, উদাস নাক টানল। বেশ সুন্দর সুবাস।

বাইরে থেকে বুবুনের গলা পাওয়া গেল।

—উদাসদা।

—কে বুবুন? দাঁড়া দরজা খুলছি। দরজা খুলতে বুবুনকে দেখল উদাস। তার পাশে এক অপরিচিতা। মেয়েটি কে? তাকে আগে দেখেছে উদাস, তা নয়। নতুন মুখ। উদাস বলল— আয় ভিতরে আয় তোরা। দুজনে ঘরের ভিতরে এল। দুজনকে দুটি মোড়ায় বসতে দিল উদাস। নিজে বসল তক্তপোশের বিছানায়। এঘরে রাত্রে থাকে উদাস। বুবুন বলল—আলাপ করিয়ে দিই উদাসদা, ইনি হচ্ছেন কুন্তিদি। কুন্তি সরকার। রামকৃষ্ণ মিশন প্রচারপীঠের অন্যতম প্রচারিকা। নমস্কার করল উদাস। কুন্তিও। উদাস দেখল, ভদ্রমহিলা বেশ ফর্সা। এত ফর্সা, চট করে চোখে পড়ে যায়। গোল মুখ। ঝকঝকে দুটি চোখ। সাদা রঙের শাড়ি পরনে। ব্লাউজও সাদা। বেশ মানাচ্ছে। দেখে মনে হয়, মা সরস্বতীর প্রতিমূর্তি যেন। তবে মহিলা বিবাহিত নন বোঝা যাচ্ছে। হাতে শাঁখা নেই। সিঁথিতে সিঁদুর নেই, তাহলে কুমারী। বুবুন বলল—কুন্তিদি তাদের মিশনের জন্য কিছু অর্থসাহায্যের জন্যে তোমার কাছে এসেছেন। দেখ, তুমি কি করতে পার। বলুন কুন্তিদি আপনার কথা। কুন্তি বলল—তাহলে বলি আমাদের কথা।

—হ্যাঁ বলুন, বলতেই তো এসেছেন। হাসল সে। এরপর সে যা বলল, তার সার কথা এইরকম। রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠ এই শহরে রামকৃষ্ণ মন্দির বানাতে চান। জায়গা পাওয়া গেছে। হাইওয়ের কাছাকাছি। একজন দান করেছেন। কিন্তু মন্দির নির্মাণে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বেশ কয়েক লাখ টাকা খরচের ব্যাপার। মানুষের কাছ থেকে এই অর্থ সংগ্রহের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে কিছু অর্থ সংগৃহীত। তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় কম। বেশ কম। আরও তুলতে হবে। বুবুন বলল—তুমি যা দেবে দাও উদাসদা, তবে তোমার ইঁট কোম্পানির কাছ থেকে ভালরকম টাকা তুলে দিতে হবে।

—ঠিক আছে বুবুন। আমি চেষ্টা করে দেখব। আগে মালিক দেবেশ দত্তের সঙ্গে কথা বলি। তারপর জানাব তোকে।

কুন্তি বলল—আপনি একটু চেষ্টা করবেন।

—যথাসাধ্য করব। আপনারা একটা ভাল কাজ করছেন, যতটা পারি সাহায্য করব। অন্ততঃ চেষ্টা করব। আপনাদের সঙ্গে যখন বুবুন রয়েছে, ভালরকম টাকা তুলতে পারবেন বলে মনে হয়। বুবুনের সঙ্গে আগে আপনার আলাপ ছিল?

—না ছিল না। তবে নামটা শোনা ছিল। বুবুন সমাজসেবা করে তা জেনেছি। শহরের বেশ কিছু বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, অধ্যাপক, লেখক, ডাক্তার এবং বুবুনের মতো কিছু ইয়ং ছেলেকে নিয়ে আমরা প্রস্তুতি কমিটি গড়েছি। ইচ্ছে করলে, এই কমিটিতে আপনিও আসতে পারেন। তবে শর্ত একটাই, সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে।

—আমাকে লাগবে না। বুবুন থাকলেই আমার থাকা হবে। ওকে যত খাটাবেন, খেটে দেবে। বুবুনের ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই, উৎসাহের কমতি নেই।

—তার পরিচয় আমরা পেয়েছি। বহু মানুষের সঙ্গে বুবুনের যোগাযোগ। ওকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি, তত ওর গুরুত্ব বুঝতে পারছি। এপর্যন্ত অর্থ কালেকশনে কোথাও ব্যর্থ হইনি। কিছু না কিছু পেয়েছি। বুবুন পাইয়ে দিচ্ছে।

উদাস বলল—দাঁড়ান। একটু চা খান। মাকে বলে আসি। রান্নাঘরে গিয়ে উদাস মাকে তিন কাপ চায়ের কথা বলে এল। কুন্তির কথা বলল। একটু পরে মা চা এবং পাঁপরভাজা নিয়ে হাজির। চা খেতে খেতে কুন্তি ওদের মিশনের উদ্দেশ্য লক্ষ্য এবং কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করল। ব্যাখ্যা দিল। সমাজসেবা ওদের প্রধান কার্যাবলি। যেমন, পুজোর সময় ওরা গত তিনবছর ধরে, শহরের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরনো জামাকাপড় সংগ্রহ করেছে। গ্রামে গ্রামে গিয়ে গরিব ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়িদের মধ্যে তা বণ্টন করেছে। কুন্তি বলল, আমাদের দেশে কত লোক গরিব, কি সাংঘাতিক দরিদ্র, গ্রামে গ্রামে না ঘুরলে সেটা বোঝা যায় না। অনেকে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না এযুগেও। খাদ্য নেই পেটে, তাই স্বাস্থ্যও নেই। অসুখে ওষুধ নেই। জীর্ণদীর্ণ

সব মানুষ। থাক ও কথা। কত আর বলব? এবার পুজোর সময় আপনার বাড়ি আসব। যতটা পারেন পুরনো জামাকাপড় দেবেন।

—ঠিক আছে আসবেন। যতটা পারি দেওয়া যাবে। এরপর ব্যক্তিগতভাবে অর্থসাহায্য করল উদাস। কুন্তি টাকা নিয়ে রসিদ কেটে দিল। নমস্কার করে বিদায় নিল। যাবার সময় কুন্তি আবার বলল—ইঁট কোম্পানির কাছে অর্থসাহায্যের ব্যাপারটা একটু দেখবেন। চেষ্টা করবেন।

—হ্যাঁ দেখব। আমি কথা বলে, বুবুনকে বলে দেব। ওরা চলে যেতে মা বললেন— মেয়েটা কে রে?

—ওর নাম কুন্তি সরকার। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারিকা।

—মেয়েটা কি ফর্সা রে। এত ফর্সা মেয়ে চট করে চোখে পড়ে না। সাদা শাড়িতে ওকে চমৎকার মানিয়েছে বল।

—হ্যাঁ মা। তা ঠিক। চল মা, খেতে দাও। ক্ষিদে পেয়ে গেছে।

—আর একটু দাঁড়া বাবা। ভাত ফুটছে। গরম গরম ভাত খাবি। গরম ভাত তুই খুব ভালবাসিস।

—হ্যাঁ মা, ভাত খেতে আমার বেশ ভাল লাগে। গরম হলে তো কথাই নেই। তার সঙ্গে আলুসেদ্ধ। মা হাসলেন।

রাণীর বিয়ে হল। বিয়ে হল সেই তরুণ দাসের সঙ্গে। পাত্র তরুণ দাস, যে যুবকটি লাইনপাড়ের ওপারে একটি গুমটি দোকান করে ব্যবসা করে, যার বাবা-মা সুস্থ নয়, যার ব্যবসার আয় ভাল নয়, সেই তরুণকেই বিয়ে করছে রাণী ভট্টাচার্য। বিয়ে আজ রেজিস্ট্রি হচ্ছে। এই অসবর্ণ বিয়েকে পূর্ণ সমর্থন করে উদাস। এ ধরনের বিয়েকে সে উৎসাহিত করে। বলতে গেলে, প্রচার করে। এ ধরনের যত বিয়ে হবে, তা সমাজ এবং জাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক। একই ধর্মের লোকেদের মধ্যে কেন জাতিভেদ প্রথা? মানুষের আবার জাত কি? কেন এত বিভাজন? উদাস বিয়ে করলে, তার ছেলেপুলে হলে, সে নিজে তার ছেলেমেয়ের বিয়ে অসবর্ণ দেবে। তার স্ত্রী যদি আপত্তি করে, বাধা দেয়, সে গ্রাহ্য করবে না। সে দেখতে চায়, দেশ এগোচ্ছে।

আগে কালিবাড়িতে বিয়ে করেছে দুজনে। বিয়েটা রেজিস্ট্রি আজ। আইনসঙ্গত হবে। একটা প্রীতিভোজ দেওয়া হবে। রাণীর ইচ্ছে, অনেক লোক আমন্ত্রিত হোক। খরচ তার। তার হাতে এখন ভাল টাকা। রাণীর ইচ্ছেতেই সব। রাণীর মা এই বিয়ের বিরোধী। বাবা গোপালবাবু সাপোর্ট করেন এই বিয়েকে। বুবুনও। বাধ্য হয়ে রাণীর মা মত দিয়েছেন। নিমরাজি। পাত্রীপক্ষের সাক্ষী গোপালবাবু এবং উদাস। রাণী বলল—অন্ততঃ আমার হয়ে সাক্ষীটা দাও। তুমি আমাকে বিয়ে করবে না যখন।

—রাণী, কি আজেবাজে বকিস। তোর সঙ্গে আমার বিয়ে, ভাবলি কি করে!

—আমি তো ভাবি না উদাসদা। ভাবে আমার এই পোড়া মন। তাকে যে আমি বোঝাতে পারি না।

—কেন, তরুণকে তুই ভালবাসিস না?

—খুব ভালবাসি। যথেষ্ট ভালবাসি।

—তাহলে তুই আমাকে জ্বালাচ্ছিস কেন?

—ও তুমি বুঝবে না। আচ্ছা উদাসদা, একসঙ্গে দুজনকে ভালবাসার অসুবিধা কোথায়? একজন স্বামী, অন্যজন আত্মার আত্মীয়।

—তুই না একটা অদ্ভুত মেয়ে।

—আশীর্বাদ করো উদাসদা, যেন এমনি অদ্ভুত থাকি আমি সারাজীবন।

রেজিস্ট্রি অফিসে তরুণকে দেখল উদাস। এই প্রথম দেখল। বেশ চেহারা। সুদর্শন। প্রায় ছ'ফুট লম্বা। মাথায় রুক্ষ চুল। মুখ হাসিহাসি। না, স্বীকার করতে হবে, রাণীর পছন্দ আছে। তরুণের এই সুন্দর চেহারা রাণীকে বন্দি করেছে। তরুণের পক্ষে দুই বন্ধু ছিল। তারা সাক্ষী দিল। ওখানেই মালাবদল হল রেজিস্ট্রারের সামনে। সিঁদুর দান। রাণীর কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল তরুণ। তারপর সিঁথিতে। রাণীর মুখটা মেঘমুক্ত আকাশের মতো ঝকঝক করতে লাগল। রাণীর চেহারা এখন খুলেছে। এ চেহারা রাণী এতদিন কোথায় লুকিয়ে রেখেছিল? রাণী এখন অর্থগত দিক দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। তার পয়সায় বাড়িঘরের অনেক উন্নতি ঘটেছে। গোপালবাবু এসব কিছু করতে পারেননি। তাঁর রোজগার সামান্য। সেইজন্যে রাণীর মা গোপালবাবুর প্রতি প্রসন্ন নন। বলেন—বোকা লোক। রাণী গোপালবাবুকে প্রণাম করল। তারপর উদাসকে। উদাস নাটকীয়ভাবে বলল—তোর সুখী জীবন কামনা করি রাণী। তরুণও উদাসকে প্রণাম করল। উদাস প্রথমে হকচকিয়ে গেল। তারপর বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল—আহা, কর কি, কর কি তরুণ।

সবকিছু মিটে গেল মধুরতার মধ্যে। ওঁ মধু বাতারি। আকাশে মধু। বাতাসে মধু। সেদিন উদাস খাওয়া-দাওয়া করল রাণীদের ঘরে। মায়েরও নিমন্ত্রণ ছিল। মা একটা মহার্ঘ তাঁতের শাড়ি উপহার দিলেন রাণীকে। রাণী হাঁটু গেড়ে প্রণাম করল মাকে। পরম ভক্তিভরে। এ যেন নতুন রাণী। না, রাণী নয়, মহারাণী।

জ্যৈষ্ঠ মাস। গরম পড়েছে অসহ্য। সূর্যের কি উত্তাপ। সবকিছুকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। জ্বালিয়ে দিচ্ছে। মাঠঘাট বাড়িঘর ট্রেনের লাইন সব অগ্নিময় যেন। এত গরমে নদীনালা পুকুর কুয়ো সব শুকিয়ে কাঠ। কোথাও জল নেই। টিউবওয়েল অকেজো। শত ঘটাং ঘটাং করেও, তার মাথায় জল ঢেলেও, তার মুখ মৃত। পানীয় জলের সমস্যা। লোকে স্নান করতে পারে না। অথচ গ্রীষ্মের দিনে স্নান না করলে চলে?

একি শীতের দিন। পৌরসভা প্রয়োজনীয় জল দিতে পারছে না। তারা জানিয়েছে, মাটিতে জলস্তর নেমে গেছে, জল দেওয়া সম্ভব নয়। কোন বাড়ির ট্যাপওয়াটার কানেকশনে জল পড়ে না। বাড়ির বউ মেয়ে পুরুষরা রাস্তার কলের সামনে লাইন দিয়ে ভীড় করে। সকলের হাতে ক্যান বালতি ঘড়া ইত্যাদি। কিন্তু জল কই? এক ঘণ্টাও জল থাকে না। তাও সরু স্রোত। কেউ সামান্য জল পায়, কেউ পায় না। ঝগড়া হয়। চেঁচামেচি হয়। গালাগাল এবং কোথাও কোথাও মারপিঠ। শহরের এই জলছবি, জলচিত্র টানা কয়েক মাস।

উদাস একটা টিউবওয়েল থেকে দু বালতি জল বহন করে নিয়ে আসে। সেখানেও জলের হাহাকার। ভোর থেকে লাইন পড়ে।

উদাসের পরিচিত এক জল ভারী আছে। শ্যামলাল যাদব। বড় সরল মানুষ শামু। লোকটা বিহার থেকে এসেছে। পাটনার কাছাকাছি কোন গ্রামে বাড়ি। লোকের বাড়ি বাড়ি জল দিয়ে বেড়ায়। জল দিতে দিতে বুড়ো হয়ে গেল লোকটা। কি অসীম পরিশ্রম করে। তবু তার মুখে হাসি মিলিয়ে যায়নি। তাকে ধরল উদাস।

উদাস বলল—শামু, দাঁড়াও কথা আছে।

—জি সাব। সেলাম সাব।

—শামু, আমাকে প্রতিদিন দু ভারী করে জল দিতে পারবে? ঘরের কুয়ো একেবারে শুকিয়ে গেছে। মায়ের খুব কষ্ট হচ্ছে। তুমি যা দাম চাও, তাই দেব।

—জল পাওয়া মুশকিল বাবু। আমি সব ঘরে জল দিতে পারছি না। দেশ থেকে ছেলেকে এনেছি। ভাইপোকে এনেছি। তাতেও সবাইকে জল দেওয়া যাচ্ছে না।

—কোন উপায় নেই শামু? একটা ব্যবস্থা করা যায় না? মায়ের যে বড় কষ্ট!

শামু একটু কি যেন ভাবল। তারপর বলল—সাব, রাত ৯টায় যদি জল দিই, হবে?

—খুব হবে। কেন হবে না? সকালে হোক, রাত্রে হোক, কোন অসুবিধে হবে না। জল পেলেই হল।

—তাহলে আজ রাত থেকে জল পাবেন। মাকে বলে রাখবেন। আপনার মা চেনেন আমাকে।

—তোমাকে কে না চেনে শামু। তুমি কতদিনের পুরনো লোক। কবে থেকে দেখছি তোমাকে।

—আপ লোক কা বহুত মেহেরবানি। বহুত প্যেয়ার।

শামু চলে গেল। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল উদাস। একটা সুরাহা হল জলের। এবছর একটাও কালবৈশাখী হল না। না চৈত্রমাসে। না সারা বৈশাখ জুড়ে। প্রকৃতির ভাঁড়ার শূন্য। রাত্রে আকাশ ঝকঝকে। শুধু তারার মেলা। তারার আসর। একটুকরো মেঘ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোথায় গেল ওরা? কোন্ নির্বাসনে? দু-একদিন যখন অসহ্য

লাগে গরম, তখন ছাদে মাদুর বালিশ মশারি নিয়ে উঠে পড়ে উদাস। মশারি খুব কায়দা করে টাঙাতে হয়। মশারি না টাঙালে ঘুম অসম্ভব। মশার বড় উৎপাত। সারা শহর জুড়ে। লাখে লাখে নয়, সংখ্যায় ওরা কোটি কোটি। দিন রাত্রি উড়ে বেড়াচ্ছে। মানুষকে কামড়াচ্ছে। এক একটা কামড় এক একটা ইনজেকশনের সমান। এদের হাত থেকে যেন কিছুতেই নিস্তার নেই। মানুষ ম্যাট জ্বালাচ্ছে, মশা তাড়াবার কয়েল জ্বালাচ্ছে, কিন্তু কোনকিছুতেই কাজ হয় না। একমাত্র উপায় মশারি। তার চারদিকের সীমানার মধ্যে, ঘরের মধ্যে ঘর বানিয়ে, মানুষ বাস করছে। কে আবিষ্কারকর্তা মশারির! তার নাম জানে না উদাস। তবে তিনি উপাস্য মানুষ। প্রণাম তাঁকে। আরো উৎপাত আছে। তার নাম লোডশেডিং। তার তো সময় অসময় নেই। হলেই হল। যখন তখন। মানুষকে গলা টিপে মারছে অন্ধকারে। রবিবারেও লোডশেডিং ছুটি পায় না। আশ্চর্যের ব্যাপার!

॥ ১২ ॥

রাণী বাপেরবাড়ি, শ্বশুরবাড়ি করে বেড়াচ্ছে। ব্যালান্স রেখে চলেছে। যেমন সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৬টা পর্যন্ত বাপেরবাড়ি। এবং তারপর চলে যায় শ্বশুরবাড়ি। ফেরে আবার সকালে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি তার দৌড়াদৌড়ি। বাপেরবাড়িতে সে সারাদিন মেসিন চালায়। কাপড় কাটার কাজ করে। তখন এক দুঃস্থ মহিলা তার শ্বশুরবাড়ি দেখাশোনা করে। রান্নাবান্না করে। রাণীর শ্বশুর-শাশুড়িকে যত্ন করে। সেবা করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকে। রাণী গেলে তবে তার ছুটি। ওখানেই মহিলাটি খায়। শোয়। তাকে ভাল মাইনে দেয় রাণী। মহিলার কোন অভিযোগ নেই। রাত্রের রান্না শ্বশুরবাড়িতে। করে রাণী। শ্বশুর-শাশুড়ির সঙ্গে গল্প করে। তাঁরা আগে যতটা অসুস্থ ছিলেন, ঠিক ততটা নন এখন। রাণী আসার পর তাঁরাও সুস্থবোধ করছেন একটু একটু করে। রাণী কি ম্যাজিক জানে?

রাণীর শ্বশুরবাড়ি কাছেই। রেললাইন পেরিয়ে, একটা রাস্তার বাঁক নিলে তার শ্বশুরবাড়ি চোখে পড়ে। তরুণের গুমটিটাও ওখানে।

রাণীর এই যে সারাদিনের কর্মব্যস্ততা, দুটি পরিবারের দেখভাল, রোজগার করা, তার এই কর্মযজ্ঞ অবাক করে উদাসকে।

সে বলে—এত তুই খাটতে পারিস রাণী? সারাদিন কাজ আর কাজ। কোন বিশ্রাম নেই। এত শক্তি তুই কোথায় পাস রাণী?

—কাজকে আমি ভালবাসি উদাসদা। শুধু চুপচাপ হাত-পা কোলে করে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না। যে কাজ করে সে জীবিত মানুষ, না করলে মৃত। আমি বেঁচে থাকতে চাই উদাসদা। বহু বছর। অনন্ত কাল।

—তোকে যত দেখি, তত বিস্ময় লাগে। মা তোর কথা বলেন আমাকে। বলেন, বাহাদুর মেয়ে রাণী। তোর শ্বশুর-শাশুড়িও তো তোর নাম করে খুব।

—জানি, সবাই আমার নাম করে, শুধু তুমি ছাড়া।

—কেন, আমি তোর নাম করি না? এতক্ষণ তাহলে কি করলাম? নিন্দে?

—ও তুমি আমাকে খুশি করতে কর। মন থেকে কর না।

—হায় ভগবান, যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোর। কলিকাল বলে কথা! আমাকে চোর অপবাদ!

—হ্যাঁ তুমি চোর। তুমি আমার মন চুরি করেছ উদাসদা।

—এই শুরু হল প্রলাপ। এই কথার বুননি কবে ছাড়বি তুই? তুই কি আমাকে ক্ষেপিয়ে দিবি রাণী।

—তুমি আমাকে ক্ষেপিয়েছ বলে তোমাকে আমি ক্ষ্যাপা করি। বলে হাসতে হাসতে রাণী শ্বশুরবাড়ির রাস্তা ধরল। উদাস ভাবল, উঃ, রাণীকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না। ওকে শান্ত করা দরকার। কিন্তু কীভাবে? কোন্ উপায়ে?

চৈত্র গেল। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ গেল। কোন বৃষ্টিপাত নেই। আছে শুধু গোলা গোলা উত্তাপ। সকাল ৮টা থেকে নেমে আসছে মেঘহীন আকাশ থেকে। নির্মম এক হাণ্টার। কেবলই চাবুক মারে। জলের অভাবে শুধু মানুষ শুকাচ্ছে, তাই নয়, গাছ-পালা পশু-পাখি তারাও ক্লান্ত। বিধ্বস্ত। গাছের পাতাগুলো নুইয়ে গেছে। ওরা যেন বিষণ্ণতার শিকার। চাতক পাখিরা ডেকে ডেকে হয়রাণ। এরপর এল আষাঢ়। আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মানুষ বৃষ্টির আশা করেছিল। হল না। আষাঢ় মাসের দিনগুলো একে একে পার হতে লাগল। মানুষ গভীর যন্ত্রণা এবং দুঃখ নিয়ে বেঁচে থাকে। পথ ঘাট মাঠ জ্বলছে। দুপুরে রাস্তা-ঘাট, মাঠ খাঁ খাঁ। সর্বত্র মরুভূমির সংকেত। মানুষের চোখে ঘুম নামে না। রাত্রি জাগরণ। সবার চোখ আকাশের দিকে। মেঘ জমছে কি? ওদের নির্বাসনদণ্ড কি এখনও শেষ হয়নি? কে ওদের অভিশাপ দিয়েছে? কে সে?

আষাঢ় গেল। জলহীন মাস। এল শ্রাবণ। শেষ সুযোগ। শ্রাবণের শুরু থেকে মেঘের সঞ্চার। কখনও কখনও গুমগুম শব্দ নেমে আসে আকাশ থেকে। এতদিনে কি ফিরল ওরা? মেঘেরা? ৭ই শ্রাবণ। বৃষ্টি নামল। অজস্র ধারায় নামল। বেপরোয়া উদ্দাম বৃষ্টি। মানুষের আনন্দের শেষ নেই। শিশুদের কোলাহল। রাস্তায় রাস্তায় জলে ভেজা মানুষ। তারা লাফাচ্ছে। গান গাইছে। গাছের ডালপালাগুলো বাতাসে নড়ছে, পাতারা দুলে দুলে মাথা ভিজিয়ে নিচ্ছে। তাদের কেশরাশি থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে বৃষ্টি।

তা শ্রাবণধারায় সবকিছু বদলে যেতে লাগল। উত্তপ্ত ধরিত্রী শীতল হল। মাঠে মাঠে ঘাস গজাল। জমিতে জল দাঁড়াল। চাষী নামল কৃষিকাজে। ফসল ফলাবার

কাজ শুরু। মাঠে মাঠে গরুগুলো ভিজছে। ওরা আরাম পাচ্ছে। মাঝে মাঝে ডাকছে—হাম্বা। হাম্বা। কাকে ডাকছে ওরা?

সাইটের কাজ এখন বন্ধ। ইঁট তৈরি যা হবার গ্রীষ্মকালেই শেষ। শ্রমিকরা ফিরে গেছে তাদের নিজস্ব ডেরায়। নিজ বাসভবনে। দেবেশ দত্ত তাদের আবার আসতে বললেন, ঠিক পুজোর আগে। দশদিন আগে। তখন তিনি বোনাস দেবেন সরকার নির্ধারিত হারে। সবাইকে দেবেন। যারা স্থায়ী কর্মী, যারা অস্থায়ী কর্মী, সবাইকে। যাদের নাম কারখানার রেজিস্ট্রি বইতে আছে তারা সকলেই পাওয়ার যোগ্য। এই ঘোষণা খুশি করল উদাসকে। সে নিজে পাচ্ছে বলে নয়, সবাই পাচ্ছে বলে। শুধু নিজে পেলে আনন্দ হয় না, সবাই যেখানে পায়, সবার আনন্দের মাঝখানে নিজের আনন্দ মহান হয়ে ওঠে। বললেন দেবেশ দত্ত—বুঝলে উদাস, কারখানার লাভ বাড়ছে। ইঁটের চাহিদা খুব। কত কত নতুন বাড়ি হচ্ছে, সাঁকো হচ্ছে, ব্রিজ হচ্ছে, নতুন নতুন কনসার্ন গড়ে উঠছে, চাহিদা তো বাড়বেই। এবছরের উৎপাদন এবং সেল দুই ভাল। সবকিছু তোমাদের সমবেত চেষ্টায়। তোমাদের বঞ্চিত করতে যাব কেন?

সুযোগ বুঝে একদিন দেবেশবাবুকে কুন্তির কথা বলল উদাস, তার মিশনের কথা বলল। অর্থসাহায্যের কথা বলল। সব শুনে দেবেশবাবু বললেন, কুন্তিকে একদিন আসতে বল। যা হোক কিছু দেওয়া যাবে। একটা দিনও দিয়ে দিলেন। সে কথা বলল বুবুনকে। বুবুন কুন্তিকে। নির্দিষ্ট দিনে বুবুন এবং কুন্তি চলে এল সাইটে। শিল্পা ব্রিকস্-এর কারখানা দেখে ওরা বিস্মিত হল। বুবুন বলল—উদাসদা, তুমি তো বেশ বড় কোম্পানিতে কাজ কর।

কুন্তি বলল—দেখেশুনে মনে হচ্ছে, ভাল সাহায্য পাব।

দেবেশবাবু ওদের রেস্টরুমে বসালেন। গল্প করলেন আন্তরিকভাবে। টিফিন খাওয়ালেন। তারপর চেক কেটে দিলেন ব্যাঙ্কের। টাকার পরিমাণ দেখে কুন্তি খুব খুশি। বারবার বলল—স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ। মিশনের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। ঠাকুর আপনার মঙ্গল করুক। দেবেশ দত্ত বললেন—তোমরা একটা ভাল কাজ করছ। ভাল কাজে আছি। সবসময় আছি। আরও সাহায্য করব।

—এটা আপনার মহত্ত্ব। বলল কুন্তি। এরপর আবার একদিন এল কুন্তি। এবার সে একাই। খুবই সপ্রতিভ মেয়ে বা মহিলা যাই বলা যাক না কেন কুন্তিকে। এবার সে দেবেশ দত্তের কনসেন্ট নিতে এসেছে। দেবেশবাবুকে মন্দির নির্মাণ কমিটি সহ-সভাপতি হিসাবে পেতে চায়। দেবেশবাবু প্রথমে না না করলেও শেষ পর্যন্ত হ্যাঁ করলেন। দেবেশবাবু বন্ধনে জড়িয়ে গেলেন। তাকে জড়িয়ে দিল কুন্তি। মানুষ এভাবেই জড়ায় সবকিছুতে।

মন্দিরের ভিত পুজো হল। সামিয়ানা খাটানো হয়েছে। কত কত নারী-পুরুষ এসেছে। মানুষের মহামেলা যেন। মহিলারা সংখ্যায় বেশি। তারাই তো ধর্মকে ধরে রাখে। পুরুষদের চেয়ে মহিলারা অনেক বেশি ঈশ্বরবিশ্বাসী। উদাসের নিমন্ত্রণ ছিল। কলকাতা থেকে, বেলুড় মঠ থেকে প্রখ্যাত এক মহারাজ এলেন। তাঁর নাম শুনেছে উদাস। চোখে দেখেনি। আজ দেখল। নিজেকে ধন্য মনে হল। তিনি কয়েকটি ইঁট গাঁথলেন। সমবেত ধ্বনি উঠল—জয় রামকৃষ্ণ। জয় ঠাকুর। সে সমবেত কণ্ঠের মধ্যে উদাসের কণ্ঠও ছিল। পরমহংসের একটি বড় ছবি একটি চেয়ারে স্থাপিত। সবাই সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করছে। করল উদাসও। অন্তর ভরে উঠল। দেবেশবাবু এসেছেন। কয়েকজন ভাষণ দিলেন। ছোট্ট করে। দেবেশ দত্ত বললেন। তিনি পুনরায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন। করতালিতে ভেসে গেল চারদিক।

এরপর খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ। কুন্তি বলল—উদাসদা দাঁড়িয়ে থাকলে হবে? আপনি বালতি ধরুন। তখন উদাস বালতি ধরে খিচুড়ি প্রসাদ মানুষের পাতে পাতে দিয়ে চলল। তরকারি দিতে লাগল কুন্তি। আলুর দম। তার পিছনে একজন। পাঁচমিশালী তরকারি। পরিবেশনের মধ্যে এত আনন্দ, এত সুখ জানত না উদাস। সে কুন্তির কথা ভাবল। এই মেয়েটিকে সে চিনত না, জানত না, দেখেওনি কোনদিন। এখন সে কাছের মানুষ হয়ে গেছে। জীবন তো এইরকমই। এমনি করে একজন একজন করে মানুষ জীবনের দোরগোড়ায় এসে যায়। কথা বলে। একটা মমত্ববোধ গড়ে ওঠে। মানুষের জন্যে মানুষের মায়া। এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক বন্ধন। এ বন্ধন সন্ন্যাসীও কাটাতে পারে না।

হঠাৎ উদাসের মনে হল, সঙ্গে মাকে আনলে হতো। মা কত খুশি হতেন। কত আনন্দ পেতেন। মা মানুষের সঙ্গ ভালবাসেন। মায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। তাঁকে না এনে অন্যায় করেছে উদাস। এ ভুল সে ভবিষ্যতে করবে না। কুন্তি বলল—এত তন্ময় করে কার কথা ভাবছেন উদাসদা?

—আমার মা'র কথা কুন্তি। যাঁর জন্যে আমার সবকিছু। তিনিই আমার বিশ্ব।

॥ ১৩ ॥

আজ ১৫ই আগস্ট। সারা দেশজুড়ে স্বাধীনতা দিবস পালিত হচ্ছে। সেই সঙ্গে এই শহরের মানুষরা পালন করছেন সমারোহে। এই স্বাধীনতা মানুষকে কি দিয়েছে, কেউ জানে না। এই ভগ্ন স্বাধীনতা ভাল কি মন্দ, তার খবর কেউ করে না। অখণ্ড ভারত প্রথমে দুখণ্ড, পরে তিনখণ্ড হল। ঠিক হল কি বেঠিক হল, কেউ বলতে পারে না। ভারতবর্ষ সমস্যার দেশ। দারিদ্র, বেকারি, গরিব মানুষ এবং বৈষম্য ছাড়া এদেশের আছেটা কি?

এইদিনে উদাসের জীবনে একটা বড় ঘটনা ঘটল। কয়েকদিন থেকে টানা বৃষ্টি চলছে। কখনো জোরে কখনো আস্তে। আজ সকাল থেকে তা বন্ধ হয়েছে। পথঘাট নদীনালা জলে থৈ থৈ চারদিক। বৃষ্টির জন্যে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা স্তব্ধ ছিল। তবে চিরকাল কিছু একরকম থাকে না। আজ সকাল থেকে রোদ উঠেছে। মেঘ সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে আকাশের নীড় থেকে। মানুষ চলাচল করছে রাস্তায়। আবার রিক্সা চলছে। চলছে বাস ট্রাক। জনজীবনে স্বাভাবিক ছন্দ ফিরে এসেছে।

মাইকে স্বাধীনতার গান ভেসে আসছে। পাড়ায় পাড়ায় জাতীয় পতাকা উড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের, স্বদেশসঙ্গীত গাইতে গাইতে মার্চ করে যাচ্ছে রাস্তায়। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে এসব দেখছে উদাস। আজ তার টোল বন্ধ। বন্ধ সাইটে যাওয়া। আজ তার পুরো ছুটি। কাজ করতে করতে মনপ্রাণ যখন ক্লান্ত হয়ে আসে, মনে হয় আর পারা যাচ্ছে না, তখন এক আধদিনের ছুটি জীবনে সুবাতাস বয়ে আনে। উদাস ঠিক করেছে, আজ সে ভাল করে বাজার করবে। ভাল মাছ আনবে। মা অবশ্য মাছ খান না। দুপুরে টিভি দেখবে। আর বিকেলে পাবলিক লাইব্রেরি যাবে। সেখানে একটা অনুষ্ঠান হবে। উদাসের নিমন্ত্রণ। কর্তৃপক্ষ কার্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বেলা ১১টা তখন। উদাস মাছ নিয়ে, আলু নিয়ে, অন্যান্য সবজি নিয়ে, থলিভর্তি করে বাজার থেকে ফিরল। বাজার করতে সে পুরসভার মার্কেটে গেছিল। বাড়ি ফিরে যাকে সে দেখল, তাকে দেখবে একদম আশা করেনি। মনে তার ছবি ছিল না। এক বিবাহিত মহিলা বসে চেয়ারে। মা বললেন—তুই গেলি, আর ও এল। আমি তো চিনি না। দেখিনি আগে। বলল, তোর সঙ্গে পড়ত।

—হ্যাঁ মা পড়ত, ওর নাম আশালতা। রান্নাঘরে মায়ের সঙ্গে একথা হচ্ছিল উদাসের, সে বলল, মা তুমি একটু চা এবং পাঁপড়ভাজা নিয়ে এস। ততক্ষণ আমি কথা বলি। বাইরের ঘরে উদাস এল। বলল—আশালতা? কি ব্যাপার?

—কয়েকদিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এত বৃষ্টি, দেখা করতে পারিনি।

—শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছ কবে?

—দিন ১৫ হল। এখনও মাসখানেক থাকার ইচ্ছা। তোমাকে বলতে এলাম, আমার মেয়ের জন্মদিন সামনের রবিবারে। তোমার নিমন্ত্রণ। ঠিক সন্ধ্যাবেলায় যাবে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া করে ফিরবে।

—তাই নাকি! তাহলে তো যেতেই হয়। কিন্তু, কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল উদাস। নিজেকে সামলে নিল। তারপর বলল, তোমার মা কেমন আছেন আশালতা?

—কেন তুমি জানো না?

—কিসের কথা বলছ?

—মা মারা গেছেন। সাত মাস হল।

—সে কি!

—হ্যাঁ উদাস, মা মারা গেছেন, তবে এখানে নয়। আমার ওখানে। আমার শ্বশুরবাড়িতে। শিলিগুড়ি মা একাই যেতেন। যাওয়ার তো কোন অসুবিধা নেই। এখান থেকে একাধিক ডাইরেক্ট বাস ছাড়ে। দু'তিনদিন থাকার পর, হঠাৎ মায়ের ঠাণ্ডা লেগে গেল; তার সঙ্গে জ্বর। শ্বাসকষ্ট। ওখানকার একটা ভাল নার্সিংহোমে মাকে ভর্তি করলাম। কিছু করা গেল না। তিনদিন পর মা মারা গেলেন। আমার খুব খারাপ লাগছে উদাস, মা বেড়াতে গেলেন আমার কাছে, আর ফিরতে পারলেন না নিজের বাড়িতে। একটু কাঁদল আশালতা। উদাস বলল—কি করবে বল, কোনকিছুই মানুষের হাতে নেই। সবকিছু আপনা-আপনি ঘটে যায়। মা চা পাঁপড় আনলেন। উদাস বলল—মা তোমার মশলা মুড়ি আশালতাকে খাওয়াও তো।

—আমি মুড়ি খাব না উদাস।

—তুমি মায়ের হাতের মশলামুড়ি খাওনি। খেয়ে দেখ। তোমার মুখের স্বাদ বদলে যাবে। এমনটি, তুমি বাজারে পাবে না কোথাও। মা চলে গেলেন রান্নাঘরে। আশালতা বলল—উদাস, তোমার সঙ্গে মা ভাল ব্যবহার করেননি। মা খুব সন্দেহবাতিক মহিলা ছিলেন। তোমাকে আমাকে সন্দেহ করতেন। ভাবতেন, তোমার সঙ্গে আমার প্রেম আছে। পড়া শেষ হলে আমরা বিয়ে করব। আমি নাকি তোমার জন্যে পাগল। মা এসব ভুল ধারণা করে আমাকে গালমন্দ করতেন। তোমাকেও দিতেন। আমি বলেছি—যা গাল দেবার, মা তুমি আমাকে দাও। উদাস খুব ভাল ছেলে। কোন দোষে থাকে না, শুধু মন দিয়ে পড়াশোনা করে। পড়াতে আমাকে হেল্প করে। এসব আমার কথায়, মায়ের রাগ বেড়ে যায়, ভাবেন আমি তোমাকে বাঁচাতে চাইছি, নিজেকেও। মা তখন আমাকে মারতেন। ভীষণ মারতেন। জুতো দিয়ে, লাঠি দিয়ে, ঝাঁটা দিয়ে। বাবা চেষ্টা করেছিলেন। মাকে নিবৃত্ত করতে পারেননি। বাবা বলতেন—অত বড় মেয়ের গায়ে হাত দিচ্ছ কেন? অন্যায় করছ। খুব অন্যায় হচ্ছে। মা চীৎকার করে বলতেন, আমি উদাসকে আসতে বারণ করব। ও একটা হা-হাভাতের ঘরের ছেলে। ওর কি মূল্য আছে? তোর আমি বিয়ে দেব। আশা, আমি তোর বড়লোক ঘরে, সুন্দর ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেব। তুই যদি না বলিস, তোকে কেটে ময়ূরাক্ষীর জলে ভাসিয়ে দেব। এই বিয়েতে তুই উদাসকে নিমন্ত্রণ করতে পারবি না। উদাস, মা আমাকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিলেন। তোমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। আমি চেষ্টা করেও সে অন্যায় বন্ধ করতে পারিনি।

কথা বলতে বলতে আশালতার কণ্ঠস্বর স্থির হয়ে গেল। একটা অবরুদ্ধ ভাব এসে গেল। কোনরকমে বলল আশালতা—তুমি আমাকে, আমার মাকে ক্ষমা করে দাও উদাস। না হলে আমি শান্তি পাব না। আমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে না। উদাস বলল তাড়াতাড়ি—তোমার মা যা করেছেন, যা বলেছেন আমাকে, তা যেকোন মা-ই করতে পারেন। তুমি তাঁর সন্তান, অপার স্নেহ তোমার প্রতি, বিপুল আবেগ, তার সঙ্গে আশঙ্কা এবং ভয় তোমার মাকে এই কাজ করতে বাধ্য করেছে। না, আশালতা আমি তখনও কিছু মনে করিনি। আজও করি না।

—উদাস, তুমি কত ভাল। কত সহজে আমাকে মাকে ক্ষমা করে দিয়েছ। পরম শান্তি পাচ্ছি উদাস। স্বর্গীয় শান্তি।

এরপর আশালতা চা পাঁপড়ভাজা খেল। মায়ের বানানো মশলামুড়ি খেল। মুড়ি খেতে খেতে বলল আশালতা—না, এমনটি খাইনি। যারা ট্রেনে বিক্রি করে, তাদের থেকেও ভাল। মাসিমা, আমি আসব মাঝে মাঝে এ মুড়ি খেতে, আপনার আপত্তি নেই তো?

মা বললেন—আপত্তি থাকবে কেন? যখন ইচ্ছে, যখন খুশি তুমি চলে এস আমার কাছে। তুমি আমার মেয়ে। আমি তোমার মা। নিজেকে আর সামলাতে পারল না আশালতা। হু হু করে কেঁদে উঠল। শ্রাবণের ধারা দুচোখে গড়াতে লাগল। মা বলে উঠলেন—কি হয়েছে মা আশালতা? কাঁদছ কেন?

উদাস বলল—মা, আশালতার মা মারা গেছেন।

—আহা রে। বাছা আমার। মা উঠে গিয়ে আশালতাকে বুকে টেনে নিলেন। বললেন— চুপ কর, চুপ কর আশালতা। শান্ত হও। কারুর মা চিরকাল থাকে? মা ঠিকই বলেছিলেন, উদাসের মাও তো থাকলেন না। ঠিক চলে গেলেন।

॥ ১৪ ॥

আশালতা তার মেয়ের জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেছে, আর উদাস যাবে না, তা হতে পারে না। মেয়ের নাম বীথি। পাঁচ বছরের মেয়ে। ওকে কিছু একটা উপহার দিতে হয়। কি দেওয়া যায়? রাণী বাচ্চা মেয়েদের খুব সুন্দর ফ্রক বানায়। অসাধারণ করে। একগুচ্ছ ফ্রকের মধ্যে নিজেই একটা পছন্দ করে দিল রাণী। তার আগে বলল—বাচ্চাটার রং?

—ঠিক জানি না। মানে দেখিনি। ফর্সা হতে পারে।

—ঠিক আছে, এমন একটা চয়েস করে দিলাম, সব মেয়েকে মানাবে। রাণী ফ্রকটাকে উপহারের প্যাকেটে ভরে, লাল সুতো দিয়ে সুনিপুণভাবে বেঁধে দিল।

এসব সরঞ্জাম ওর ঘরেই থাকে। ওর যখন ব্যবসা, এসব রাখতেই হয়। প্যাকেট হাতে নিয়ে উদাস বলল—কত দাম বল।

—কিসের দাম?

—কেন ফ্রকের?

—ওটার দাম নেই।

—ইয়ার্কি করছিস নাকি রাণী। পকেট থেকে পার্স বের করল উদাস। একরকম লাফিয়ে উঠল রাণী—খবরদার বলছি, দাম দেবে না, দিলে ভাল হবে না। তোমার হাত আমি ভেঙে দেব।

—এতো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লাম! ঠিক আছে, তোর মজুরির দাম দিচ্ছি না, ছিটের পয়সা নে।

—আমি কিছুই নেব না।

—রাণী, এভাবে ব্যবসা করলে তোর ব্যবসা চলবে? লাটে উঠে যাবে।

—না, লাটে উঠবে না। ব্যবসা চলছে। তোমার আশীর্বাদে গড়গড়িয়ে চলছে। কত টাকা করেছি জানো? কটা ব্যাঙ্কে পাশবই খুলেছি জানো?

—সে তো খুব ভাল কথা রাণী। তুই বিয়ে করেছিস, দুটো সংসার চালাচ্ছিস, তোর তো অনেক টাকা দরকার।

—তোমাকে অতশত ভাবতে হবে না আমার জন্যে। আচ্ছা উদাসদা, আমি যদি তোমার বউ হতাম, তুমি দাম দিতে পারতে?

—এই তোর ভুল বকা শুরু হল। কি হলে কি হতো বলা যায়? বলা সম্ভব? তুই যে আমাকে এইসব কথা বলিস, তরুণ জানতে পারলে কত দুঃখ পাবে জানিস?

—কি করে জানবে? আমি বললে তবে তো জানবে। ও আমার খুব ন্যাওটা। যা বলি শোনে। উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। ওকে আমি মন্ত্রপূত করে রেখেছি। পারিনি শুধু তোমাকে। আমার কাছে তুমি আগে, তারপর আমার স্বামী তরুণ।

উদাস আর কথা বাড়াল না। এই পাগলীটার সঙ্গে বকে লাভ নেই। শুধু শুধু মনের যন্ত্রণা বাড়ানো। সে বেরিয়ে এল। পিছন থেকে রাণীর কণ্ঠ ভেসে এল—রাগ করো না উদাসদা। যাই করো, আবার আসতে ভুলো না। না এলে, তোমার উপর অত্যাচার আরও বাড়াব।

উদাসকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল আশালতা। এগিয়ে এল। দুহাত দিয়ে উদাসের ডানহাতটা জড়িয়ে ধরল। এই প্রথম তার স্পর্শ উদাসকে। আশালতা বলল—খুব খুশি হয়েছি উদাস, খুব খুশি। তুমি না এলে বড় কষ্ট পেতাম। ভাবতাম, তুমি মুখে বললেও ঠিক মন থেকে আমাকে, মাকে ক্ষমা করতে পারনি।

—তুমি কি করে ভাবলে আশা, তুমি ডাকবে আর আমি আসব না? তুমি আমার জীবনে প্রথম বান্ধবী।

—তুমি ঠিক বলছ উদাস?

—ভুল বলব কেন? যা বিশ্বাস করি, তাই বলছি।

—তুমি কত সুন্দর উদাস। কত ভাল। অনেককে দেখলাম, কিন্তু কেউ তোমার মতো নয়। বোধহয় আমি নিজেও নই।

কলকল করে কথা বলছে আশালতা। সে জানে, তার মা নেই। থাকলে সে উদাসকে নিমন্ত্রণই করতে পারত না। এত সাহস হতো না আশালতার। মা বলতেন—ওই ধান্দাবাজ ছেলেটার কথা বলিস না। আমরা ব্রাহ্মণ, ওরা ও.বি.সি.। ওকে পাত্তা দিস কেন? কেন নিমন্ত্রণ করবি?

—মা, এসব তুমি কি বলছ? শিক্ষিত মহিলা হয়ে জাতপাত তুলে কথা। এমনি করে বলো না। এতে পাপ হয়।

—ওঃ খুব টান দেখছি উদাসের জন্যে। আমি ঠিক ধরেছি, উদাস তোর নাগর।

—ছিঃ মা ছিঃ। তোমার কথা আমি সহ্য করতে পারছি না। তোমাকে জোড়হাত করছি, এসব কথা বন্ধ করো। আমি শ্বশুরবাড়িতে শান্তি পাই না, এখানেও তাই।

—শান্তি পাস না তোর নিজের দোষে। তুই একটা বদমাস মেয়ে। বড়লোকের ঘরে তোর বিয়ে দিয়েছি, কত পয়সা ওদের জানিস?

—হ্যা মা, জানি জানি। একটা লোকের পয়সা থাকলেই সব হয়ে গেল? আর কিছুর দরকার নেই? অনেক লোকের তো পয়সা নেই, তা বলে তারা মানুষ নয়?

—তুই উদাসকে এখনও ভালবাসিস।

—না মা, তোমার ধারণা ভুল। উদাস আমার সহপাঠী। ও আমার ভালবাসার জন নয়। আমি কাউকে, কোন ছেলেকে ভালবাসি না।

বাবা এরপর এগিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন—তুমি কি শুরু করেছ পূরবী? মেয়েটাকে একটু শান্তি দেবে না? সারাজীবন ওকে পিষবে? তোমাদের অত্যাচারে মেয়েটার চেহারার হাল কি হয়েছে দেখছ? ও এখানে জ্বালা জুড়োতে আসে, না পেতে আসে?

—তোমার মেয়ে চরিত্রহীন।

—চুপ একদম চুপ পূরবী। বাবা ঠিক গর্জন করে উঠতেন। আশালতা ফুলের মতো সুন্দর। তুলসীপাতার মতো পবিত্র। ওকে অপমান করো না।

—তুমি জানো, ও উদাস বলে একটা ও.বি.সি. ছেলের সঙ্গে প্রেম করত। আমি না আটকালে ওকে বিয়ে করত।

—প্রেম করত তো করত। বিয়ে করলে করত। তাতে কি হয়েছে? কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হতো। আমি উদাসকে চিনি। স্টেশনবাজারে থাকে তো। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, কোন কমপ্লেন নেই। পূরবী, মানুষকে বিচার করো তার গুণ দিয়ে, জাত দিয়ে নয়। তোমার মন ছোট হয়ে গেছে। অতি ছোট।

—তা তো বলবেই। তোমরা বাবা বেটী এক গোয়ালের গরু। এসব ঘটলে কি করত তখন আশালতা? নিশ্চয়ই কাঁদত। কেঁদে কেঁদে সারা হতো। উদাসের জন্যে সে কাঁদত।

উদাস বলল—তোমার মেয়ে কই আশালতা?

বীথি? কল্পনার জগৎ থেকে বাস্তবে নেমে এল আশালতা। বলল—পাশের ঘরে। আমার বৌদি ওকে সাজাচ্ছে। জন্মদিনের সজ্জা, সাধারণ সজ্জা তো নয়। হাসল আশালতা।

—তোমার কর্তা কই? একটু আলাপ করিয়ে দাও। তাঁকে তো আমি দেখিনি। বিবর্ণ হয়ে গেল আশালতার সৌন্দর্য। পরিষ্কার আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেল। বলল, ও আসেনি।

—সেকি, কেন? উনি কি জানেন না, আজ ওঁর মেয়ের জন্মদিন!

—ভাল করেই জানেন।

—তাহলে?

—উদাস, তোমাকে বলা হয়নি। বিয়ের পর থেকে আমি খুব খারাপ আছি। আমি একদম ভাল নেই। বিয়ের আগে ভাল ছিলাম। তুমি ছিলে, পড়াশোনা ছিল, কলেজ ছিল। মা জোর করে বিয়ে দিলেন। কতবার বললাম, মা আমাকে পড়তে দাও। এম. এ-টা করি। তারপর বিয়ে। তুমি যাকে পছন্দ করবে, তাকেই স্বামী বলে মেনে নেব। কিন্তু মায়ের সন্দেহ তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে। গোপন সম্পর্ক। আমি তোমাকে বিয়ে করব। তোমার হাত থেকে আমাদের পারিবারিক সম্মান বাঁচাতে মায়ের এই ব্যবস্থা। আমাকে মানতে হল। মা বাধ্য করলেন। আমার শ্বশুরবাড়ি শিক্ষিত পরিবার নয়। ব্যবসায়ী পরিবার। টাকা ছাড়া ওরা কিছু বোঝে না। জানে না। হৃদয়বৃত্তির কোন মূল্য নেই। আমার স্বামী সঞ্জয় আমাকে ভালবাসে না, অন্য মেয়েকে ভালবাসে। নিজের মেয়ের প্রতি ভালবাসা নেই। সমসময় টাকা টাকা করে বেড়ায়। সকালে বেরিয়ে যায়, ফেরে রাত্রে। তাও সবদিন নয়। ত্রিপুরা অসম মেঘালয় নেপাল ভুটান এইসব করে বেড়ায়। আমি সারাদিন একা একা থাকি। সঙ্গী বলতে মেয়ে। বাড়ির কোন কাজে আমাকে ডাকে না। সেখানে শাশুড়িমায়ের ইচ্ছে, শেষ ইচ্ছে। এত অপমান, এত অবহেলা আমি সইতে পারি না। সঞ্জয় আমার জন্যে গয়না কেনে, বই কেনে না। বলি, ওই বইটা কিনে দাও। সঞ্জয় বলে, বই পড়ে কি হবে? টিভি দেখ,

খবরের কাগজ পড়, ওতেই হবে। আমি জানতাম, আমার স্বামী গ্র্যাজুয়েট, মা বলেছিলেন। কিন্তু মা ঠিক কথা বলেননি, এইচ. এস. ফেল। ইংরেজিতে ব্যাক। তিনবার চেষ্টা করেছিল। পাশ করতে পারেনি। পরে মাকে বলেছি। মা বলেছেন—তাতে কি হয়েছে! ডিগ্রি নিয়ে কি ধুয়ে খাবি? কত টাকা ওদের ভাব!

—তোমার কথা শুনে অবাক হয়ে যাচ্ছি আশালতা। কষ্ট পাচ্ছি।

—আমি সুখী নয় উদাস। একদম না। কেন আমার এমন হল উদাস, কোন্ দোষে, কোন্ পাপে? আমাকে অবহেলা করুক ক্ষতি নেই, আমি মেনে নিয়েছি। কিন্তু বীথিকে এতটুকু আদর করে না, কোলে নেয় না। বল উদাস, এসব সহ্য করা যায়? বীথি না থাকলে আমি ঠিক আত্মহত্যা করতাম। বীথির মায়ায় তা পারিনি। আমি মরে গেলে কে বীথিকে দেখবে? সঞ্জয় নিশ্চয়ই আবার বিয়ে করবে। স্ত্রীলোক মানে ওর কাছে ভোগ্যপণ্য। দুদিন বাদে ছুঁড়ে ফেলে দাও। ছিঃ ছিঃ, এমন মানুষ আমার স্বামী, ভাবতে ঘেন্না লাগে উদাস। বল উদাস, এখন আমি কি করি? উদাস উত্তর দিতে পারে না। মন খারাপ হয়ে যায়। আশালতা সহজসরল মেয়ে। এটা যদি রাণী হতো, খেল দেখিয়ে ছাড়ত। সঞ্জয়ের নামে থানা-পুলিশ করে ছাড়ত। টাইট দিয়ে দিত। আশালতা রাণী হতে পারে না।

আশালতার বৌদি বললেন—আপনার কথা শুনেছি আশার মুখে। আশালতার বিয়ে শিলিগুড়িতে না হয়ে, যদি আপনার সঙ্গে হতো, মেয়েটা শান্তি পেত। এত দুঃখ এত কষ্ট ওকে পেতে হতো না। শুধু টাকা থাকলেই কি সুখী হওয়া যায়?

উদাস ভাবল, যা হয়নি তা ভেবে লাভ কি? যা হয়েছে সেটা নিয়েই ভাবা ভাল। জন্মদিনের আনন্দ বিষাদে পরিণত হল। ভাল করে খাওয়া-দাওয়া করতে পারল না উদাস। অথচ খাবারের আইটেম প্রচুর। বলল আশালতা—উদাস খাচ্ছ না যে, মন খারাপ?

—হ্যাঁ, আশালতা আমার মন খারাপ, তোমার জন্যে খারাপ।

—আমি তোমার মনটাকে খারাপ করে দিলাম। তুমি কিছু মনে করো না। কিন্তু না বলেও তো পারছি না। সব বলে দুঃখটাকে একটু হালকা করে নেওয়া।

—না আশালতা, বলে তুমি ঠিকই করেছ, শুধু আমি ভাবছি, এর শেষ পরিণতি কি?

—আমি জানি না উদাস। জানতে চাইও না। ভাগ্য যেখানে টেনে নিয়ে যাবে, সেখানে যাব।

পাড়ার অনেকের নিমন্ত্রণ। শিশু মহিলা এবং পুরুষ। তারা খেতে খেতে গল্প করছে। হা হা করে হাসছে। কিন্তু সেই আনন্দযজ্ঞে অংশ নিতে পারল না উদাস। তার মন ভারী হয়েই থাকল।

বিদায়কালে, সাইকেল নামক বাহন চড়ার আগে, উদাস বলল আশালতাকে—এখানে যখন থাকবে, মাঝেমাঝে যেও আমাদের বাড়ি। এই নাও আমার কার্ড। এতে মোবাইল নম্বর আছে। আমার কোম্পানি আমাকে মোবাইল দিয়েছে। ফোন করো যখন খুশি। তুমি গেলে আমি আনন্দ পাব। মা খুশি হবেন।

—জানি উদাস জানি। এই পৃথিবীতে সঞ্জয় আছে আবার উদাস মণ্ডলও আছে। একজন মানবিক, হৃদয়বাদী, মানবপ্রেমিক। অন্যজন নিষ্ঠুর, অমানবিক, অত্যাচারী।

সেদিন রাত্রে বাড়ি ফিরে মাকে সব কথা বলতে ইচ্ছে করল উদাসের। কিন্তু বলল না। বললে মা কষ্ট পাবেন। কি বলবে উদাস? —মা আশালতা বড় দুঃখী। ওকে একটু ভালবেস মা! না থাক, উদাসের কষ্ট উদাস একাই বহন করবে। তাই তো সে করে। সে রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না উদাসের।

॥ ১৫ ॥

কুন্তি উদাসকে জড়িয়ে ফেলল মিশনের কাজে। বলল উদাস—আমাকে জড়াও কেন কুন্তি। আমি যতটা পারি তোমাদের সাহায্য করব। আমি তো আছি, নাকি!

—দূরে থাকলে হবে না উদাসদা। সামনের সারিতে আসতে হবে। আপনি সৎ প্রকৃতির মানুষ। আপনার পরিচিতি আছে। আমরা সেটা কাজে লাগাব না? দেশে সৎলোকের খুব অভাব। প্রায় নেই। যাঁরা আছেন, তাঁদের আমরা খুঁজে বের করব। সামনের সারিতে নিয়ে আসব। তবু উদাস খুঁতখুঁত করে।

কুন্তির ছায়াসঙ্গী বুবুন বলল—আপত্তি করছ কেন উদাসদা? আমরা তোমাকে চাইছি, আর তুমি আসবে না? কুন্তিকে অগ্রাহ্য করা যায়, কিন্তু সমাজসেবী মানবতাবাদী পরোপকারী বুবুনকে অগ্রাহ্য করা যায় না। উদাস বলল শেষে—ঠিক আছে কুন্তি। আমি তোমাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে থাকব। বুবুন হেসে উঠল। হাততালি দিয়ে উঠল কুন্তি। আকাশ বাতাস নির্মল হল।

রাণী আরও এগিয়ে গেল। সে তরুণের গুমটি বন্ধ করে দিল। তালা মেরে দিল। বলল—এটা কি ব্যবসা হল? বিক্রি করে দাও। সারাদিন বসে থাকা, রোজগার নেই। গুমটি করে কেউ রাজা হয় না। অন্য ব্যবসা দেখতে হবে।

স্টেশন মোড়ে একটা বন্ধ দোকান ভাড়া নিল রাণী। বড় দোকান। ভাড়া অনেক। তাতে রাণীর ভ্রূক্ষেপ নেই। দোকানটা সাজিয়ে নিল। মাঝে পার্টিশন দিয়ে দুভাগে ভাগ করে নিল। কাঠের পার্টিশন। মাঝে দরজা ছোট। বামদিকে রেডিমেড ফ্রকের দোকান। ডানদিকে টেলারিং শপ। পাঁচটা সেলাই মেশিন। হেড রাণী। সে ফ্রকের কাপড় কাটে। ডিজাইন করে দেয়। বাকিরা সেলাই করে। রেডিমেড দ্রব্যের দোকানে বসে তরুণ। সুদর্শন সুন্দর হাসিমুখ এক যুবাপুরুষ। ব্যবসা শিখছে।

সে ঠিকঠাক বিক্রি করে। মাথার উপর আছে রাণী। তার ব্যবসাবুদ্ধি প্রখর। উদাস বলে—

—কেমন আছ তরুণ?

—ভাল দাদা। বেশ ভাল।

—আমার রাণী বোনটিকে কেমন লাগছে? লজ্জা পেয়ে গেল তরুণ। হাসল একটু। উদাস বলল, ঠিক আছে। তোমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি বুঝে গেছি।

—দাদা, একদিন আমাদের বাড়ি বেড়াতে আসুন। প্রতিদিন আপনার কথা বলে রাণী। খুব মানে আপনাকে। বড় শ্রদ্ধা করে।

—তা জানি। তবে বড় মেজাজী মেয়ে। ওর ধমককে ভয় পাই। হা হা করে হেসে উঠল তরুণ। বলল—দাদা, আমারও সেই একই অবস্থা। এবার হেসে ওঠার পালা উদাসের।

উদাস হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, বেশ আছে এরা। সুখী দম্পতি বলা যেতে পারে। কিন্তু আশালতা? তার কথা ভেবে কেন কষ্ট পায় উদাস? কেন কেন? সে আশালতার দুঃখ দূর করতে চায়। কিন্তু কি করে তা করবে উদাস? কোন্ উপায়ে?

একদিন মেয়ে বীথিকে নিয়ে বেড়াতে এল আশালতা। আগেরবার আশালতা একাই এসেছিল। কোলে তুলে নিল বীথিকে উদাস। বলল—আমি তোমার কে হই বল তো মামনি?

—জানি না।

—আমি তোমার মামা হই। জানো তো, দুটো মা যোগ করলে একটা মামা হয়। মামা হওয়া খুব কঠিন কাজ। বীথিকে কোলে করে বাইরে এল উদাস। বলল উদাস—মা, আমি বীথিকে নিয়ে বাইরে যাচ্ছি। ওকে একটু ঘুরিয়ে আনি। ট্রেন দেখিয়ে আনি। রান্নাঘর থেকে সাড়া দিল আশালতা—ঠিক আছে। যাও। এখন আশালতা রান্নাঘরে। তার জন্যে মা মশলামুড়ি করছেন। তা দেখে শিখছে আশালতা।

দুদিন পর। খাওয়া দাওয়া করে উদাস যাচ্ছে বাস ধরতে। সে সাইটে যাবে। রাণীর দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় হাঁকল রাণী—উদাসদা শোন। কথা আছে। উদাসের তাড়াতাড়ি ছিল। কিন্তু রাণী ডাকছে, আর সে যাবে না, তা হয় না। না গেলে পরিস্থিতি খারাপ হবে। দোকানে এল উদাস। দেখল, রাণীর টেলারিং দোকানে কোন মেয়ে কর্মী নেই। উদাস বলল—কি ব্যাপার, তোর কাজের মেয়েরা কই? আজ আসেনি?

—সবাই আছে। এখন ওদের টিফিনের ছুটি। এক ঘণ্টা। ওরা সব টিফিন খেতে গেছে।

—আর তরুণকে দেখছি না?

—ও এক মহাজনের কাছে মাল সাপ্লাই দিতে গেছে। সেইসঙ্গে পেমেন্ট আনতে। তা কোথায় যাচ্ছিলে গো?

—কেন, যেখানে প্রতিদিন যাই রবিবার বাদে, সেখানে যাচ্ছি। শিল্পা ব্রিকস্ কোম্পানিতে। যা বলবি বল তাড়াতাড়ি, বাস এসে যাবে।

—কথা আছে। পরের বাসে যাবে।

—বাঃ তা কি হয়, লেট হয়ে যাবে না?

—লেট হলেও কেউ কিছু বলবে না তোমাকে।

—কাল থেকে দেবেশবাবু সাইটে আছেন। তাঁকে হিসেবনিকেশ দেখাতে হচ্ছে। ঠিক টাইমে যেতে হবে না? দেবেশবাবু কথা শোনাবেন না?

—না শোনাবেন না। তোমাকে কিছু বলবেন না, আমি জানি।

—মানে?

—মানে হচ্ছে এই, তোমাকে দেবেশবাবু মামুলি কর্মচারি ভাবেন না। আচ্ছা, দেবেশবাবু তোমাকে কি বলে ডাকেন বল তো?

—সবাই যা বলে, উদাস বলে ডাকেন।

—সেটা আগের ঘটনা। সে ঘটনা এখন পাল্টে গেছে। এখন দেবেশ দত্ত তোমাকে ভাগ্নে বলে ডাকেন। ডাকেন না? উদাস চুপ করে থাকল। এবার তুমি বল, দেবেশবাবুকে তুমি কি বলে ডাক?

—কেন, স্যার বলে ডাকি।

—আবার তুমি মিথ্যে বলছ। আজকাল তুমি এত মিথ্যে কথা শিখলে কি করে? আমার সহ্য হয় না। উদাস চুপ করে থাকে। তাহলে শোন, তুমি দেবেশবাবুকে মামা বলে ডাক। দেবেশবাবু তোমাকে সে অধিকার দিয়েছেন। আরো শোন, এখন দেবেশবাবু তোমাকে চালান না, উদাস ভাগ্নে দেবেশবাবুকে পরিচালনা করে। ঠিক বলছি কিনা?

—এত খবর তুই জানলি কি করে?

—জানার ইচ্ছে থাকলে জানা যায়। সংসারে কোন খবর চাপা থাকে না। তোমার কথায় দেবেশবাবু কুন্তিকে মিশনের চাঁদা বাবদ মোটা টাকা দিয়েছেন। ঠিক বলছি তো?

—আমি চাঁদা দিতে বলেছিলাম, তবে কত টাকা তা বলিনি।

—ভাগ্নেকে খুশি করতে দেবেশ দত্ত মুক্ত হস্ত। দরকারে আকাশের চাঁদও এনে দিতে পারেন। আরও খবর আছে আমার কাছে, একদিন মারুতি চালিয়ে দেবেশ দত্ত তোমার বাড়ি এসেছিলেন। সে গাড়িতে তুমি ছিলে। মোটামুটি তখন রাত্রি ৯টা।

—হ্যাঁ, খবর ঠিক আছে। তারপর?

—তারপর দেবেশ দত্ত তোমার মায়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলেন, চা খেলেন, তোমার মাকে দিদি বলে সম্বোধন করলেন। যাবার সময়, তোমার মাকে দুখানা তাঁতের শাড়ি উপহার দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। খবর ঠিক কিনা?

—তোর তো দেখছি কিছুই অজানা নেই। তা এত খবর তোকে কে দিল?

—নাম বলব না। বললে সে আর খবর দেবে না। খবরের ধারাবিবরণী বন্ধ হয়ে যাবে।

—সব শুনলাম রাণী। এবার তাহলে আসি। বাস এসে যাবে।

—আসল কথা এখনও হয়নি তোমার সঙ্গে। তুমি যেতে পারবে না।

—আসল কথা? কি আসল কথা? বলতে বলতে বাস এসে গেল। লোক নামিয়ে, লোক তুলে, উদাসের নাকের ডগা দিয়ে বাস চলে গেল।

—যাঃ, বাসটা চলে গেল।

—দেখেছি। রাণী বলল উদাসভাবে। আগে কথা শেষ হোক। তারপর যাবে।

হতাশ হয়ে বলল উদাস—এর পরের বাস দশ মিনিট পর। যা বলবি, দয়া করে তাড়াতাড়ি বল, কোন ভূমিকা না রেখে বল, না হলে এ বাসটাও ধরা যাবে না।

—কথা হচ্ছে, আমি দেখছি, এক বিবাহিত মহিলা, ফর্সা, গোলগাল চেহারা, তা চেহারাটা মন্দ নয়, সুন্দরী নয় অবশ্য, তবে সুশ্রী বলতে বাধা নেই। রিক্সা করে আসে তোমার বাড়ি। ২/৩ দিন চোখে পড়েছে। সঙ্গে ফুটফুটে এক বাচ্চা মেয়ে। কে ওরা?

—বাচ্চা মেয়েটা হচ্ছে বীথি। আমার ভাগ্‌নী বলতে পারিস।

—তুমি মহিলাটির কথা বল। সেটা জানতে চাই।

—ওর নাম আশালতা। আমার সঙ্গে কলেজে পড়ত। ইতিহাস নিয়ে। আশালতার বিয়ে হয়েছে শিলিগুড়িতে। এক ধনী ব্যবসায়ী পরিবারে। এখানে বিদ্যাসাগর পল্লিতে ওর বাপের বাড়ি।

—তোমার সঙ্গে আশালতার সম্পর্ক?

—কি আবার সম্পর্ক! আমার সঙ্গে পড়ত। তাই আমার সহপাঠিনী বলতে পারিস। জোর বলতে পারিস, তর্কের খাতিরে, আমার বান্ধবী। আমার সঙ্গে গল্প করতে আসে। আরও বলতে পারিস, আমার মায়ের হাতের তৈরি মশলামুড়ি খেতে আসে।

—আমার ধারণা, রাণী কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, আশালতার সঙ্গে তোমার প্রেম আছে। সেই টানে তোমার কাছে আসে। পুরনো প্রেম। তার টান ভয়ানক। কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। তোমরা হচ্ছ লায়লা মজনু।

—রাণী, ভেবেচিন্তে কথা বল। একটা কথা মনে এল, আর দুম করে বলে দিলি, সেটা ঠিক নয়।

—তাহলে তোমরা প্রেমিক প্রেমিকা নও। আমার বিশ্বাস ভুল।

—একশবার ভুল।

—ঠিক আছে। পরের দিন আশালতাকে ধরব। কথা বলব। প্রশ্ন করব। তারপর তোমাকে দেখছি।

—ধরব মানে? কেন ধরবি?

—আমার ইচ্ছে হয়েছে, তাই ধরব। সত্য উদ্ঘাটন করব। তোমাকে বাঁচাতে হবে তো।

—আমি বেঁচেই আছি রাণী। মরিনি। তোকে আর সমাজসেবা করতে হবে না। তুই আমাকে রেহাই দে। পরের বাস এসে গেল। দৌড়ে রাণীর দোকান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল উদাস। দূর থেকে রাণীর গলা পাওয়া গেল।

—অত দৌড়াচ্ছ কেন, পড়ে যাবে যে। রাগ করে গেলে নাকি উদাসদা? রাণীর হাসির আওয়াজ ভেসে এল। উদাসের গা জ্বলে গেল। রাণীটা বিয়ের পর, এতটা নির্লজ্জ আর পাকা হয়েছে, বলা যায় না। সব ব্যাপারে মাতব্বরি আর খোঁজখবর। তুই কি গোয়েন্দা এজেন্সি খুলবি নাকি! কেমন একটা আজে-বাজে কথা বলে দিল, আশালতা এবং তার সম্পর্কে। একটা সুন্দর সম্পর্ককে কেমন মসিলিপ্ত করে ছাড়ল। বাসে উঠে পড়ল উদাস। ছেড়ে দিল বাস। উদাস বিড়বিড় করে বলল—রাণী তুই অসহ্য। সত্যিই অসহ্য। পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোক বললেন উদাসকে—কি বিড়বিড় করছেন মশাই? মানসিক রোগ আছে নাকি আপনার?

॥১৬॥

আশ্বিন মাস। এই মাসের শেষে দেবী দুর্গার পূজা। তবু এখন থেকে তার সুর আকাশে বাতাসে। আর আবহাওয়া একটু একটু করে বদলাতে শুরু করেছে। তেমন বেদনাবহ গরম এখন আর নেই। মাঠে মাঠে ভরা জল। এবার ভাদ্রমাসে ভাল বৃষ্টি হয়েছে। ধানের গোড়াতে জল থইথই। বাতাস বইছে যখন তখন। বাতাসে সে ধান হেলেদুলে খেলা করছে প্রকৃতির সঙ্গে। তার মানস প্রতিমার সঙ্গে। সাইটের আশপাশ এলাকার মাঠ ঘুরে ঘুরে দেখছে উদাস। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। চারদিকে শ্যামলিমা। ঠিক যেমনটি দরকার, তেমনটি বৃষ্টি হয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। নদীতে বান ডাকে। ঘরবাড়ি মাঠঘাট মানুষ ভাসিয়ে প্রগাঢ় শোকের সৃষ্টি করে নদী। নদী তখন মা নয়। রাক্ষসী। রাক্ষসীর রূপ ভয়ঙ্কর। সে শুধু গিলতেই চায়। কিছুতেই তার ক্ষুধার নিবৃত্তি নেই।

কুন্তির সঙ্গে দেখা বাসস্ট্যাণ্ডে। বলল কুন্তি, সে মিশনের কাজে এক গ্রামে যাচ্ছে। সঙ্গে দুই মহিলা। কুন্তির থেকে বড় বয়সে তাঁরা। প্রত্যেকের হাতে ব্যাগ। বোধহয় বিলি করার জন্যে কিছু রিলিফ নিয়ে যাচ্ছে ওরা। সেবাকার্য ওদের আদর্শ। যাঁরা মানুষের সেবা করে, তাদের প্রতি অসীম অনুরাগ উদাসের। শ্রদ্ধায় সে অবনত।

বেলা এখন ৯টা। বাসস্ট্যাণ্ডে নিদারুণ ভীড়। চেঁচামিচি হট্টগোল বাসের হর্ণ, মাইকের চীৎকার, কোলাহল মুখরিত বাসস্ট্যাণ্ড। কান পাতা দায়। পাশের লোকের কথা শোনা যায় না।

আবার কোনদিন যদি বাস ধর্মঘট হয়, এটা হয়ে থাকে মাঝে মাঝে, কিছু লোক করে, কেন করে জানে না উদাস, তখন শ্মশানের নীরবতা বাসস্ট্যাণ্ডে। লোক নেই, জন নেই, স্ট্যাণ্ডে কোন বাস নেই, এক অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা। বুকের মধ্যে চাপ ধরে।

উদাস এখন দেখল, দুটো চপমুড়ির দোকানে ভীড়। ভীড় বলে ভীড়। পাশে কয়েকটি বেঞ্চ। সেখানে লেবার শ্রেণির লোকেরা চপ মুড়ি বেগুনি ঘুগনি খাচ্ছে। বুভুক্ষু কাকের মতো।

কুন্তি বলল—একদিন যাব আপনার বাড়ি। সামনে পুজো। আমাদের বস্ত্রসংগ্রহ প্রকল্প চলছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে পুরনো জামাকাপড় শাড়ি প্যান্ট ধুতি সংগ্রহ করা চলছে। মাসিমাকে বলে রাখবেন।

—ঠিক আছে যেও।

—এখন তাহলে চলি উদাসদা। একটা বাস, স্ট্যাণ্ড থেকে বেরুচ্ছে, কুন্তি বাসের মাথার বোর্ড একবার দেখল। তারপর থলিসহ বাসের পেটে ঢুকে গেল। সঙ্গের দুই মহিলাও। কুন্তি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল—ভাল থাকবেন উদাসদা।

—তোমরাও ভাল থেকো কুন্তি। মনে মনে বলল উদাস, হ্যাঁ এখন আমি ভালই আছি। বেশ ভাল আছি। আগে একথা আমি বলতে পারতাম না। তখন ছিলাম বেকার। বেকারত্বের জ্বালা ক্যান্সারের জ্বালাকেও হার মানায়। প্রতিদিনকার জ্বালা, প্রতি মুহূর্তের জ্বালা, মানুষকে টুকরো টুকরো করে কাটে। তাকে সত্ত্বাহীন করে ছাড়ে। মাকে সুপারি কাটতে হতো। ঠোঙা বানাতে হতো। এখন আর সেসব দরকার হয় না। মাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছে। এখন যা রোজগার করে উদাস, যা মাইনে দেন দেবেশ দত্ত, তাতে দিব্যি চলে যাচ্ছে। সুন্দর চলে যাচ্ছে। যদি কোনদিন অনেক টাকা করতে পারে উদাস, তাহলে অভাবী লোকেদের সে অর্থদান করবে, লোককে প্রয়োজনে ধার দেবে, কিন্তু সুদ নেবে না। হয়তো অনেক লোক তার টাকা মেরে দেবে, লোকে তা করেও থাকে, কেন লোকে টাকা মারে জানে না উদাস, তারা কি বিশেষ আনন্দ পায়, সুখ পায়? তবু সে একাজ করবে।

স্বপ্ন দেখে উদাস, সে মাটির ঘর ভেঙে দালানবাড়ি করবে। মাকে একটা স্বতন্ত্র ঠাকুরঘর করে দেবে। সেখানে মা ইচ্ছেমতো পুজো করবেন, ধ্যান করবেন, উদাস চৌকাঠের বাইরে বসে মায়ের সে মূর্তি দেখবে। তার চিত্ত ভরে উঠবে বিপুল আনন্দে। একটা ড্রইং রুম থাকবে। সাজানো গোছানো। সেখানে বাইরের অতিথিরা বসবেন। গল্প করবেন। চা খাবেন। আশালতা আসবে। রাণী আসবে। কুন্তি আসবে। বুবুন আসবে। তরুণ আসবে। দেবেশবাবুও আসবেন। সর্বত্র একটা সুখের ছবি। এবার সে ব্যাঙ্ক লোনের চেষ্টা করবে। হাউস বিল্ডিং লোন। মাস মাস তার কিস্তি শোধ করার ক্ষমতা এখন অর্জন করেছে উদাস।

তিনদিন পর। মা রাত্রে খেতে দেবার সময় বললেন—উদাস, আজ কুন্তি এসেছিল দুপুরে। তখন তুই সাইটে ছিলিস। পুরনো শাড়ি কাপড় চাইল। তোর জামা চাইল পুরনো। সঙ্গে দুজন মহিলা। খুঁজে পেতে তিনখানা শাড়ি পেলাম, তোর দুখানা জামা। তিনজনের হাতে চটের ব্যাগ। শুনলাম, রাণী তিনখানা ফ্রক দিয়েছে, সবগুলো নতুন। ডেকে দিয়েছে কুন্তিকে। রাণীর মনটা খুব ভাল রে।

তখন মনে পড়ল উদাসের, বাসস্ট্যাণ্ডে কুন্তির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে আসবে বলেছিল, মাকে জানাতে বলেছিল। এ হে, দেখেছ কাণ্ড, মাকে বলতে একেবারে মনে নেই। এতটুকু নেই।

—হ্যাঁ মা, তোমাকে আমার বলা হয়নি, কুন্তি আসবে বলেছিল, বাসস্ট্যাণ্ডে দেখা হয়েছিল। তা মা ওদের কিছু খাইয়েছ তো?

—হ্যাঁ খাইয়েছি। তা তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, হ্যাঁরে কুন্তি বিয়ে করবে না? বেশ সুন্দর দেখতে মেয়েটি। বিয়ের বয়স তো হয়েছে। তাহলে?

—মা, একটু থামল উদাস, তারপর বলল, কুন্তি বিধবা মা। মা চমকে উঠলেন। বললেন—বলিস কি রে? তুই ঠিক জানিস?

—হ্যাঁ মা জানি। খবর দিয়েছে বুবুন। কুন্তির এক পুত্র আছে। কলকাতার মিশন স্কুলে পড়ে।

—কোথায় বিয়ে হয়েছিল? কি করে মারা গেল ওর স্বামী?

—বিয়ে হয়েছিল ব্যাণ্ডেলে। ওর স্বামী চাকরি করত। একটা কঠিন অসুখে মারা যায়। ক্যান্সার হয়েছিল। স্বামী মারা যাওয়ার পর কুন্তি ছেলেকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে আসে। স্বামী স্মৃতিবিজড়িত বাড়িতে ও থাকতে চায়নি। কুন্তির দাদা দিদি মা বাবা সকলে আছে। তারা কুন্তিকে খুব ভালবাসে। ওর স্বামীর চাকরিটা পাবার চেষ্টা করছে কুন্তি। প্রায় কলকাতা যায়। এখনও চাকরিটা পায়নি। পাবে কিনা তারও ঠিক নেই। ঘরের মধ্যে বিষাদ নেমে এল। মা বললেন—তোর কথা শুনে মন খারাপ হয়ে গেল উদাস।

—হ্যাঁ মা, প্রথম বুবুন যখন এসব কথা বলল, তোমার মতো আমারও মন খারাপ হয়েছিল। শেষপর্যন্ত মানুষের সবকিছু সইয়ে যায়। কুন্তির সয়ে গেছে। সংসারের জন্যে কত দুঃখ করবে মা! সংসারে সর্বত্র দুঃখ। গভীর দুঃখ। দুঃখের হাত থেকে কেউ রেহাই পায় না। একজনও না।

॥১৭॥

দেবেশ দত্ত বললেন—তোমাকে একটা কথা বলছিলাম উদাস।

—বলুন মামাবাবু।

—কিছুদিন থেকে একটা প্ল্যান ভাবছি।

—কি প্ল্যান?

—আর একটা নতুন কারখানা খুলব। টায়ারের কারখানা। বাজারে টায়ারের প্রচুর চাহিদা। সাইকেল, মোটর সাইকেল, ট্রাক, বাস বাড়ছে হু হু করে। আমার বন্ধু প্রশান্ত রূপনারায়ণপুরে একটা টায়ারের কারখানা খুলেছে। ফ্যাক্টরিটা চলছে ভাল। প্রচুর মুনাফা। আমি এই ময়ূরাক্ষী নদীর আশেপাশে প্রচুর জমি কিনেছি। সব পতিত। বালি চাপা। কোনটাই কৃষিজমি নয়। সেইসব ডাঙ্গা বা বালিচাপা জমিতে টায়ার ফ্যাক্টরি খোলা যেতে পারে। কৃষির কোন ক্ষতি হচ্ছে না, বরং কিছু লোককে কাজ দেওয়া সম্ভব। এলাকার আর্থিক উন্নতি হবে। তোমার কি মত?

—ভাল তো। আপনার পরিকল্পনা ঠিকই আছে।

—প্রশান্তকে বলব সব ব্যবস্থা করে দিতে। সে এক্সপার্ট লোক দিয়ে কারখানা গড়ে দেবে। আমি শুধু ক্যাপিটাল জোগাব। আর একটা কথা, এই ফ্যাক্টরির দেখাশোনার ওভারঅল দায়িত্ব তোমাকে নিতে হবে।

চমকে উঠল উদাস—আমি কি পারব মামাবাবু। আমি তো এব্যাপারে কিছুই জানি না।

—ঠিক পারবে। তোমাকে আমি ট্রেনিং দিয়ে দেব। রূপনারায়ণপুরের কারখানায় তোমাকে পাঠাব। দেখেশুনে শিখে নিতে পারবে। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে। পরিশ্রম করতে পার। এখন বল তুমি কি করবে?

—আপনি যদি দায়িত্ব দেন, তাহলে নিতেই হবে। আপনাকে আমি না বলতে পারি না। যেটুকু দাঁড়িয়েছি, সব আপনার জন্যে। আপনার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

—আহাহা, ওসব কথা থাক উদাস। তবে হ্যাঁ, যেদিন তোমার কথা বলল ভাগ্নে সুনীল, এবং তুমি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, সেদিন আমার মনে সংশয় ছিল, তুমি ঠিকমতো পারবে কিনা। মাস তিন পর বুঝলাম, আমার ধারণা ভুল। তুমি

ঠিকই পারবে। তুমি সিনসিয়ার ছেলে! চেষ্টা আছে। হিস্ট্রিতে অনার্স করেও তুমি অ্যাকাউন্টস্ ভাল জান। ভাল বোঝ। তুমি জয়েন করার পর, আমার ব্যবসার আরো উন্নতি ঘটেছে। মুনাফা বেড়েছে উদাস।

—মামাবাবু, আপনার ইঁট ভাল। শক্তপোক্ত। লোনা মুক্ত। বাজারের তুলনায় কম দাম। ইঁটের কোয়ালিটি ভাল হওয়ায় কাস্টমার বেড়েছে। অন্য কোম্পানি শুধু লাভের দিকটা দেখে। আপনি তা দেখেন না।

—সেল দ্বিগুণ হওয়াতে আমার বেশ পুষিয়ে যাচ্ছে উদাস। আমার তো মনে হয়, এসবের মূলে তোমার সততা, তোমর পরিশ্রম। আগে দু-একজনকে দেখেছি, তারা টাকাপয়সা সরায়। হিসেবে গণ্ডগোল করে। বাধ্য হয়ে তাদের বাদ দিয়েছি। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। যখন যা টাকাপয়সা দরকার হবে, তুমি বলবে আমাকে, সংকোচ করবে না। তুমি আমাকে দেখছ, শিল্পা ইঁট কোম্পানিকে দেখছ, আমারও উচিত তোমাকে দেখা।

তা বলবে উদাস। দেবেশ দত্ত তাকে দেখছেন। তার মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন বেশ। এতটা আশা করেনি। মাকে সব বলে উদাস। তার মাইনের বৃদ্ধির কথা। মা বললেন—উদাস, তুই যেন দেবেশবাবুর দানের সম্মান রাখতে পারিস। কোন প্রতারণায় যাবি না, কোন লোভে পা দিবি না। দেবেশবাবুর কোন ক্ষতি করবি না।

—মা, তুমি যা বললে সেইভাবে চলি মা। দেবেশবাবু আমার অন্নদাতা। এই কাজটা না পেলে, কোথায় আমি ভেসে যেতাম! তোমাকে আজও ঠোঙা বানাতে হত। তোমাকে সুপারি কাটতে হত। আমি তোমাকে আরাম দিতে পারছি মা। সারাজীবন কত কষ্ট করেছ, আমার নিজের চোখে দেখা, শুধু ডাল আর ভাত। তরকারি নেই। তুমি শেষ জীবনে যাতে ভাল থাক, আনন্দে থাক তা দেখা আমার কর্তব্য। আমার ধর্ম মা। মা হাসলেন। বললেন—আরও সুখে থাকব, আনন্দে থাকব, যদি তুই আমার একটা কাজ করে দিস।

—কি কাজ মা?

—আমার বউমা এনে দে। সুন্দর সুশ্রী একটা বউমা। তাকে আমি নিজের মেয়ের মতো ভালবাসব। আমার মেয়ে নেই। বউমাকে দিয়ে সে সাধ মেটাব। আমি এখানে ওখানে যাব। সে আমার সঙ্গে থাকবে। পায়ে তার ঘুঙুর পরিয়ে দেব। এ ঘর ও ঘর করবে, তার সঙ্গে ঘুঙুরের শব্দ হবে, আমার কান জুড়িয়ে যাবে উদাস।

—মা, এত স্বপ্ন ভাল নয়। ধর, বিয়ে করলাম, বউ আনলাম, কিন্তু দেখা গেল, তোমার সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। এটা তো হতেই পারে। শাশুড়ি বউমা সম্পর্ক কোনকালে ভাল নয়। শত্রুতার সম্পর্ক। ঘরে ঘরে গিয়ে দেখ, আমার কথা ভুল নয়।

বউ এসে যদি তোমার অযত্ন করে, তোমাকে কথা শোনায়, অপমান করে, তখন আমি কি করব বল? আমার সইবে?

—আগে থেকে মন্দ ভাবতে নেই। ভাল হোক, মন্দ হোক, বিয়ে তো তোকে করতেই হবে। আমি কি চিরকাল ভাত জল করব তোর? আমার বয়স হয়েছে। পৃথিবীতে চিরকাল কারুর থাকার নিয়ম নেই। আমি চলে যাব তোর বাবার কাছে।

উদাস কাতর কণ্ঠে বলল—এমন করে বলো না মা। তুমি না থাকলে সারা পৃথিবী আমার কাছে অন্ধকার হয়ে যাবে। আমার বেঁচে থাকার মানে থাকবে না।

—তুই একটা পাগল ছেলে। রাণী ঠিকই বলে।

—কি বলে?

—মাসিমা লক্ষ্য করে দেখবেন, উদাসদা কেমন পাগল পাগল। কোনদিকে ওর লক্ষ্য নেই। কে ওকে ভালবাসে, কে বাসে না, তাও জানে না।

রাণীর কথা ভাবতে ভাবতে হাসল উদাস। রাণী আমাকে পাগল বলে, কিন্তু আসল পাগল তো রাণীই। না হলে বলে, উদাসদা আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমাকে বিয়ে কর। বলে কিনা, তোমাকে ভাইফোঁটা দিই, দিতে মন চায় না, তবু দিই, না, একটা সম্পর্ক তো রাখতে হবে। না হলে তোমাকে বাঁধব কি করে? তবে রাণীর মনটা ভাল। এমন ভাল মন আজকাল বেশি মেয়ের নেই। গরিবের প্রতি ওর একটা টান আছে। একদা নিজে গরিব ছিল রাণীরা, এখন অর্থবান হয়েছে, কিন্তু গরিবের কথা ভোলেনি। প্রায় ওর বাড়িতে এক-আধজন গরিবের পাতা পড়ে। তাদের ডেকে খাওয়ায় রাণী।

পৃথিবীতে যত দান আছে, সবার সেরা অন্নদান। অন্ন শরীরকে বাঁচিয়ে রাখে। কত কত লোক দেশের দুবেলা খেতে পায় না। দেশের অধিকাংশ লোক গরিব। তাদের সমস্যার সমাধান আজ পর্যন্ত হল না। হবে কি করে? ভারতবর্ষ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। অসৎ লোকের দেশ। এমন যার পরিস্থিতি, সে দেশের উন্নতি হয়?

রাণী এক কাণ্ড করল। পুরনো দোকান ছেড়ে দিল। তার পাশে পতিত এক কাঠা জায়গা কিনে নিল। তার উপর দোতলা ঘর নির্মাণ করল। সব ঘটে গেল তাড়াতাড়ি। ভাল পয়সার মালিক রাণী। একদিন সে বলল—উদাসদা, হঠাৎ যদি তোমার টাকার দরকার পড়ে, বলবে আমাকে, আমি দেব তোমাকে।

—শেষে তোর কাছে হাত পাততে বলছিস রাণী?

—নিজের লোকের কাছে হাত পাততে লজ্জা নেই। আমি তোমার পর নই। তুমি আমার আপনজন।

—এসব বলে কেন আমাকে মায়ার বন্ধনে জড়াস রাণী? আমার ভয় করে। আমি মুক্তি চাই।

—কি যে সব বল উল্টোপাল্টা। তোমার কথা আমি বুঝে উঠতে পারি না। উদাসদা, তুমি কি সন্ন্যাসী হবে? কে বলল বন্ধন খারাপ জিনিস? এই তো আমি নানা বন্ধনে জড়িয়ে আছি, বাপের বাড়ির বন্ধন, শ্বশুরবাড়ির বন্ধন, দোকানের বন্ধন, তোমার বন্ধন, কই আমি তো এতটুকু খারাপ নেই। কত আনন্দে আছি! আর মুক্তি চাইছ? কোন কালে তোমাকে আমি দেব না। চিরকাল আমি তোমাকে জড়িয়ে থাকব। ঠিক লতার মতো।

দোতলায় টেলারিং। একতলায় ফ্রক এবং মেয়েদের সালোয়ার কামিজের সমারোহ। সে দোকানে বসবে রাণী এবং তরুণ। ভাগাভাগি করে। দোতলার দুটো কাটার রাখবে রাণী। কয়েকটি সেলাই মেশিন। বলতে গেলে একটা ওয়ার্কশপ খুলে বসতে চলেছে রাণী।

রাণী যখন দোকান দিল, উদ্বোধন করল পাঁজিপুঁথি দেখে, এসবে ওর প্রবল অনুরাগ, দিন স্থির করে দেখা করল উদাসের সঙ্গে।

—উদাসদা তোমার সঙ্গে সিরিয়াস কথা আছে।

—তোর তো সব কথাই সিরিয়াস।

—ইয়ার্কি মেরো না। ভাল লাগে না। শোন, কাল আমার দোকানের উদ্বোধন। একেবারে নিজস্ব দোকানের উদ্বোধন। ঠিক বেলা ৯টা ১০ মিনিটে। পুরোহিতমশাই বলে দিয়েছেন। আর উদ্বোধন করবে তুমি। তুমি ফিতে কাটবে।

আঁৎকে উঠল উদাস—বলিস কি রে? এই শহরে কত গণ্যমান্য লোকের বাস। সমাজসেবী, অধ্যাপক, নামকরা শিক্ষাবিদ্, কি নেই আমাদের শহরে। তাদের বাদ দিয়ে, আমাকে দিয়ে উদ্বোধন, তুই এই কথা ভাবলি কি করে! আমাকে দিয়ে করালে তোর দোকান লাটে উঠবে। সে দায়ভাগ নিতে হবে আমাকে। আমি রাজী নই।

—রাজী তোমাকে হতেই হবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তরুণকে বলেছি। সে বলেছে, একদম সঠিক সিদ্ধান্ত। সে বলেছে, উদাসদার মতো মানুষ সংসারে ক'টা হয়? সেই একমাত্র যোগ্য ফিতে কাটার।

—তোরা তো আমাকে আচ্ছা ঝামেলায় ফেললি। আমি তোদের দোকানের উদ্বোধন করব, ভাবতে আমার হাসি পাচ্ছে।

—হাসি বন্ধ রাখ দয়া করে। মিষ্টির প্যাকেট করেছি। তুমি এবং তরুণ তা বিলি করবে। তারপর একটু নামগান হবে। এক কীর্তনিয়া আসবে। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। বাড়িতে কিছু লোক খাবে। তোমার এবং মাসিমার নিমন্ত্রণ। মাসিমাকে আমার বলা হয়ে গেছে। তিনি উদ্বোধনের সময় থাকবেন বলেছেন।

—এত টাকা পয়সা খরচ করছিস রাণী!

—তা হোক। তোমাদের আশীর্বাদে দোকান চলবে এবং যা খরচ করছি, তার দশগুণ আমি তুলে নেব। আমার ব্যবসা বাড়বে বই কমবে না। আমার এখন তুঙ্গে বৃহস্পতি। কেউ আমাকে আটকাতে পারবে না।

সে রাত্রে বিছানায় শুয়ে, অনেক কথা ভাবল উদাস। তার মনে হল, এ উদ্বোধন আর একজনকে দিয়ে করালে ভাল হতো, যদি উদ্বোধনটা মাধুদিদি করতো। যদি তাকে ডাকা হতো, আরও সুন্দর হতো না কি?

পরদিন ৯টা ১০ মিনিটে মাহেন্দ্রক্ষণে দোকান উদ্বোধনের ফিতে কাটল উদাস। চটপট অনেক হাততালি পড়ল। ছবি উঠল। ক্যামেরাম্যান ছবি তুলেই যাচ্ছে। রাণীর মা শাঁখ বাজাচ্ছেন। উদাসের মা উলু দিচ্ছেন। এক নাটকীয় দৃশ্য। নিজেকে হঠাৎ এক বড়মাপের মানুষ বলে ভাবছে উদাস। তাকে এই দুর্লভ সম্মান দিয়েছে রাণী। নাঃ মেয়েটাকে অগ্রাহ্য করা যাচ্ছে না। তার প্রতি উদাসের স্নেহ উপচে পড়তে লাগল। তরুণ নারকেল ফাটাল। ভিড় করা মানুষের দঙ্গালে, আবিষ্কার করল উদাস, মাধুরীদি একপাশে দাঁড়িয়ে। তাকে ডাকল উদাস—মাধুদি সামনে এসো। প্রথম মিষ্টির প্যাকেট উদাস তুলে দিল মাধুদির হাতে। ভারী তৃপ্তি পেল উদাস। তার মনে হল, এতক্ষণে অনুষ্ঠানটি পূর্ণতা পেল। আর কোথাও ফাঁক নেই। হে অমৃতের সন্তান, তোমরা তা গ্রহণ কর। পরম ব্রহ্মের সঙ্গে এক হয়ে যাও। তাঁকে উপলব্ধি কর। সেই তোমার গতি।

॥ ১৮ ॥

দেবেশ দত্ত পুজোর দশদিন আগে সবাইকে বোনাস দিলেন। ৮.৩৩ হারে। স্থায়ী অস্থায়ী সব কর্মী তা লাভ করল। পঞ্চমী থেকে দশদিন ছুটি ঘোষণা করলেন দেবেশবাবু। সব কর্মচারি খুশি হয়ে উঠল। নিজেকে বলল উদাস, মালিক হিসাবে দেবেশ দত্ত ভাল লোক। তিনি কাউকে শোষণ করেন না। কর্মচারিদের গালমন্দ করেন না। মেজাজ দেখান না। বরং শ্রমিক কর্মচারিদের উপর তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। উদাস মনে করে, মালিকদের এমনটি হওয়া উচিত। শুধু তাদের লক্ষ্য মুনাফা নয়। দেশের সার্বিক স্বার্থ দেখা উচিত। শ্রমিককে দেখা উচিত।

রাণীকে বলল উদাস—চল তো রাণী বাসস্ট্যাণ্ড।

—কেন?

—মায়ের জন্যে দুটো শাড়ি কিনব। বাসস্ট্যাণ্ডে যে বড় কাপড়ের দোকানটা আছে 'বাংলার বধূ' সেখান থেকে কিনব। পছন্দের ব্যাপারে তুই তুলনাহীন। আমি ভাল শাড়ি, মন্দ শাড়ি চিনি না। বুঝি না।

—তুমি কি চেন উদাসদা? কিছুই চেন না।

তা গেল রাণী উদাসের সঙ্গে বাসস্ট্যাণ্ডে। পুজো আসছে। বাসস্ট্যাণ্ডে মানুষের ভীড় বাড়ছে। বাড়ছে চেঁচামেচি। কোলাহল। বাসস্ট্যাণ্ডের ভিতরে এবং বাইরে প্রচুর দোকান। তিনতলা বিল্ডিং পর্যন্ত। 'বাংলার বধূ' বড় দোকান। শুধুমাত্র শাড়ির দোকান। হরেক কিসিমের শাড়ি। মিছিলের মতো মেয়েদের ভীড়। সন্ধ্যার পর ঢোকা যায় না দোকানে। রাণী দুটো শাড়ি পছন্দ করে দিল। বলল—মাসিমাকে খুব মানাবে।

—চমৎকার শাড়ি। এবার তুই নিজের জন্যে একটা পছন্দ কর।

—মানে?

—পুজোর সময় তোকে একটা শাড়ি উপহার দিতে চাই।

—খুব পয়সা হয়েছে বুঝি?

—তা হয়েছে। পয়সা তোর একার থাকবে, আমার থাকবে না? বোনাস পেয়েছি রে বোনাস। দেবেশবাবু সবাইকে একমাসের বেতন ফ্রি দিয়েছেন।

—ওঃ তাই এত স্ফূর্তি! এত কেনার ধূম! এখন শাড়ি দিচ্ছ, তার মানে, ভাইফোঁটায় আর শাড়ি দেবে না। তুমি যা কৃপণ লোক, দুবার দেবে না নিশ্চয়।

—দুবারই দেব।

—সত্যি?

—ডাঁহা সত্যি।

—ওঃ কি আমার ভাগ্য! একেবারে দাতা কর্ণ এলেন। রাণী মাঝারি দামের শাড়ি নিচ্ছিল। উদাস তা হতে দিল না। সে একটা মহার্ঘ শাড়ি পছন্দ করে বলল—এটা তুই নে।

—এ যে অনেক দাম উদাসদা। এত টাকা খরচ করবে? তাছাড়া তুমি তো জানো, আমি দামি শাড়ি পরি না।

—তা জানি। তুই দাদার পয়সায় শাড়ি কিনছিস, কম দামের নিবি কেন? আর আমিই বা কম দামের দেব কেন? আমার প্রেস্টিজ আছে না!

নিঃশ্বাস ফেলল রাণী। তারপর বলল—তোমার মতো দাদা, যেন জন্ম জন্ম ধরে পাই। উদাস রাণীর মাথায় হাত দিয়ে বলল—তথাস্তু। তুমি পাবে। রাণী হেসে উঠল। সুন্দর হাসি।

দুদিন পরে উদাস জামাপ্যাণ্টের পিস কিনল। ডেকে পাঠাল বুবুনকে। তার হাতে প্যাকেট তুলে দিয়ে বলল—এটা তোকে পুজো উপলক্ষ্যে আমার গিফট। বুবুন বলল—না না উদাসদা, আমি নেব না। তুমি অন্য কাউকে দাও। চোখ পাকিয়ে বলল উদাস—একদম কথা বাড়াবি না বুবুন। তাহলে তোর সঙ্গে সম্পর্ক কাট। ধর, ধর বলছি। বাধ্য হয়ে নিল বুবুন। বলল—তুমি সত্যিই রেগে গেছ উদাসদা।

—তোরা তো আমাকে না রাগিয়ে ছাড়বি না। যেমন রাণী, তেমনি তুই।

পুজোর সময়। দেবেশবাবুর সঙ্গে আসানসোল এসেছে উদাস। তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি। দেবেশবাবুর পাড়া সুভাষ লেনে এক বিশাল জাঁকজমকের পুজো হয়। লক্ষ লক্ষ টাকার পুজো। বহু মানুষ তিনদিন ধরে প্রসাদ পান। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। সে যেন এক মহাযজ্ঞ। দেখার মতো। বলার মতো। দেবেশবাবু বললেন—চল উদাস, আমার বাড়ি। তিনদিন থেকে আসবে। গাড়িতে যাবে আমার সঙ্গে। তিনদিন থেকে গাড়িতে করে ফেরার ব্যবস্থা করে দেব। এই পুজোর প্রেসিডেণ্ট আমি। আমাকে মোটা টাকা ডোনেট করতে হয়।

মাকে বলল উদাস, মা বললেন—নিশ্চয়ই যাবি। দেবেশ দত্ত তোর মালিক, অন্নদাতা। তিনি তোকে নিমন্ত্রণ করেছেন। কেন যাবি না?

—আমি না থাকলে তোমার অসুবিধে হবে না মা?

—কেন হবে? তিনদিনের ব্যাপার। রাণী আছে, বুবুন আছে, ওরা আমাকে দেখবে।

তা ঠিক। যেখানে রাণী থাকে, বুবুন থাকে, সেখানে কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। ওরা বুক আগলে তাকে রক্ষা করে।

রাণীকে বলল উদাস। রাণী চোখদুটো সরু করে বলল—কি ব্যাপার বল তো উদাদা? মালিক একেবারে তোমাকে তার বাড়িতে তুলতে চাইছে! কেমন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি।

—এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের কি দেখলি? কেন মালিক তার কর্মচারিকে বাড়িতে যেতে বলতে পারে না?

—তা পারে। তবে তিনদিন থাকতে হবে। গাড়ি করে যাওয়া, গাড়ি করে ফেরৎ আসা, আমার সুবিধে লাগছে না ব্যাপারটা। দেবেশবাবুর অবিবাহিত বিটি-টিটি নেই তো? খবর নিতে হচ্ছে।

—আমি ঠিক জানি না।

—ঠিকই জান। তোমার অজানা কিছু আছে? কিন্তু তুমি আমাকে বলবে না।

রাণী ঠিকই বলেছে। উদাস দেবেশ দত্তের বাড়ির খবর রাখে। দেবেশবাবুই বলেছেন। যাদের গল্প শোনা যায়, তাদের দেখতে ইচ্ছে করে, এটা হিউম্যান সাইকোলজি। এবার সে সুযোগ হচ্ছে। রাণীকে সব বলল না। কেন বলল না? যদি সে উল্টোপাল্টা কথা বলে! রাণীর মুখ খুব। খুব কঠিন কথা খুব সহজে বলে দেয়। ঠোঁটকাটা আর কি! এমন কথা বলবে, উদাসের কানে সইবে না।

ভবেশ দত্তের, উদাস জানে, তিন মেয়ে, দুই ছেলে। দুটি মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ব্যবসায়ী পরিবারে। বড় ব্যবসায়ী। তারা ধনী লোক। ছোট মেয়ে জুঁই পড়াশোনা

করে। মেডিক্যাল পড়ে। ভবিষ্যতে লণ্ডন যাবে উচ্চ শিক্ষা নিতে। ছেলে দুই। দুজনেই ব্যবসায়ী। একজন হোটেল করছে। তিনতলা হোটেল। বড় রাস্তার ধারে। হোটেলের কাজে একতলা দোতলা ব্যবহার হয়। তিনতলায় ছেলে থাকে তার দুই পুত্র এবং স্ত্রী নিয়ে। অন্য ছেলেটি ওষুধের ডিস্ট্রিবিউটার। হোলসেল। বিরাট কারবার। বড় বড় কোম্পানির এজেন্ট। মার্কেট বিশাল। আলাদা বাড়ি করে থাকে দুই কন্যা সহ স্ত্রীকে নিয়ে। যতদূর জানে উদাস, ছেলেদের সঙ্গে দেবেশ দত্তের সম্পর্ক ভাল নয়, কেন ভাল নয়, এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার উদাসের কাছে। ওদের তো উদাসদের মতো টাকার অভাব নেই। টাকা না থাকলে সম্পর্কগুলো বিষাক্ত হয়ে যায়, কিন্তু টাকা থাকলেও কি সম্পর্ক তিক্ত হয়? জানে না উদাস।

দেবেশ দত্ত থাকেন পুরনো বাড়িতে। আসানসোলের সুভাষ লেনে। দেবেশবাবু, তাঁর স্ত্রী এবং অবিবাহিতা কন্যা জুঁই। এছাড়া তিনজন কাজের লোক। তারাও সে বাড়িতে অবস্থান করে। ধনীদের বাড়িতে একাধিক কাজের লোক থাকে, মাইনে করা দাসদাসী থাকে, এটা লক্ষ্য করেছে উদাস। প্রয়োজন না থাকলেও থাকে। এটা কি আভিজাত্যের প্রকাশ?

আসানসোল এল উদাস। না, মায়ের জন্য চিন্তা হচ্ছে না। বুবুন আছে। রাত্রে বুবুন তার বাড়িতে থাকবে। বুবুন খুব সাহসী ছেলে। গায়ে ভাল জোর। কোন কিছুকেই সে ভয় করে না। উদাস ভীরু প্রকৃতির। সবসময় সে নিজেকে গুটিয়ে রাখে। একটা খোলসের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকে। আজকাল শহরের হালচাল এমন হয়েছে, বাড়ি খালি করে কোথাও যাওয়া যায় না। বয়স্ক কোন মহিলাকে একা রেখে যাওয়া সম্ভব নয়। হয় চুরি, ডাকাতি বা খুন ঘটে যাবে। আজকাল রাত্রে চুরি করার রেওয়াজ উঠে গেছে। ওটা দিনদুপুরে সংঘটিত হচ্ছে। দিনের আলোতেই কাজটা ভাল হয়। টর্চ লাগে না।

আর খুনের কথা না বলাই ভাল। যে কেউ যখন খুশি, অতি সামান্য কারণে, খুন হতে পারে। এরকম ঘটনা প্রায় স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সংসারে। পেশাগত খুনিতে সমাজ ভরে উঠেছে। কে বাঁচবে বা মরবে সেটা নির্ভর করে তাদের উপর। তারা বিরূপ হলেই গেল। মুণ্ডু গড়াগড়ি খাবে রাস্তায়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলো নীরব দর্শক। ফসলের জমিতে থাকা কাকতাড়ুয়া পুতুলের মতো। কালো টুপি, খাঁকি পোশাক সম্বল।

দেবেশবাবু ৮.৩৩ হারে বোনাস দিয়েছেন শুনে রাণী বলল—তোমার ক্যাপিটালিস্ট মালিক লোকটা তো মন্দ নয়।

—তুই ক্যাপিটালিস্ট মানে জানিস?

—ওমা, তা জানব না কেন। ক্যাপিটালিস্ট মানে তো পুঁজিপতি। প্রায় তো রাস্তায় মিছিলে শ্লোগান ওঠে, পুঁজিপতির কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও। জানো উদাসদা, যত শ্লোগান উঠছে, তত দেশে পুঁজিপতি বাড়ছে। এ এক রহস্য।

আসানসোলে গাড়ি ঢুকল। এর আগে দুবার এসেছে আসানসোল উদাস। দুবারই রাত্রে। মানে সে বরযাত্রী হয়ে দুটি বিয়েতে এসেছিল। আবার ভোরের অন্ধকারে ফিরে গেছে। পায়ে না হাঁটলে শহরকে চেনা যায় না। তার মর্মে প্রবেশ করা যায় না। শুধু জানে উদাস, আসানসোল শহরে প্রচুর লোকের বাস। অবাঙালি লোকের সংখ্যা বহু। এখানে দুটি ভাষা চলে। বাংলা এবং হিন্দি। ইংরেজিও চলে। হাওয়াতে টাকা ওড়ে। ধরার কৌশল জানা থাকলে রোজগার করা কঠিন নয়। আশেপাশে প্রচুর কোলিয়ারি। শহরের পূর্বপ্রান্তে রাস্তা চলে গেছে, রানিগঞ্জ দুর্গাপুর হয়ে বর্ধমান। পশ্চিমের রাস্তা চলে গেছে বরাকর হয়ে ধানবাদ অর্থাৎ ঝাড়খণ্ড।

গাড়ি দাঁড়াল এক বড় বাড়ির সামনে। দেবেশবাবু বললেন, আমরা এসে গেছি। নাম উদাস। ওই দেখ, বারান্দায় জুঁই দাঁড়িয়ে। মেয়েটিকে দেখল উদাস। এই প্রথম তার দর্শন। ফর্সা। গোলগাল। মুখশ্রী ভাল। মিষ্টি বলতে বাধা নেই। গাড়ির হর্ণ বাজল। হর্ণ শুনে দেবেশবাবুর, মনে হয় তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি জানতেন, উদাস আসবে। তিনি বললেন—এসো উদাস। ভিতরে এসো। আহ্বানটা আন্তরিক। ভাল লাগল উদাসের। সে অন্দরে ঢুকল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা হল। আলাপ পরিচয়। তারপর উদাসের টিফিন এল। ফলমিষ্টির টিফিন। পেট ভরে উঠল। জুঁইয়ের সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেল। বেশ সপ্রতিভ মেয়ে জুঁই। হবেই তো। একে ধনী কন্যা, তারপর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রী। তার তো স্মার্ট হওয়ারই কথা। তার কথাবার্তায় কোন সংকোচ নেই। বরং উদাসের বাধো বাধো ঠেকছিল। এসময় উদাস প্রাথমিক জড়তা কাটিয়ে উঠল। জুঁই তাকে দোতলার এক ঘরে নিয়ে গেল। বলল—এ ঘরে থাকবেন আপনি। ঘরটা বড়। খাট আলমারি টেবিল টিভি সব রয়েছে। দোওয়াল এবং সিলিং ডেকরেটেড। ঘরের এক কোণে এয়ার কুলার। শুনেছে উদাস, এ শহরে ব্যাপক গরম পড়ে। জলের হাহাকার ওঠে। জলের অভাব উদাসের কাছে নতুন কোন সংবাদ নয়। তার শহরে তীব্র জলসংকট দেখা দেয় এপ্রিল মে জুন মাসে। পুরসভা জল দিতে পারে না। বাড়িতে ট্যাপ ওয়াটার পাওয়া কবির কল্পনামাত্র। সূর্যের তাপমাত্রা দিনে দিনে বাড়ছে। গাছপালা দ্রুত হারে কমে যাচ্ছে। ব্যাপক নগরায়ণ চলছে। বাড়ির পর বাড়ি। তার মধ্যে মানুষ নামক পোকা। পৃথিবীতে জলের ভাণ্ডার সীমিত। তাই যদি হয়, মানুষ একদিন পানীয় জল পাবে না। জলাভাবে দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে। একদিন এমন হবে, গাছপালার অভাবে মানুষ ভাল করে

নিঃশ্বাস নিতে পারবে না। সব কমে যাবে, শুধু বেড় যাবে মানুষের সংখ্যা। অপরিমেয়।

উদাস দুর্গাপ্রতিমা দেখল। চমৎকার। এই পূজার যে কমিটি আছে, তার সভাপতি দেবেশ দত্ত। দেবীর দর্শনীয় সজ্জাকরণ দেখে আপ্লুত হয়ে গেল উদাস। আর কি ভীড়। তার সঙ্গে ছিল জুঁই। সুন্দর চেহারার ছেলেমেয়েরা, নারী পুরুষরা মহার্ঘ বস্ত্র পরিধান করে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টেবিল চেয়ার পেতে একদিকে খাওয়া দাওয়া চলছে। নিমন্ত্রণ অবাধ। কত কত লোক প্রসাদ খাচ্ছে। ঠাকুরের প্রসাদের প্রতি লোভ আছে উদাসের। সে বলল—চল জুঁই, আমরাও প্রসাদ খাই। জুঁই বলল—হ্যাঁ উদাসদা। আজ রাত্রিতে আমাদের বাড়িতে রান্না হবে না। আমরা সবাই প্রসাদ খাব এখানে। আপনি পেটপুরে খাবেন। লজ্জা করবেন না যেন। উদাস লজ্জিত হয়ে বলল—না না, লজ্জা করব কেন!

—অবশ্য খিদে পেলে বাড়িতে ফ্রিজে খাবার থাকবে, ফল আছে। মিষ্টি আছে। কোল্ড ড্রিংক্স আছে। আপনার রুমে ফ্রিজেও আছে। ইচ্ছে হলে খেতে পারবেন।

পাশাপাশি বসে উদাস এবং জুঁই প্রসাদ খেল চেয়ার টেবিলে। জুঁইয়ের শরীর থেকে এক মিষ্টি সুবাস প্রবাহিত হচ্ছে। কোন দামী সেন্ট মেখেছে জুঁই। তারই প্রকাশ। প্রথমে ফলপ্রসাদ, তারপর খিচুড়ি প্রসাদ। দুটি তরকারি। একটি ভাজা। চাটনী। সুস্বাদু পায়েস। খেতে এত ভাল লাগল উদাসের যে বলার নয়। জুঁই পায়েস নিল দুবার। উদাসকে দিতে বলল।

জুঁই বলল—উদাসদা, পায়েসটা বেশ বলুন।

—চমৎকার জুঁই। জানো জুঁই, যেখানেই ঠাকুরের প্রসাদ খাই, একটা আলাদা মাত্রার স্বাদ পাই। এটা বোধহয় ঠাকুরের মহিমা।

—আপনি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন উদাসদা?

—হ্যাঁ করি। গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে করি। তুমি জুঁই?

—তিনি থাকুন বা না থাকুন, এ বিশ্বাসটা ভাল। মনে জোর পাওয়া যায়। কাজে উৎসাহ আসে।

এইরকম করে তিনদিন উদাসের স্বপ্নের মতো কাটল। নবমীর দিনে আতসবাজি পুড়ল। কি তার বিন্যাস, কি তার বাহার! আকাশ রঙিন সাজে সেজে উঠল। যেন সে সালঙ্কারা সুন্দরী গৃহবধূ। উদাস মুগ্ধ হয়ে গেল।

প্রতিদিন তাকে নিয়ে বের হতো জুঁই। হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়াত। উদাস শহর দেখত। চিনত। কত দেবীপ্রতিমা দেখল উদাস। দুজনে গীর্জা গেল। জুঁই মোমবাতি জ্বালল। সে আলোয় জুঁইয়ের মুখটা অন্যরকম হয়ে উঠল। তার ছবি উদাসের বুকে আটকে রইল। চেনা জুঁই অচেনা হয়ে গেল।

উদাসের নৌকা

দশমীর দিন বেলা এগারোটা নাগাদ চলে যাচ্ছে উদাস। ফিরে যাচ্ছে তার শহরে। জোর করে, আচ্ছা করে তাকে টিফিন খাইয়ে দিল জুঁই। তার হাত থেকে নিস্তার পাওয়া কঠিন। দেবেশবাবু গাড়ি রেডি করে রেখেছেন। ড্রাইভার জহর তাকে পৌঁছে দেবে তার জন্মভূমির শহরে, যে শহরে উদাস বড় হয়েছে। স্কুলে পড়েছে। কলেজে পড়েছে। শহরের প্রতিটি রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছে দিনের পর দিন। বাল্যকালে ডাংগুলি খেলেছে। গাছে চড়ে আম পেড়েছে। এই শহরকে উদাস ভালবাসে। তার প্রথম প্রেম। উদাস প্রণাম করল দেবেশবাবুকে। তাঁর স্ত্রীকে। জুঁই প্রণাম করল উদাসকে। এক ভবিষ্যত ডাক্তারণী তাকে প্রণাম করছে ভেবে শিহরিত হল উদাস। জুঁই একটা চাঙ্গারী দিয়ে দিল উদাসের হাতে। সঙ্গে এক বোতল মিনারেল ওয়াটার। উদাস বলল—এটা কি?

—মিষ্টি আছে। আপনার মাকে দেবেন। রাস্তায় তেষ্টা পেলে এই জল খাবেন। মায়ের প্রতি এত ভালবাসা জুঁইয়ের! তার মাকে কেউ ভালবাসলে অভিভূত হয়ে যায় উদাস। শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করল চাঙ্গারী। গাড়িতে উঠল উদাস। সেই মুহূর্তে গাড়ি ছাড়ার আগে জানলা দিয়ে জুঁই বলল—আপনার সঙ্গে চলে যেতে ইচ্ছে করছে উদাসদা। ভীষণ ইচ্ছে করছে।

—বেশ তো চল না। দুদিন থেকে আসবে। আমার মা খুশি হবেন।

—আপনার নিমন্ত্রণ মনে থাকবে। আজ নয়, পরে যাব একদিন। ঠিক যাব। দেখে আসব বুবুনকে, রাণীকে, আপনার মাকে। কাল কলকাতা যাচ্ছি। পরশু থেকে স্পেশাল ক্লাস। আমার কথা আপনার মনে থাকবে তো উদাসদা।

—আমি কাউকে ভুলি না।

—ঠিক বলছেন?

—আমি মিথ্যে কথা বলতে পারি না জুঁই। তাহলে আসি জুঁই। তুমি ভাল থেকো।

—আপনিও ভাল থাকবেন। আপনি চলে যাচ্ছেন, আমার মন খারাপ লাগছে। তিনদিন আমাদের বাড়িতে থেকে আমাদের কম আনন্দ দিলেন না! আবার আসবেন যেন।

—হ্যাঁ আসব।

—জহরদা খুব সাবধানে গাড়ি চালাবে। একদম হুড়োহুড়ি করবে না। রাস্তায় বড় ট্রাফিক।

—ঠিক আছে ছোড়দি।

গাড়ি ছেড়ে দিল। গাড়ি চলছে রাস্তার একধার ধরে। পাশ দিয়ে হুসহাস গাড়ি চলে যাচ্ছে। গাড়িতে বাতাস ঢুকছে। চোখ বন্ধ হচ্ছে বারবার। বেশ আরাম বোধ করছে উদাস। ভরা পেট। তার ঘুম এসে যাচ্ছে। জুঁইয়ের ছবি চোখের সামনে ভাসছে।

॥১৯॥

বিকেলের দিকে কোর্ট বাজার যাচ্ছে উদাস। তার বাহন বের করেছে। সাইকেলটা তার বাবার আমলের। তার বাবা এটা ব্যবহার করতেন। বাবার পর উদাস। উত্তরাধিকার। মা বলেছেন—তুই একটা নতুন সাইকেল কেন উদাস। ওটা আর চলে না। রং চটে গেছে। কেমন ভাঙা ভাঙা হয়ে গেছে। মা ঠিক কথা বলেছেন।

নতুন সাইকেল যখন তখন কিনতে পারে উদাস। তার এখন যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য। তবু কেনে না। বাবার সাইকেলের প্রতি তার অগাধ মমতা। এটাতে যে বাবার হাতের স্পর্শ আছে!

রাণীর দোকান পেরুবার সময় ডাকল—উদাসদা, এদিকে এস একবার। সাইকেল থামাতে হল।

—বল কি বলবি?

—আঃ দোকানে এসো না। ওভাবে কথা হয়। ছুঁড়ে ছুঁড়ে কথা বলায় সুখ নেই। অগত্যা দোকানে ঢুকতে হল। একটা টুলে বসতে হল। রাণী একটার পর একটা ফ্রক প্যাকিং করছে।

—কখন এলে আসানসোল থেকে?

—এই বেলা সাড়ে ১২টার সময় ধর।

—একটা মারুতি জেন, লাল রঙের, সেটাতে ফিরেছ?

—তুই কি করে জানলি?

—গাড়িটা তোমার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আগের গাড়িটা তো নয়।

—দেবেশবাবু তিনখানা গাড়ি ব্যবহার করেন।

—পুঁজিপতিদের হালচালই আলাদা। কত লোকের একটা সাইকেলও নেই। আর একজনের তিনখানা গাড়ি! ভাবা যায়? এ দেশের হালচালই আলাদা।

—কি বলবি বল?

—বলছি। তা মামারবাড়িতে আদরযত্ন কেমন হল?

—ভাল। বেশ ভাল।

—এই তিনদিন আমাদের কথা মনে ছিল?

একবার ভাবল উদাস বলে দেয়, না ছিল না। কিন্তু তা বলার বিপদ আছে। এটা রাণীর কেস। সাবধানে কথা বলতে হবে। ভেবেচিন্তে কথা না বললে, রাণীর কথার প্যাঁচে ধরাশায়ী হতে হবে। উকিলের জেরা ওর। বা তার থেকেও বেশি।

—তা থাকবে না কেন? তোর কথা, বুবুনের কথা, মার কথা মনে পড়ত। জুঁইকে সেকথা বলেছি।

—কে জুঁই? নতুন নাম শুনছি। তা নামটা মন্দ নয়। জুঁই ফুলের গন্ধ পাচ্ছি।

—মালিকের ছোট মেয়ে। কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। ভবিষ্যতে বিলেত যাবার সম্ভাবনা।

—তা নিশ্চয়ই জুঁই অবিবাহিত।

—তা তো বটেই। এখন তার বিয়ের প্রশ্নও নেই। পড়াশোনা করছে করুক। আরে বিয়ে তো হবেই একদিন। তা তরুণ কই?

—বাবু সিনেমা দেখতে গেছেন?

—তুই গেলি না?

—আমার আর্জেন্ট অর্ডার আছে। কত কাজ জান আমার? কত ব্যস্ত আমি? এমনি এমনি পয়সা হবে? খাটতে হবে, খুব খাটতে হবে। আমি বড়লোক হবার চেষ্টায় আছি। না হয়ে ছাড়ছি না।

—তুই তো বড়লোকই রাণী।

—বড়লোকের থেকে বড় হতে চাই। ধনী হতে চাই।

—তুই এখন তাই।

—ঠাট্টা করছ?

—না। একদম না। এখন আর বসব না রে রাণী। বাজার যেতে হবে। ঘরে আনাজপত্র নেই। ও আর একটা কথা, এই পুজোর ক'দিন তোর ব্যবসার সেল কেমন হল।

—সুপার সেল। যা ধারণা করেছিলাম, তার দ্বিগুণ তো বটেই, আরো বেশি হতে পারে। এখনও হিসেব নিকেশ হয়নি। লাভ অঢেল। তোমার আশীর্বাদ বৃথা যায়নি উদাসদা। আমি বলেছিলাম না তোমাকে? বলিনি?

সাইকেল চালাতে চালাতে ভাবল উদাস, রাণীর চোখে কিছুই এড়ায় না। সে কোন গাড়িতে ফিরেছে তাও। উদাসকে পৌঁছে দিয়ে ড্রাইভার জহর গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যাচ্ছিল। আসানসোল। বাধা দিল উদাস। বলল—জহর, চল একটু চা খাবে। ঘরে চল। বিশ্রাম নেবে। তারপর যাবে। জহর বাড়ির ভিতরে এল। মায়ের সঙ্গে গল্প করল। চা মিষ্টি খেল। সবমিলিয়ে আধঘণ্টা ছিল। তারপর গাড়ি নিয়ে চলে গেল জহর। দুবরাজপুর রোড ধরবে।

রাণীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে জুঁইয়ের কথা বেরিয়ে গেল। ওটা না বললেই ভাল হতো। রাণীর খবর শোঁকা নাক আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে। সে আরও অনুসন্ধান চালাবে। খবর ভেদ করবে।

সকালে জুঁই ডাকত উদাসকে—চলুন উদাসদা, বাজার করে আসি। তার হাতে ব্যাগ দুটো।

—তুমি বাজার করো জুঁই?

—না, আমি করি না। অন্য লোক করে। জহর আছে। তবে মাঝেমাঝে করি। করতে ভাল লাগে। আপনি করেন না?

—খুব করি। বাজার করতে আমারও বেশ ভাল লাগে জুঁই। এবার জুঁই মুখ টিপে হাসল। বলল—দেখছেন উদাসদা, আপনার সঙ্গে আমার কত মিল! জুঁইয়ের কথায় উদাস হো হো করে হেসে উঠল।

তা জুঁইয়ের সঙ্গে গেছে উদাস বাজার। ঘুরে ঘুরে দুজনে আনাজপাতি কেনে। দুজনের হাতে দুটি ব্যাগ। বোঝাই হতে থাকে ব্যাগদুটো ক্রমশ। উদাস দেখল, তার শহরের জিনিসপত্রের দামের তুলনায় এখানে বেশি দাম। আসলে এখানে সকল লোকের হাতে কাঁচা পয়সা। বেশি রোজগার। তাই দামও বেশি। এখানে জিনিসটা পাওয়াই বড় কথা। দাম নয়। তারপর রিক্সা করে বাড়ি ফেরা। হাতেটানা রিক্সা। চড়ে মজা পায় উদাস। একসময় বলে সে—

—তোমার তো দুই দিদি জুঁই?

—হ্যাঁ।

—কই তারা তো এলো না পুজোতে?

—দুই দিদি জানিয়ে দিয়েছে ফোনে, এখন তারা খুব ব্যস্ত সংসারে। পুজোতে আসতে পারবে না। ভাইফোঁটায় আসবে আসানসোল। ভাইফোঁটায় আমাদের বাড়িতে প্রায় উৎসব লেগে যায়। তিন বোন। দুই ভাই। সঙ্গে বাচ্চাকাচ্চা। হৈ হৈ ব্যাপার। সময়টা খুব সুন্দর কাটে। ইচ্ছে করলে আপনিও আসতে পারেন উদাসদা।

—আমাকে কে ফোঁটা দেবে?

—কেন আমি দেব। দিদিরা দেবে। কত ফোঁটা চান!

—উপায় নেই জুঁই। ওখানে রাণী আছে। তার কাছে ফিবছর ফোঁটা নিতে হয়। এর কোন ব্যতিক্রম চলবে না। অন্ততঃ রাণী এবং আমি বেঁচে আছি যতদিন।

আসানসোলে, সেদিন রাত্রি ১০টা নাগাদ জুঁই এল উদাসের ঘরে। এই শহরের লোকেরা রাত্রি জাগে। তারা বিছানায় বিশ্রাম নেয় রাত্রি ১২টার পর। ওঠে দেরিতে। সূর্য উঠলে, বেলা হলে। উদাসের শহরের নিয়ম আলাদা। সেখানে মানুষ শয্যা আশ্রিত হয় রাত্রি ১০টা অথবা সাড়ে দশটা। ভোরে ওঠা। সূর্য জেগে ওঠার আগে। যখন প্রত্যুষের আলো বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে, উদাসের শহরের লোকেরা সেই নরম আলো মেখে নেয় ঘুম থেকে উঠে। দুটো শহরের চরিত্র আলাদা। হবেই তো। একটা মফঃস্বল শহর। অন্যটা কসমোপলিটন। জুঁই বলল—আমি গান জানি, আমার গান শুনবেন উদাসদা?

—তুমি গান করতে পার? জানি না তো।

—তেমন অবশ্য কিছু নয়। কয়েক বছর একটা মিউজিক কলেজে শিক্ষা নিয়েছিলাম। তারপর পড়াশোনার চাপে আর হয়ে ওঠেনি। ডাক্তারি পড়া না পড়লে গানটা নিয়েই থাকতাম।

—গান তো আনন্দময় বস্তু। গান হচ্ছে মন্ত্র। সবাই এটা পারে না। ঈশ্বরের করুণা চাই।

—তাই উদাসদা! তাহলে গাই। জুঁই গান ধরল—ঝরাপাতা গো, আমি তোমারি দলে। ঝরাপাতা, ঝরাপাতা... রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে জুঁই। এ গান কেন বেছে নিল জুঁই? এ গান তো তারই। উদাস তো সংসারের ঝরাপাতা। কেবলই ঝরে ঝরে যায়। ঝরতে ঝরতে ঝরাপাতার স্তূপ হয়ে যায় গাছতলায়। এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। কোন পথিক তার উপর হাঁটে। যন্ত্রণায় ঝরাপাতাগুলো আর্তনাদ করে ওঠে। মরমর ধ্বনি ওঠে। অথবা কোন দুঃখী মেয়ে একটা ঝুড়ি এনে, ঝাঁট দিয়ে সে ঝরাপাতাগুলো তুলে নেয়। তারপর তাদের সমর্পণ করে অগ্নিতে। ঝরাপাতা তখন জ্বলতে থাকে। পুড়তে থাকে। গাইছে জুঁই অন্তরা—শেষের বেশে সেজেছ তুমি কি এ। ঝরাপাতা গো...

উদাস স্বপ্ন দেখেছিল, একটা চাকরি করবে স্কুলে। পড়াতে তার ভাল লাগে। বাড়িতে শিশুদের সে পড়ায়। কিন্তু সে চাকরি জোটাতে পারেনি স্কুলে অথবা কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে। সব পরীক্ষায় ব্যর্থ সে। শেষে বেসরকারি কনসার্নে চাকরি। ইচ্ছে ছিল মাটির বাড়ি, কাদার গাঁথনি ইঁটের বাড়ি ভেঙে দিয়ে দালান করবে। এখনও সেটা সম্ভব হয়নি। পুরাতন বাড়িতে দিন গুজরান। এ বাড়িতে বর্ষাকালে বেশ কষ্ট। উঠানে জল দাঁড়িয়ে যায়। রান্নাঘরে যেতে মাকে ভিজতে হয়। উপরে ছাওনি নেই। বছর বছর রান্নাঘরের চাল ছাইতে হয়। ভাল বাথরুম নেই। একতলা বাড়ি। একটি ঘর শুধু পাকা। গ্রীষ্মে বসবাস দুঃসহ হয়ে ওঠে। গরমকাল ক্রমবর্ধমান। দোতলা হলে হাওয়া মিলত। মা চাইছেন, একটা সুশ্রী মিষ্টি মেয়ে উদাসের বউ হোক। যে মাকে দেখবে। তাঁকে বেশি কাজ করতে দেবে না। বলবে— না মা, আপনাকে করতে হবে না। আমি করছি। আপনি এখন বিশ্রাম নিন তো। এই বয়সে এত পরিশ্রম, আমি রয়েছি কি করতে? এতদিন আপনি করেছেন, তখন আমি ছিলাম না, এখন আমি এসে গেছি, এত খাটতে আপনি পারবেন না। আমি দেব না। দিলে আমার দোষ হবে।

ঘরেতে একদিন কোন শিশুর কান্না শোনা যাবে। মা তাকে কোলে করে নিয়ে ঘুরবেন। বলবেন—কই বউমা, দাও আমাকে দাও। ওকে বাইরে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। লোকজন, গাড়িঘোড়া চলমান বস্তু দেখে সে শিশু বিস্ময়ে হাঁ করে থাকবে। ঘাড় ঘুরিয়ে এটা-ওটা দেখবে। কান্না ভুলে যাবে। একসময়ে খিলখিল

করে হেসে উঠবে। কোন স্বপ্নই অস্পর্শযোগ্য নয়। তবু তা হয়নি। এখনও অধরা কেন?

একসময় গান থেমে গেছে। শেষ হয়েছে। জুঁই ঘর ছেড়ে চলে গেছে। কিন্তু উদাসের হৃদয়ের কাঁপন থামেনি। সে পুরীর সমুদ্রের মতো অশান্ত। ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে। কে তাকে থামাবে? কে বুঝবে?

কুন্তির সঙ্গে দেখা। সেও বাজার করছে কোর্ট প্রাঙ্গণের মার্কেটে। উদাস বলল—তুমি এই বিকেলে বাজার করছ! সকালে নয় কেন? মিষ্টি হাসল কুন্তি। বলল—সকালে সময় পাই না। মায়ের শরীর খারাপ। প্রেসার হাই। ডাক্তার ওষুধ খেতে আর বিশ্রাম নিতে বলেছেন। কাজ করা বারণ। রান্না আমি করি। তারপর মিশনের কাজ। সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটে। বাজার করার সময় হয় বিকেলে, অথবা সন্ধ্যায়। আপনি এখন এখানে উদাসদা?

—ঠিক তোমার মতো বাজার করতে। উদাস নিল—আলু পটল কুমড়ো লাউ আদা লঙ্কা। কুন্তি বাজার করা শেষ করে আবার এল উদাসের কাছে। বলল—আমার হয়ে গেছে। আমি চলি উদাসদা তাহলে।

—আচ্ছা এসো।

—একদিন আসুন আমাদের বাড়ি। আগেও তো বলেছি।

—মনে আছে। যাইনি সেটা আমার দোষ। নিশ্চয় যাব একদিন। গেলে রবিবার। তাছাড়া আমার সময় হবে না।

—তাই আসুন। রবিবার সারাদিন আমি বাড়িতে। চলে গেল কুন্তি। ইতিহাসের পাণ্ডবজননী। চলে গেল কুন্তি, কিন্তু তার সঘন উপস্থিতি রেখে গেল অনেকক্ষণ।

রাত্রে খাওয়ার পর, তক্তার উপর মশারী খাটিয়ে নিল উদাস। বড় মশা। মশা এই শহরের একটা বড় ব্যাধি। রাস্তাঘাটে যত্রতত্র আবর্জনা। নালাগুলো ময়লাতে বুজে আছে। সেখানে জল থমকে আছে। একমাত্র বর্ষাকালে জলের তোড়ে সেগুলো পরিষ্কার হয়। বাকি সময় জল স্থির। সেখানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি মশা জন্মায়। তারা মানুষকে আক্রমণ করে। গোটা শহর জুড়ে মশার আধিপত্য। দাপট। মশামারা ধূপ, অল আউট, ধূপ-ধুনো ব্যবহার করে মানুষ। ফলপ্রদ কাজ হয় না। বিকেল তিনটে বাজলে মশার ভনভনানি শুরু হয়, যত সময় গড়ায়, মশার সঙ্গীত বাড়তে থাকে। মশা মারতে পৌরসভার কোন উদ্যোগ নেই। কোন ভাবনা নেই। জল সরবরাহে ব্যর্থতা বছরের পর বছর। জঞ্জাল পরিষ্কারে অনীহা। তাহলে তারা করে কি? উপর মহল থেকে নিচের মহল যা করে, তাই তারা করে। নিজের নিজের ভবিষ্যৎ গোছায়। ভারতবর্ষ এক দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। সবার লক্ষ্য এক।

ঘরের মধ্যে হালকা নীল বাল্ব জ্বলে। উদাস ঘর অন্ধকার করে ঘুমুতে পারে না। মাথার উপর ফ্যান ঘোরে। ফ্যানটা গোঁ গোঁ শব্দ করে। কতদিনের পুরনো ফ্যান। ওর দোষ নেই। সবাই তো একদিন অবসর চায়। উদাস ঠিক করে, ওকে শিগগিরি অবসর দেবে।

ঘুম আসছে না উদাসের। প্রায় দিন ভাল ঘুমায় উদাস। দু-একদিন তার ব্যতিক্রম ঘটে। আজ যেমন ঘটেছে। দু চোখে ঘুম আসছে না। ঘুমপরীরা উধাও হল কোথায়? তার বদলে একজন চোখের সামনে। জুঁই। বেশি লম্বা নয় জুঁই। মুখ গোলাকার। একটু মোটাসোটা। বেশ ফর্সা রং। দেখে বোঝা যায়, বাপমায়ের আদুরে কন্যা। তার বাবা মা জুঁই বলতে অজ্ঞান। তারা পাঁচ সন্তানের মধ্যে জুঁইকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেন। জুঁই বড় পড়া পড়ছে। ভবিষ্যতে সে ডাক্তার হবে। একদিন বিদেশ যাবে।

কানে এসে ছুঁয়ে গেল জুঁইয়ের সঙ্গীত। বেশ গায় জুঁই। গলা ভাল। গাইবার সময় সে চোখ বন্ধ করে রাখে। বোধহয়, তার তন্ময়তা জাগে। এইরকম সুন্দর গান, হয়তো বা বেশি, উদাস একটি মেয়ের গান শুনেছিল। সে একবার বীরচন্দ্রপুর গেছিল। চৈতন্য পরিকর নিত্যানন্দের জন্মস্থান। তার আশ্রম। সেদিন ছিল নিত্যানন্দের জন্মোৎসব দিবস। শত শত মানুষের ভীড়। এক গভীর উচ্ছ্বাস এবং আনন্দধারা বইছে চারদিকে। মানুষের চোখেমুখে ভক্তির আকুতি। প্রধান মন্দির নির্মাণ এখনও শেষ হয়নি। বিশাল সে মন্দির। শেষ হতে এখনও বেশ সময় লাগবে। বোধহয় কোটি টাকা খরচ।

নাটমন্দিরে বহু ভক্তের উপস্থিতিতে শুরু হল এক গীতি-আলেখ্য। বিষয়—গৌরচাঁদ এবং লক্ষ্মীপ্রিয়ার প্রেমকাহিনি। লক্ষ্মীপ্রিয়ার ভূমিকায় বিপাশা নন্দী। কলেজে পড়া মেয়ে। সে তার কোকিল কণ্ঠ দিয়ে ভক্তিরসের সঙ্গীত পরিবেশন করল। তার কণ্ঠের মূর্ছনা নাটমন্দির ছাড়িয়ে, মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বিস্তারিত হল আকাশে বাতাসে। সুর এবং কণ্ঠের কি যাদু! অভিভূত হল উদাস। বিমোহিত হল। কতদিন হয়ে গেছে সে গান শোনা। তবু আজও তা উদাসের কান ছুঁয়ে আছে। মাঝে মাঝে বাজেও।

না, ঘুম আসছে না। আজ বোধহয় ঘুম হবে না। জুঁই কি সারারাত গেয়ে যাবে—ঝরাপাতা গো...। উদাস উঠে জল খেল। একবার ছাদে উঠল। চারদিক দেখল। বিদ্যুতের আলো এখানে ওখানে। আলোর বন্যায় ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। আর নৈঃশব্দ। কোন বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে পড়েছে। সে কাঁদছে। তার ক্ষীণ শব্দ উদাসের কানে এল। মাথার উপর আকাশ। ঝকঝকে পরিষ্কার। কোথাও মেঘের লেশ নেই। সেখানে শুধু তারার রাজ্য। কত তারা! তার সংখ্যা কত? মানুষ গুণে

শেষ করতে পারেনি। ঋষিরা বলেছেন, মহাকাশ অনন্ত। তার শুরু নেই। শেষও নেই। ঠিক ঈশ্বরের মতো।

আবার নিচে নামল উদাস। হাতঘড়ি দেখল। রাত প্রায় দুটো। এখন কি করবে উদাস? বোঝা যাচ্ছে, আজ তার ঘুম হবে না। উদাস নীল বাল্বটা নিভিয়ে দিয়ে, টিউব লাইটটা জ্বেলে দিল। সারা ঘরে আলো হুটোপুটি করতে লাগল। তারপর লাইব্রেরি থেকে আনা বইটি পড়তে শুরু করল। গৌতম বুদ্ধের জীবনী। যে মানুষটা পৃথিবীর সব মানুষকে বাঁচার পথ দেখিয়েছেন। বুদ্ধং শরণম্ গচ্ছামি।

॥২০॥

উদাসের মা অসুস্থ হলেন। বলতে গেলে একরকম হঠাৎ। মানুষের কখন যে কি হয়! মায়ের জ্বর এক সন্ধ্যায়। বেশ জ্বর। উদাস মাকে একটা প্যারাসিটামল ট্যাবলেট খাইয়ে দিল। তারপর তার বিছানায় শুইয়ে দিল। মায়ের শীত লাগছে। উদাস একটা মোটা চাদর দিয়ে মায়ের শরীর ঢেকে দিল। আধঘণ্টা পর মায়ের জ্বর যেন কমে এল। মা উঠে বসলেন। উদাস বলল—উঠলে যে মা! বাথরুম যাবে? ধরব?

—রান্না বাকি আছে। সেগুলো সারি।

—সে কি, তুমি এই শরীরে রান্না করবে? আমি করে নিচ্ছি। শোও বলছি শোও। একদম উঠবে না। কাল সকালে তোমাকে ডাঃ ঘোষের কাছে নিয়ে যাব। ডাঃ এস ঘোষ একজন সুখ্যাত ডাক্তার। চেম্বারে রোগী ধরে না। তাঁর সঙ্গে উদাসের পরিচয় আছে। তাঁকেই দেখাবে উদাস। কয়েকদিন ওষুধ খেলে মা ঠিক চাঙ্গা হয়ে যাবেন।

উদাসের ধমকে কাজ হল। মা শুয়ে পড়লেন। উদাস রান্নাঘরে গেল। সে রান্না জানে। রুটি-লুচি করতে পারে। একসময় সে মুড়িভাজা শিখে গিয়েছিল। উদাস কোন কাজে পিছপা নয়। মায়ের বাকী কাজ সে করে নিল চটপট। ঘরে এসে দেখল, মা ঘুমিয়ে পড়েছেন। শরীরে এখন আরাম পাচ্ছেন। উদাসের তক্তায় শুয়ে মা। মা আজ এই ঘরে থাকুন। এক ঘুম ঘুমিয়ে নিন। তারপর মা যদি কিছু খেতে চান, উদাস একবার বাইরে গিয়ে একটা পাঁউরুটি কিনে আনল। খুব নরম পাঁউরুটি। মা চাইলে ঝোল করে দেবে।

আলু পটল দিয়ে ঝোল। এসব আনাজ তরকারির ঝুড়িতে আছে। উদাস দেখেছে। রোগীর ভাল পথ্য। মশা বাড়ছে। ঘরে কয়েল জ্বলছে। এর গন্ধটা ভাল লাগে না উদাসের। কেমন তার অন্য অনুভূতি হয়। গা বমি বমি লাগে। ডাক্তাররাও কয়েল ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। তবু মানুষের উপায় নেই। মশার অত্যাচার থেকে বাঁচতে হবে। দুঃসহ তাদের আক্রমণ! তারপর নিজের বিছানা করে নিল মেঝেতে। মায়ের ঘরের মশারীটা খুলে আনল। টাঙাল। ঘুমিয়ে পড়ল উদাস।

সকালে মায়ের জ্বর এল দ্বিগুণভাবে। এত জ্বর যে মা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। মা উঠতে পারছেন না। এই অবস্থায় সে মাকে কি করে নিয়ে যাবে ডাঃ ঘোষের চেম্বারে? যাওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তারবাবুকে কল দিলে তিনি আসতে পারবেন না। রোগীর চাপ।

কোন ডাক্তার তো চাই। উদাস ভাবল, যাই রাণীর সঙ্গে একটু পরামর্শ করে আসি। রাণীর দোকানে গেল উদাস। তখন সকাল ৭টা। রাণী দোকান খুলে দিয়েছে। খবরের কাগজ পড়ছে। এই শহরে আগে কাগজ আসত ৯টার পর। এখন সেদিন নেই। ভোর পাঁচটাতে কাগজ এসে যায়। ছ'টার মধ্যে শহরের মানুষ ঘরে ঘরে কাগজ পেয়ে যান। স্তূপীকৃত কাগজ নিয়ে হকাররা এ পাড়া ও পাড়া ছড়িয়ে পড়ে সাইকেলে। শন শন করে সাইকেল ছোটে। কত ব্যস্ত মানুষ হকাররা। রোদ বৃষ্টি গরম শীত ঝড় কিছুই তাদের আটকাতে পারে না। তারা যেন এক একটা যোদ্ধা। কর্তব্যকর্মে একান্ত এক একটা সৈনিক।

রাণী সব কথা শুনল। তারপর বলল—চিন্তা নেই। দাঁড়াও, লাইনের ওপারে এক বুড়ো ডাক্তার আছেন। ডাঃ চৌধুরী। বাড়িতেই তাঁর চেম্বার। আমার সঙ্গে খাতির আছে। তুমি বাড়ি যাও উদাসদা। আমি ডেকে আনছি। এর মধ্যে রাণীর দোকানের একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এসে গেল। রাণী বলল—তরু তুই দোকানে থাক। উদাসদার মা অসুস্থ। আমি ডাক্তার ডাকতে যাচ্ছি। তরু ঘাড় নাড়ল।

রাণী একটা রিক্সা করে লাইনের ওপারে গেল। উদাস বাড়ি ফিরে এল। মায়ের কাছে বসল। মা ক্লান্ত জীর্ণ। একদিনের জ্বরে মায়ের মুখটা শুকিয়ে গেছে কেমন। যেন ঝরা পাতা। বুকটা ওঠানামা করছে। থার্মোমিটার দিল উদাস। মায়ের বেশ জ্বর। ২০ মিনিটের মধ্যে রাণী এসে গেল। সঙ্গে ডাঃ চৌধুরী। বয়স্ক ডাক্তার। তিনি মায়ের চোখ টেনে দেখলেন, প্রেসার মাপলেন, স্টেথিসকোপ দিয়ে বুক পিঠ দেখলেন। বললেন—জোর ঠাণ্ডা লেগে গেছে। ওষুধ লিখে দিচ্ছি। দিন তিন লাগবে। রাণী বলল—প্রেসক্রিপশনটা দাও আমাকে। আমি ওষুধ নিয়ে আসছি।

—এখন মেডিকেল স্টোর সব বন্ধ। সাড়ে আটটার আগে পাবি না। খুলবে না।

—দোকান খুলিয়ে নিয়ে আসছি। ডাঃ চৌধুরীকে রিক্সা ধরিয়ে দিল রাণী। ফিরল তারপর।

উদাস বলল—ডাক্তারবাবুর ফীজ কত? তোকে টাকাটা দিয়ে দি রাণী।

—টাকা লাগবে না। উনি ফীজ নেননি। আমার কেস। সবার কাছে টাকা নেন না। প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে গেল রাণী। আধঘণ্টার মধ্যে ফিরল। ক্যাপসুল এবং সিরাপ নিয়ে এল। ওষুধগুলো বুঝিয়ে দিল উদাসকে। মাকে সেইমতো খাওয়ানো হল। রাণী

বলল—দুপুরে আমি একবার এসে দেখে যাব। উদাসদা, আজ তুমি ছুটি নাও। সাইটে যেও না।

—না, আজ যাব না। ফোন করে দিচ্ছি।

—তোমার বাজার করতে হবে? তাহলে বুবুনকে ডেকে দিচ্ছি।

—না বাজার আছে। লাগবে না।

—আজ তুমি আমাদের বাড়িতে দুপুরে খে নেবে। আমি মাকে বলে দিচ্ছি। রাত্রে বুবুন বুটি পৌঁছে দেবে, না হয় আমি

—রাণী, আমি রান্না করে নেব। আমি সব পারি।

—ও হো, আমি তো ভুলেই গেছলাম, তুমি রান্না জানো। একদিন তোমার রান্না খেতে হবে আমাকে। দেখতে হবে কেমন রাঁধ।

—যেকোনদিন খেতে পারিস। তুই ইলিশ মাছের ভক্ত। আমি তোকে ইলিশ ভাপা খাওয়াবো। তুই ভুলতে পারবি না।

—বটে! বেশ দেখা যাবে। রাণী চলে গেল ... তার ব্যবসাতে। উদাস মায়ের কপালে হাত বোলাতে লাগল, যদি মায়ের কষ্ট কমে। মা কেমন আচ্ছন্ন। হবেই তো। ধুম জ্বর! বেলা ৯টা নাগাদ আবার রাণী এল। হাতে প্যাকেট।

—ওতে কি রাণী?

—মাসিমার জন্যে নিয়ে এলাম, ফলমিষ্টি। তাছাড়া তোমার টিফিনও আছে।

—আমি মুড়ি খেয়ে নিয়েছি শশা গুড় দিয়ে। টিফিন লাগবে না।

—মুড়ি একটা খাবার হল! খাওয়ার একঘণ্টা পর আবার খিদে! মিষ্টিগুলো খেয়ে নাও। রান্নার খবর কি?

—তরকারি, ডাল হয়ে গেছে। ভাতটা দশটায় চড়িয়ে দেব।

--আমি বাড়ি থেকে রান্নাকরা তরকারি এনে দেব কিছু?

—না লাগবে না, আমি শুধু একটা তরকারি দিয়ে ভাত খেতে পারি। অসুবিধা হয় না। অনেকদিন খেয়েছি তো।

বেলা ১২টার সময় রাণী আবার এল। মায়ের গা মুছিয়ে দিল। শাড়ি জামা বদলে দিল। একটু খাইয়ে দিল ফল মিষ্টি। রাণী বলল উদাসকে—এসব করবে কে? তোমার দ্বারা হবে? একটা বউ নিয়ে এস। এসব মেয়েদের কাজ। ছেলেদের দিয়ে সব কাজ হয় না। মাসিমা তোমাকে বিয়ের কথা বলে না?

—বলে না আবার। খুব বলে। তার জন্যে তো পাত্রী দেখতে হবে, খুঁজতে হবে। সময় লাগবে।

—সে না হয়, একটা ব্যবস্থা আমি করে দেব।

—তোর হাতে ডাক্তার আছে জানি, পাত্রীও আছে!

—সব আছে। সমাজে বাস করতে হলে সবকিছুর খোঁজখবর রাখা চাই, একটা ব্যবস্থা রাখা চাই। কখন কার দরকারে কি লাগে বলা যায়?

একদিকে মায়ের ওষুধ চলছে। অন্যদিকে রাণীর সেবাযত্ন। কিন্তু মায়ের জ্বর ছাড়ছে না। লেগেই রয়েছে। উদাস সাইট যেতে পারছে না। দেবেশবাবু তাকে ছুটি দিয়েছেন, যতদিন প্রয়োজন। চিন্তায় পড়ে গেল উদাস। ডাঃ চৌধুরীকে চিন্তিত দেখাল। তিনি বললেন—উদাস, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি এক কাজ কর, মাকে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। ওখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন। তারা ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন। তাঁরা তো স্পেশালিস্ট। তাঁদের ট্রিটমেণ্ট আলাদা। বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। রাণী বলল—সেই ভাল উদাসদা, সেখানে নার্স আছে, আয়া রেখে দেবে। পেয়িং বেডে থাকবেন মাসিমা। চিকিৎসা ভাল হবে। আমি বুবুনকে ডেকে দিচ্ছি। ওই সব ব্যবস্থা করে দেবে। তোমাকে কিছু করতে হবে না।

বুবুন এসে গেল। সঙ্গে তিন বন্ধু। তারই বয়সী। হাসপাতালে ফোন করল বুবুন। অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। মাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হল। যা করার করল বুবুন। সবার সঙ্গে ওর চেনা। পরিচয়। এমনকি ডাক্তারদের সঙ্গেও। টাকা খরচ করা ছাড়া উদাসের কোন কাজ রইল না। তাও রাণী জিজ্ঞেস করল—টাকাপয়সা সব আছে তো উদাসদা? না হয় আমি দিচ্ছি।

—আছে রাণী। আমার সব রোজগার মায়ের জন্যে। মায়ের সুস্থতার জন্যে সব টাকা খরচ করে দেব। দরকার পড়লে ধার করব। তোর কাছে।

—ভেব না, সাতদিনের মধ্যে মাসিমার জ্বর ছেড়ে যাবে। মাসিমা ফিরে আসবেন। আবার সব ঠিকঠাক চলবে। অসুখ বিসুখ হতেই পারে। কার না হয়!

৩/৪ দিন পেরিয়ে গেল আরও। কিন্তু মায়ের জ্বর ছাড়ল না। ডাক্তাররা ওষুধ দিচ্ছেন, উদাস সেগুলো কিনে আনছে, নার্সরা খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাজের কাজ হয় কই? রাণীর সঙ্গে, বুবুনের সঙ্গে, তরুণের সঙ্গে পরামর্শ করল উদাস। বুবুন বলল—আর দুটো দিন দেখি। তারপর না হয় মাসিমাকে কলকাতা নিয়ে যাব। পি.জি.তে ভর্তি করব।

—পি.জি.তে ভর্তি করা যাবে? না হলে কোন নার্সিং হোমে।

—পি.জি.তেই হবে। ওখানে ভাল ভাল ডাক্তার। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পি. এ.র সঙ্গে আমার দোস্তি আছে। আমি ফোন করিয়ে নেব। চিঠি নিয়ে নেব। ঠিক ভর্তি করা যাবে।

—যা ভাল বুঝিস কর বুবুন। আমি আর ভাবতে পারছি না। আমার ভয় করছে। রাণী ধমকাল—তুমি কেমন মানুষ গো উদাসদা? অল্পতেই ভেঙে পড়। সবকিছুকে

ভয় পাও। মনেতে জোর আন। তোমার থেকে আমার মন শক্ত। এখানে চিকিৎসা চলছে। দরকার হলে আরো বেটার চিকিৎসা ব্যবস্থা হবে। আজকাল কত ভাল ভাল ওষুধ বেরিয়েছে জান? মাসিমা ঠিক সুস্থ হয়ে যাবেন। চল হাসপাতাল। এখুনি একবার মাসিমাকে দেখে আসি।

উদাস বলল—দরকার হলে মাকে আমি চেন্নাই নিয়ে যাব রাণী।

—দরকার পড়বে না। যদি পড়ে, নিয়ে যাবে। আমি সঙ্গে যাব। আমি তো আছিই, নাকি!

॥২১॥

মাকে আর কলকাতায় নিয়ে যেতে হল না। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল। হাসপাতালে, পঞ্চম দিনের ভোরের দিকে মায়ের অবস্থার হঠাৎ অবনতি ঘটল। তখন বেডের পাশে উদাস এবং বুবুন। বুবুন দৌড়ে ডাক্তার ডেকে আনল এমার্জেন্সি থেকে। ডাক্তারবাবু এলেন, পালস দেখলেন, চোখ দেখলেন, তারপর কি যেন ভাবলেন। দুটো ইঞ্জেকশন দিলেন। উদাস বলল—কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু?

—ভাল নয়। একেবারে ভাল নয়। ডাক্তারবাবু চলে গেলেন। মা আচ্ছন্ন। গায়ে জ্বর। এ জ্বর আর ছাড়ানো গেল না। উদাস মায়ের হাত ধরে পাশে বসে থাকে। বুবুন দাঁড়িয়ে।

তারপর মায়ের শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্ট দেখা দিল। দু-একবার হেঁচকি উঠল। তারপর সব যেন থেমে গেল। দৌড়ে নার্স এল। ডাক্তারবাবু এলেন। বুকে স্টেথো বসালেন। তারপর মায়ের চাদর বুক অবধি ঢাকা, সেটা টেনে মায়ের মাথা অবধি ঢেকে দিলেন। মা নেই। মা চলে গেলেন। ইদানীং প্রায় মা বলতেন—এবার আমার যাবার সময় হয়েছে।

—কি সব কথা বল মা। এখনও তুমি অনেকদিন বাঁচবে। ওসব বলবে না।

—উদাস, তুই সত্যিকে এত ভয় পাস কেন রে? তোর বাবা স্বপ্নে প্রায় আমাকে দেখা দেয়। আমাকে ডাকে। আমি তোর বাবার কাছে যেতে চাই। আমার বাকি কাজের মধ্যে তোর একটা বিয়ে দেওয়া। রোজগার তো করছিস। তাহলে এত দেরি কেন? মত দিচ্ছিস না কেন?

—ঠিক আছে মা। তুমি চাইছ, আমি মত দিলাম। পাত্রী দেখ তুমি। মা খুশি হলেন। একে ওকে বলে পাত্রীর সন্ধানে লেগে গেলেন। দু-এক জায়গায় দেখেও এলেন। পছন্দ হল না। এইভাবেই চলছিল।

বুবুন বলল—চল উদাসদা, বাইরে যাই। চারঘণ্টার আগে বডি পাওয়া যাবে না। বাদবাকী কাজ আমি করে ফেলছি। এরপর বুবুন উদাসের মোবাইল নিয়ে একটার

পর একটা ফোন করে গেল। রাণী এল। তরুণ এল। রাণীর মা এলেন। ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে বুবুনের বন্ধুরা মাচা নিয়ে, ট্রাক নিয়ে, ফুল নিয়ে চলে এল। উদাস একটা গাছের নিচে বাঁধানো বেদিতে বসে। তার দৃষ্টি শূন্য। উদাসের দৃষ্টি উদাস। সে ভাবল, জীবন তো এইরকমই। আলো আঁধারি। একবার রোদভরা উঠোন, তারপর কালো মেঘের আস্তরণ। সুখ দুঃখ। দিনরাত্রি। এরই মধ্যে হাঁটে মানুষ। পথ চলে। চলে তার জীবনধারা। নদীর স্রোতের মতো। একসময় সে পৌঁছে যায় পরিণতিতে। বিলীন হয়ে যায় মহাকালে। এ এক অনন্ত প্রবাহ। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। ছেদ নেই। বিরাম নেই। আমরা সবাই এক শৃঙ্খলার অধীন।

উদাসের পাশে এসে বসল তরুণ। উদাসের একটা হাত শক্ত করে ধরল সে। বলল—উদাসদা, দুঃখ করো না। কারুর মা চিরকাল থাকে?

উদাস বলল—আমি ঠিকই আছি তরুণ। ভেঙে পড়িনি। জীবনকে আমি চিনি। শুধু দুঃখ, মা আমার বিয়ে দেখতে চেয়েছিলেন, চলে গেলেন মা। সে সুযোগ আর হল না। মায়ের সাধ আমি পূর্ণ করতে পারলাম না। আর একটা সাধ, মায়ের পুরী দর্শন হল না।

চারঘণ্টা পর মায়ের বডি পাওয়া গেল। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কাগজপত্র সব দিয়ে দিলেন। কোথায় মায়ের শেষকৃত্য হবে উদাস বলে দিল। মা চেয়েছিলেন, সতীঘাটা। সেখানে বাবার দেহ ভস্মীভূত হয়েছে। সেখানেই মা চেয়েছেন তাঁর অন্তিম সৎকার।

সেইরকম ব্যবস্থা হল। বুবুন, বুবুনের বন্ধুরা সবকিছু করল। তারপর উদাসকে ট্রাকে তুলে নিল। তরুণ উঠল ট্রাকে। মেয়েদের নাকি শ্মশানে যেতে বারণ। কিন্তু শুনল না রাণী। সে বলল—আমার মা চলে গেলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমি তাঁর সঙ্গো থাকব। কারুর বারণ শুনব না। স্টেশন বাজার ফিরে গেলেন রাণীর বাবা মা।

তারপর তারা পৌঁছে গেল সতীঘাটা নামক শ্মশানে। ঘন ঘন হরিধ্বনি। পাশে ময়ূরাক্ষী নদী। ঘন গাছপালা। শ্মশানের এখানে ওখানে মৃতদেহের হাড় খুলি পড়ে। চলে যাওয়া মানুষের চিহ্ন। ওপাশে বীরভূম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ। বড় বড় বিল্ডিং।

দেখতে দেখতে স্টেশন বাজার থেকে বহু লোক পৌঁছে গেল শ্মশানে। কেউ সাইকেলে, কেউ রিক্সায়, কেউ বাস থেকে নামল। নারী পুরুষ কিশোর যুবক। উদাস দেখল, কত মানুষ মাকে বিদায় জানাতে এসেছে। এসেছে তারা প্রাণের টানে। মা ছিলেন অজাতশত্রু। মায়ের ব্যবহার ছিল অমায়িক। পাড়ার কোন বাড়িতে কোন ঘটনা ঘটলে মা তৎক্ষণাৎ চলে যেতেন তার বাড়ি। দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। কিছু করার থাকলে করতেন। এমন মানুষ যখন চলে যায় তখন অনেকেই ব্যথা অনুভব করে এবং অকৃত্রিমভাবে করে।

দাহ শেষে নদীতে স্নান করতে করতে উদাস বলল আপন মনে—নদী তোমার কি কিছুতেই যায় আসে না? তুমি কেবলই বয়ে চল, তোমার কাজ করে চল? একবারও থাম না? এই যে আমার মা চলে গেলেন, আমার কত ক্ষতি হল, দুঃখ হল, কিন্তু তোমার তো কিছুই এসে গেল না। মানুষের দুঃখ কি তোমার দুঃখ নয়? উদাস দেখল, তার কোন কথার উত্তর নদী দিল না। তার প্রবাহ সমানে বইছে। সংসারে কার কি হল, তাতে তার যায় আসে না কোনদিন। কেন উদাস বকছে? গা মুছতে মুছতে ভাবল উদাস।

খরচ খরচা সব করছে রাণী। ওই করুক। তারপর একসময় হিসেব করে, তার টাকাপয়সা সব মিটিয়ে দেবে উদাস। রাণী নেবে তো? যা মেয়ে নিতে চাইবে না। তবু জোর করে দেবে উদাস। মা চলে গেলেন, তাঁর অন্তিম সৎকারের খরচ পুত্রকেই দিতে হয়। এটাই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা। পুত্রের পারলৌকিক কর্তব্য।

বাড়ি ফিরল উদাস। এক গ্লাস সরবৎ খেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল শ্মশানের ছবির টুকরো টুকরো অংশ। মায়ের দেহ পুড়ছে চিতায়। উদাস বসে আছে হাত জোড় করে। চিতা থেকে সামান্য দূরে। চিতার আঁচ একটু একটু গায়ে লাগছে। উদাস গ্রাহ্য করছে না। এ আঁচ তার মায়ের স্নেহস্পর্শ।

কয়েক হাত তফাতে রাণী বসে। রাণী কি কাঁদছে! বারবার চোখ মুছছে কেন? নিশ্চয় কাঁদছে। কাঁদিস না, কাঁদিস না রাণী। এ কান্নার কোন মানে নেই। এমনি করে আমরাও এক একদিন চলে যাব একে একে। চিতায় পুড়ব। সংসারের এটাই নিয়ম। মহাকালের অভিলাষ। তাঁর থেকে বড় কে?

মায়ের চিতা ঘিরে বুবুন এবং তার বন্ধুরা। তারা আগুনকে নিভতে দিচ্ছে না। কাঠগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আগুনের শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। তরুণ নেই। সে একটা মোটর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেছে। শ্মশানযাত্রীদের খাবার দাবার আনতে গেছে।

মা পুড়ে গেলেন। জাগতিক সব অস্তিত্ব শেষ হল। চিতায় জল ঢালা হল। ঢালল উদাস বুবুন এবং রাণী। ওঁ শান্তি। শান্তি। শান্তি।

শূন্য হল উদাসের গৃহ। মা নেই। তিনিই এ বাড়ির সব ছিলেন। একটা মানুষ সব বাড়িটা জুড়ে অবস্থান করতেন। তাঁর অভাবে সব শূন্যময়। উদাস বলল অস্ফুটস্বরে—মা, মাগো, তুমি চলে গেলে! আমি কার কাছে থাকব? কে আমাকে দেখবে? কে আমাকে ভালবাসবে! চাকরির টাকা কার হাতে তুলে দেব?

খবর পেয়ে দেবেশবাবু এলেন। শিল্পা ইঁট কোম্পানির অনেক কর্মচারি এলেন। দেবেশবাবু সান্ত্বনা দিলেন, তিনি উদাসের পাশেই আছেন। সবরকম সাহায্য তিনি করবেন। পরদিন জুঁইয়ের ফোন এল। সে বলল—সব খবর পেয়েছি উদাসদা। খুব চলে যেতে ইচ্ছে করছে আপনার কাছে, আপনার পাশে দাঁড়াতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু

যাবার যে কোন উপায় নেই! কাল থেকে ফাইন্যাল পরীক্ষা শুরু। বড় সাধ ছিল, মাসিমার হাতের তৈরি মশলামুড়ি খাব। সে সাধ আমার পূর্ণ হল না। জানি, জীবনের সব সাধ, সব ইচ্ছে পূর্ণ হয় না। আপনি কষ্ট পাবেন না। আপনি কষ্ট পেলে আমিও পাব। পরে আবার ফোন করব। কথা শেষ করল জুঁই।

তিনদিন অশৌচ পালন করল উদাস। সে ও.বি.সি.। তাদের নিয়ম একমাস। সে নিয়ম মানল না উদাস। ভেঙে দিল। রাধাবল্লভ মন্দিরে মায়ের শ্রাদ্ধ করল। কর্তৃপক্ষ সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এসব ব্যাপারে উদাসের সমালোচনা হল সমাজে। উদাস পাত্তা দিল না। একই নিয়ম, একই বোধ কি যুগে যুগে চলবে? তা বদলাবে না? সবের তো বিবর্তন আছে। মাথাও কামাল না উদাস। সপ্তম দিনে দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করল উদাস। ভাল ডাল দুটো তরকারি, ছানার ডালনা, চাটনি, দুটো করে সাদা মিষ্টি বড়, সবার পাতে। গরিবের দেশ ভারতবর্ষ। দারিদ্র এখানকার মানুষের শরীরের ত্বকের মতো। কিছুতেই আলাদা করা যায় না। তারা এল দলে দলে। নারী পুরুষ শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধা। আট থেকে আশি। কেউ বাদ নেই। যা আশা করা গিয়েছিল, তার থেকে খাওয়ার মুখ অনেক বেশি। আবার নতুন করে রান্না হল। রান্না করার মানুষ তিনজন। হেল্পার চারজন। পরিবেশনের ভার বুবুনের বন্ধুদের। সংখ্যায় তারা অনেক। অসম্ভব খাটতে পারে বুবুন। সবার মাথার উপর বুবুন। সে ছোটাছুটি করছে। নজরদারি করছে।

যখন সব চুকল, তখন রাত্রি দশটা। তার আগে উদাস খবর পেল, যারা দুপুরে খেয়ে গেছে, তারা আবার সন্ধ্যাতেও খেতে এসেছে। উদাস বলল—দাও দাও ওদের খেতে দাও। কেউ যেন অভুক্ত না থাকে। আমার মায়ের আত্মা শান্তি পাবে। ওরা যত খুশি খাক। পেট পুরে খাক। ক্ষুধার যন্ত্রণা কি আমি জানি। গরিবের দুঃখ আমি বুঝি। আমার মা বাবা আমি গরিব ছিলাম, ভাতের জন্যে মা ঠোঙা বানাতেন, সুপারী কাটতেন, বড়ি দিতেন। সেসব দিনের কথা আমি ভুলিনি। ভুলব না কোনদিন। যদি ভুলি সেটা আমার পাপ।

॥ ২২ ॥

ঝড় উঠেছিল। আবার শান্ত হল। ঝড়বৃষ্টি দুর্যোগ চিরকাল থাকে না। একসময় তাকে থামতে হয়। উদাসের জীবন ধীরে-ধীরে স্বাভাবিকতায় এল। আবার সে সাইট যেতে লাগল। সে সাতসকালে উঠে রান্নাবান্না করে নেয়। ডাল ভাত একটা ভাজা এবং ডিম সেদ্ধ। রাত্রে হাতেগড়া রুটি কিনে নিয়ে আসে। ওরা তরকারি দিয়ে দেয়। তবে বড় ঝাল। এত ঝাল কেন দেয় ওরা। উদাস ঝাল খেতে পারে না। তার জিব জ্বলে। মুখ জ্বলে।

পাড়ার একটা দোকানে এসব ব্যবস্থা আছে। খদ্দের প্রচুর। কত লোক সেখান থেকে রুটি-তরকারি কেনে। বাড়িতে রান্নার পাট বিশেষ করে রাত্রের দিকে, অনেকে তুলে দিয়েছে। এ শহরে কয়েকটি হোম সার্ভিস আছে। এতে মানুষের সুবিধা বেড়েছে। ফোন করে একটা খবর দিলেই হল। ভাত ডাল মাছ তরকারি ঠিক পৌঁছে যাবে। হোম সার্ভিসের লোকেরাই দিয়ে যাবে। এই হোম সার্ভিসের দৌলতে কিছু বেকার ছেলে রোজগার করছে। তা মন্দ কি! উভয় পক্ষের সুবিধা।

রাণী বলল—বরাবর এভাবে চলতে পারে না। তুমি ভোরে উঠে রান্না-বান্না কর, তারপর টোলের ছাত্রছাত্রীদের পড়াবে, তারপর স্নানাহার সেরে সাইটে দৌড়ুবে, রাত্রে ফিরে দোকানের রুটি চিবুবে, আমি থাকতে তা হতে দিতে পারি না।

—তাহলে কি করব আমি?

—তুমি আমাদের বাড়িতে দুবেলা খেতে পার, তা তুমি খাবে না, আমার কাছে যেতে পার, তুমি নারাজ। তোমার তো খুব প্রেস্টিজ জ্ঞান, কষ্ট করবে, মরে যাবে, তবু মুখ ফুটে কিছু বলবে না। আচ্ছা উদাসদা, তুমি তোমার কষ্টের ভাগ কাউকে দিতে পার না কেন? আমাকে দিতে পার। আমি তা চাই। তোমার সঙ্গে সুখদুঃখ ভাগ করে নিতে চাই। মাসিমা নেই তো কি হয়েছে, আমি তো আছি।

—আমার কষ্ট, আমার দুঃখ আমারই থাক রাণী।

—ও। তা ভাল। তাহলে শোন। আমি ঠিক করেছি, যতদিন না তোমার ঘরণীর ব্যবস্থা হচ্ছে, ততদিন মনার মা, এক বয়স্ক মহিলা তোমার রান্না-বান্না করবে দুবেলা। তোমার কাছে থাকবে। খাবে। দুপুরে বাড়ি পাহারা দেবে। মাইনে যা দেবার দিও মনার মায়ের সঙ্গে কথা বলে। খুব বিশ্বাসী মনার মা। কাজকর্ম ভাল। যতক্ষণ না সন্ধ্যায় তুমি সাইট থেকে ফিরছ, সে থাকবে। বুঝলে আমার ব্যবস্থা?

—তা বুঝলাম। ব্যবস্থা ভালই। তা আমার ঘরণীর ব্যবস্থা কি হবে?

—সে ব্যবস্থাও আমিই করব। আগে মাসিমা ছিলেন তোমার গার্জেন, এখন তিনি স্বর্গে গেছেন, আমাকে গার্জেনগিরি করতে হবে। তোমার বিয়ে আমি দিচ্ছিই। পাত্রীও মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।

—তোকে গার্জেন বলে মানতে আমার কষ্ট হবে রাণী। তুই বয়সে আমার থেকে ছোট। ছোট কাউকে গার্জেন বলে মানা সম্ভব?

—উপায় নেই তোমার, আমাকে না মানলে তুমি ভেসে যাবে। কপাল তোমার এই। তারপর তোমার বউ আসুক, আমি তাকে এনে দিই, তখন আমার ছুটি। আমার মুক্তি।

—তুই আমাকে মুক্তি দিবি রাণী, আমার তা বিশ্বাস হয় না।

—এক অর্থে তুমি ঠিকই বলেছ, আমার হাত থেকে তোমার মুক্তি কোনদিন ঘটবে না।

তা মনার মা, সংসারের দায়িত্ব নিল উদাসের। কাজে যোগ দিল। সকাল ছ'টার মধ্যে চলে আসে। চা করে। উদাসকে দেয়। নিজে খায়। তারপর বিছানা তোলা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, ঘর মোছা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, তার ফাঁকে ফাঁকে রান্না-বান্না। এক ফাঁকে টিফিন দিয়ে দেয় উদাসকে। কোনদিন মুড়ি। কোনদিন সুজি। কোনদিন কলাই সেদ্ধ। যাইহোক তার ব্যবস্থা করে মনার মা। তার পরিশ্রমের শক্তি দেখে অবাক হয়ে যায় উদাস। বয়স তো অন্ততঃ ষাট। রোগা হালকা চেহারা। দেখে বোঝা যায় না, তার মধ্যে এত প্রচণ্ড কর্মশক্তি লুকিয়ে আছে! উদাস বলে—এই বয়সে এত শক্তি কোথা থেকে পাও মনার মা?

—বাবা উদাস, সারাজীবন খাটছি, ছোট থেকে খাটছি, এটা সেই অভ্যেস। সংসারে খাটতেই তো এসেছি। খেটেই যাই।

—তোমার তো এই বয়সে বসে বসে খাবার কথা। তোমার ছেলে-পুলে নেই?

—সবই ছিল উদাসবাবা, মদন বলে আমার একটা জোয়ান ব্যাটা ছিল। রিক্সা চালাত। ভাল কামাই করত। মা বেটায় কুঁড়েতে থাকতাম। সুখে-দুঃখে'দিন কাটত। ভগবানের সইল না। বেটা আমার—

—কি হল মনার মা? থামলে কেন? আর চোখের জল মুচছ কেন? কি হল বল?

—সে ছেলে, কুনুরী স্টেশনের কাছে ট্রেনের চাকায় মাথা দিলে বাবা।

—সেকি!

—মাথা দেবার আগে, মনা আমার কথা একবার ভাবল না বাবা। তুই চলে গেলে মা কি করে খাবে, কোথায় যাবে, এসব কিছুই ভাবল না। তুই গেলি, বেশ করলি, তা মাকে সঙ্গে নিলি না কেন?

—কেন আত্মহত্যা করল তোমার ছেলে?

—কি জানি বাবা। আমাকে কোনদিন কিছু বলেনি। লোকের মুখে শুনেছি, কুনুরী গ্রামের একটা মেয়ের সঙ্গে ভাবভালবাসা হয়েছিল। সে মেয়েকে মদন বিয়ে করতে চেয়েছিল। চায়না, মানে মেয়েটাও রাজি ছিল। মেয়ের বাপ মা রাজি ছিল না। ওদের জমি জায়গা আছে। আমার ছেলে রিক্সা চালায়। তা ওরা রাজি হবে কেন? জোর করে সাঁইথিয়াতে বিয়ে দিল মেয়ের। সেই দুঃখে বেটা আমার—আমি যদি আগে জানতাম, মদন যদি বলত, মেয়ের মা বাবার পায়ে ধরতাম। ঠিক রাজি করাতাম। মদনকে বাঁচাতে পারতাম। নিয়তি বাবা নিয়তি। যার যা কপালে থাকে, সেটাই ঘটে। আমার কপালে আছে বুড়ো বয়সে খেটে খাওয়া, তাই খাটছি।

—তোমার মেয়ে নেই মনার মা? শুধুই একটা ব্যাটা?

—তা নেই আবার। খুব আছে। দু দুটো মেয়ে। কত কষ্ট করে ওদের বড় করেছি। চেয়ে মেগে বিয়ে দিয়েছি। জামাইরা রোজগার করে ভাল। তা যখন মদন মরল, গেলাম দুই মেয়ের কাছে। পাণ্ডবেশ্বরের এক পাড়াতেই বিয়ে দিয়েছি। বললাম, মনা নেই, তোরা আছিস, তোরা আমাকে আশ্রয় দে, দুটো ভাত দে। এই বয়সে পেটের ভাত জোগাড় করতে পারব না রে। মনার মা থেমে গেল।

—আহা হা, মনার মা চুপ করে গেলে কেন? তারপর কি হল বল? কি বলল মেয়েরা?

—দু মেয়েকে বললাম, একমাস একমাস করে তোদের কাছে থাকব। ঘরসংসারের কাজ করে দেব। ঠিক বসে বসে খাব না। তা দু মেয়ের এক কথা। ভাত অত সস্তা নাকি! খেটে রোজগার করতে হয়। এমনি এমনি আসে কি, যে তোমাকে বসে বসে খাওয়াব? তুমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নাও।

—আর কি আমার খাটার বয়স আছে রে?

—খুব আছে। খুব আছে। তোমার থেকেও বুড়ি মানুষ খেটে খাচ্ছে। সংসারে কে কাকে ভাত দেয়! না হবে না। বড় মেয়ে বলল, তবে যদি তোমার কুঁড়েটা আমার আর তোমার বড় জামাইয়ের নামে লিখে দাও, তাহলে তোমার বড় জামাইকে বলতে পারি। তোমাকে ভাত দিতে পারি।

—তা লিখে দিলে না কেন মনার মা? তাহলে তো ভাত পেতে।

—কুঁড়েতে শুধু বড় মেয়ের ভাগ নেই, ছোট মেয়েরও সমান আছে। তা তাকে বাদ দেব কি করে? দুটো মেয়েই তো আমার সমান। তাছাড়া, একটা কথা আছে, বড়মেয়েকে লিখে দেব, দু চারমাস ভাতও দেবে, তারপর একদিন ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বিদেয় করে দেবে। আচ্ছা বল, তা দিতে পারে না?

—তা দিতে পারে। সংসারে শেষ কথা বলে কিছু নেই। তা বেশ করেছ মনার মা, একজনকে লিখে দাওনি, ঠিক কাজ করেছ, তোমার দরকার কি দু'কম করা।

এগারোটায় খেতে বসে উদাস। পাঁচ মিনিটেই তার খাওয়া শেষ। ন'টায় তার টোলের ছাত্রছাত্রীদের ছুটি হয়ে যায়। তারপর টুকটাক বাজার করে উদাস। এই পাড়াতেই কিছু কিছু আনাজপত্র পাওয়া যায়। দাম একটু বেশি। তা তো হবেই। ঠিক বাজার করতে হলে যেতে হবে কোর্ট বাজার অথবা টিন বাজার। টিন বাজারটা বেশ বড়। টাটকা সবজি পাওয়া যায়। ব্যাপারী অনেক। খদ্দেরও। ওখানে একটা ক্লাব আছে। জোনাকি ক্লাব। সেখানে প্রতি বছর দুর্গাপূজা হয়। তার প্রতিমা দেখেছে উদাস। প্রতিবছর নতুন ধরনের প্রতিমা। মন টানে সৌন্দর্যে সে দেবী। কাতারে কাতারে দর্শনে যায় মানুষ। পুজোর ক'দিন ওই এলাকার মানুষের জীবনধারা পাল্টে যায় একেবারে।

স্টেশন বাজারে হঠাৎ সরমাতিয়ার সঙ্গে দেখা। বিহারী স্ত্রীলোক। রোগা পাতলা চেহারা। কত বয়স ঠিক বোঝা যায় না। বড় পান খায়। তরিতরকারির ব্যবসা করে সে। সে ডাকল।

—মাস্টারবাবু।

—কে? ঘুরে দেখল উদাস, সরমাতিয়া। কি খবর সরমাতিয়া। তুমি ভাল আছ?

—মাস্টারবাবু, আমার মা মরে গেল।

—ওঃ, কবে? কি হয়েছিল?

—এই শুক্রবার। মায়ের বিস্তর ওমর হয়েছিল। চার কুড়ি দশ বরষ। অনেকদিন বাঁচল। শেষের দিকে আর উঠতে পারত না। শুয়ে থাকত সমুচা রাত দিন।

—দুঃখ করো না সরমাতিয়া। আমার মাও চলে গেলেন।

—হায় হায়। কেয়া বাত। শুনে বড় দুখ হল মাস্টারবাবু। মা নেই তো, দুনিয়ামে কোই নেই। অনেকেই উদাসকে মাস্টারবাবু বলে জানে। সে ছাত্রছাত্রীর টিউটোরিয়াল চালায়। সে যে একটা চাকরি করে, এটা অনেকের অজানা।

ভাত বেড়ে দেয় মনার মা। তরিতরকারি ডাল সাজিয়ে দেয়। মাছের ঝোল দেয় বাটিতে। যতক্ষণ খায় উদাস মনার মা দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে—উদাসবাবা পেট ভরল, আর কিছু দেবো?

—তুমি বেশ রান্না কর মনার মা। ঠিক আমার মায়ের মতো। মাও সুন্দর রাঁধত। মনার মা, আমি চাকরিতে চলে গেলে, ঠিক ঠিক খাওয়া-দাওয়া করো যেন। কম খেও না। চাল ফুরোবার আগেই বলবে আমাকে। আর একটা কথা, সংসারের এত কাজ তুমি সামলাতে পারবে না। বাসন মাজা, ঘর মোছা, ঝাঁট দেওয়ার জন্যে একটা ঠিকে ঝি রেখে দাও। সে তোমাকে সাহায্য করবে। তোমার খাটনি কমবে। চেনাজানা কোন মেয়ে আছে নাকি?

—তা আছে।

—তাহলে আর দেরী নয়। কালই তাকে কাজে লাগিয়ে দেবে। একবেলা ভাত খাবে। চা মুড়ি খাবে। মাইনে পাবে। আচ্ছা, সেসব কথা মেয়েটার সঙ্গে ঠিক করে নেব। তাহলে কালই।

—কালই আনব উদাসবাবা।

রাত্রে ফোন এল মোবাইলে। বলল উদাস—হ্যালো? ওপাশ থেকে সাড়া এল—আমি জুঁই বলছি উদাসদা হোস্টেল থেকে। তা কেমন আছেন আপনি?

—মোটামুটি আছি। মা তো নেই। তাই পুরো ভাল থাকা সম্ভব নয়।

—শুনুন উদাসদা, সামনের রবিবারে আমি আর সুজয় আপনার বাড়ি যাব। কোন অসুবিধা আছে?

—কিসের অসুবিধা! না কোন অসুবিধা নেই। তা সুজয় কে? উত্তরে একটু চুপ করে রইল জুঁই। বলল তারপর—সুজয় একজন এম. ডি. ডাক্তার। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি। আমরা বিয়ে করব। সুজয় ধরেছে, আমাকে নিয়ে বক্রেশ্বর যাবে, তারাপীঠ যাবে, মশানজোড় যাবে, শান্তিনিকেতন। বীরভূম দর্শন আর কি। তাই ফোন করা। আমরা আপনার বাড়িতে উঠব।

—নিশ্চয় উঠবে। তা দেবেশবাবু জানেন, তুমি আসছ?

—না বাবাকে বলিনি। অসুবিধা আছে। আর আপনি বাবাকেও কিছু বলবেন না যেন।

—কেন বল তো?

—বাবা এসব প্রেম ভালবাসা বিয়ের আগে পছন্দ করেন না। মেজদি বিয়ের আগে একটা ছেলেকে ভালবাসত, রানিগঞ্জে বাড়ি। দিদি বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়ে করার কথা ভেবেছিল। বাবা ঠিক জেনে ফেললেন। মেজদিকে নজরবন্দী করলেন। পরের মাসে বিয়ে ঠিক করে ফেললেন। সে অনেক কাহিনি। পরে একসময় বলব আপনাকে। যাইহোক, আমার খবরটা একেবারে চেপে যাবেন। বাবা যেন কিছুতেই জানতে না পারেন।

—বেশ, তোমার বাবাকে আমি কিছু বলব না। উনি কিছু জানতে পারবেন না। তোমরা দুজন স্বচ্ছন্দে আসতে পার। রেলওয়ে স্টেশনে নেমে, মোড়ে এসে নাম বলবে আমাব। উদাস মণ্ডল। সবাই চেনে আমাকে। বাড়ি দেখিয়ে দেবে।

—আমরা কারে যাব। ওর গাড়ি আছে।

—তাহলে তো আরো সুবিধা। গাড়িতে করে তোমরা তারাপীঠ বক্রেশ্বর যেতে পারবে।

—সেইরকম প্ল্যান উদাসদা। গাড়ি থাকলে অনেক সুবিধা। ইচ্ছেমতো ঘোরাঘুরি করা যায়। আচ্ছা, সব কথা হয়ে গেল। এখন ফোন ছাড়ছি। আপনি ভাল থাকুন। জুঁই তার কথা শেষ করল।

মালিকের ছোটমেয়ে আসছে। এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উদাসের কাছে। তাছাড়া জুঁই আসানসোলের বাড়িতে কম যত্নআত্তি করেনি উদাসের। সবটা না হোক, অন্ততঃ কিছুটা রিটার্ন দিতে হবে। উদাস দৌড় ঝাঁপ শুরু করে দিল। মনার মাকে ট্রেনিং দিয়ে দিল। কি কি করতে হবে বুঝিয়ে দিল। মনার মা বলল—কিছু ভেব না উদাসবাবা, আমি সব ঠিকঠাক ব্যবস্থা করে দেব।

—মনার মা, তুমি ঠিক আমার মায়ের মতো। মাকে যেমন ভরসা করতাম, তোমাকেও তাই করি। আমার কপাল ভাল, মা গেছেন। তুমি তার জায়গায় এসেছ।

কিছুদিন আগে দেবেশবাবু একদিন বললেন—বুঝলে ভাগ্নে, আমি তোমার উপর নির্ভর করি। তোমাকে কাজের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হই। আমার দুই ছেলে। তারা কেউ আমার বাধ্য নয়। কথা শোনে না। দুজনকে আলাদা ব্যবসা করে দিয়েছি। দুটো আলাদা বাড়ি। ভবিষ্যতে গণ্ডগোল হবেই। ইতিহাস বলে, ভাই ভাইয়ের প্রধান শত্রু। তাই আগে থেকে এই ব্যবস্থা। আমি ঠিক করিনি উদাস?

—একেবারে ঠিক কাজ মামাবাবু। কথায় আছে, ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই। এই যে কাজটা আপনি করে দিলেন, তাতে দুজনের সম্পর্ক ভবিষ্যতে ভাল থাকবে।

—জানো উদাস, আমার দুঃখ, দুই বৌমার মধ্যে একজনও ভাল নয়। বড় বেশি ওরা আত্মকেন্দ্রিক। শুধুই নিজেদের স্বার্থ। গুছিয়ে নেওয়ার ধান্দা। শিক্ষিত মেয়ে দুজন। তবু মনের কোন উদারতা নেই। সেই লোভ, সেই হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, শ্বশুর শাশুড়িকে ডোণ্ট কেয়ার মনোভাব।

—মামাবাবু, আজকাল প্রায় সব বউই এ ধরনের। আপনি দুঃখ পাবেন না।

—বলছ উদাস। তবু দুঃখ হয়। কষ্ট পাই। তোমার মতন ছেলেকে দেখে মন ভরে যায়। তুমি আমার রক্ত সম্বন্ধের কেউ নও। আমার কনসার্নে কাজ কর মাত্র। আমি মালিক। তুমি কর্মচারি। তবু তুমি আমাকে কম ভালবাস, কম শ্রদ্ধা কর উদাস! আমি সব জানি।

—এটা আমার কর্তব্য মামাবাবু।

—কই আমার ছেলেরা এই কর্তব্য করে না! তাদের তো হৃদয়ের টান নেই আমার প্রতি। কেবলই বলে, আরও টাকা দাও। সবসময় আমার উপর চাপ সৃষ্টি করে শুধু টাকার জন্যে। এরা টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না। আমি হাঁফিয়ে উঠেছি উদাস। জীবন বড় বেশি ভার হয়ে উঠেছে। দুঃসহ তার বোঝা।

॥ ২৩ ॥

রাণী আবার একটা কাপড়ের দোকান খুলল। রাণী বস্ত্রালয়। কলেজ মোড় এবং পুলিশ লাইনের মাঝখানে কতকগুলো দোকানঘর হয়েছে সম্প্রতি, তারই একটা বড় ঘর নিল রাণী। মোটা টাকা সেলামী দিল। ফ্রক হাউসের পর দ্বিতীয় দোকান—রাণী বস্ত্রালয়। উদাস বলল—এত টাকা খরচা করে আবার একটা দোকান দিলি রাণী, চালাতে পারবি তো?

—কেন পারব না? ঠিক পারব। এখানে শাড়ি ধুতি প্যাণ্ট হাওয়াই শার্টের ছিট, বেডকভার, মশারি, বিছানাপত্র কত কি থাকবে। দেশে মানুষ বাড়ছে না? স্টাইল বাড়ছে না? বিয়ে বাড়ছে না? একদল লোক তো লুটপাট করে টাকা কামাচ্ছে। তাদের ভোগ্যপণ্য চাই। আমি তাদের ভোগ্যপণ্য সরবরাহ করব। ব্যবসা করতে

হলে তোমাকে ঝুঁকি নিতেই হবে। সাহস থাকা চাই। আমার সে সাহস আছে। মনের জোর আছে।

উদাস বলল—রাণী তোর তুলনা নেই। অনেক সংগ্রাম করে জীবনে দাঁড়িয়েছিস। কত দুঃখ কত কষ্ট পেয়েছিস। ভেঙে পড়িসনি। নিজের ফ্যামিলিকে দেখছিস, শ্বশুরবাড়িকে দেখছিস, কয়েকটি মেয়েকে কাজ দিয়ে তাদের অন্নসংস্থান করে দিয়েছিস। রাণী তোর কথা আমি অনেককে বলি। সবাইকে বলি। বলি, রাণীকে দেখ, তার সংগ্রাম দেখ, তার কাছে শেখার অনেক কিছু আছে।

—তুমি বড় বাড়িয়ে আমার কথা বল উদাসদা। আমি সেরকম কিছু নই।

—না রাণী, তুই বড়। বেশ বড়। তোর কাছে আমারও অনেক কিছু শেখার আছে। এবার বলল রাণী—উদাসদা, বুবুনের কথা কিছু ভেবেছ?

—কেন বুবুনের আবার কি হল? ও তো বেশ ভাল আছে। পড়াশোনা করছে, সমাজসেবা করছে, মিশনের কাজ করছে। কত লোকের সঙ্গে ওর চেনাজানা, কত খাতির, কত সুনাম। মানুষ ওকে ভালবাসে। আবার কি চাই!

—আহা হা, আমি সেকথা বলছি না। আমি বলছি, ওর ভবিষ্যতের কথা। ওর একটা কাজ দরকার, রোজগার দরকার। ওর বিয়ে দিতে হবে না? ঘরসংসার করে দিতে হবে না? ওকে ঘরসংসারের দায়িত্ব নিতে হবে। চিরকাল আমি বইব?

—একটা কাজ কর, রাণী বস্ত্রালয়ে ওকে বসিয়ে দে। তরুণ একা দোকান চালাতে পারবে না। বুবুন ওকে এ্যাসিস্ট করবে।

—সে গুড়ে বালি।

—মানে?

—মানে, বুবুনবাবু দোকানে বসবেন না। আমি বলেছিলাম, বললাম, তুই তরুণের সঙ্গে দোকান চালা। আমি তোকে মাইনে দেব। তা বাবু বলল, আমার দ্বারা দোকান হবে না। অত ডিউটি দিতে পারব না। আর কাউন্টারে বসে বসে টাকা গোণা? ওরে বাবা, অত কঠিন কাজে আমি নেই।

—বুবুন তো চিন্তায় ফেলে দিল। ঘরের ব্যবসা, ঘরের ছেলে দেখাশোনা করবে, তাতে দোষ কি? এটাই নিয়ম। কত ছেলে করছে।

—তা করছে। তবে তুমি তো জান, বুবুন আর দশটা ছেলের থেকে আলাদা।

—নিশ্চয় আলাদা।

—উদাসদা, আমি একটা কথা বলছিলাম।

—বল?

—বুবুনের প্রতি তোমার একটা কর্তব্য আছে। আছে না? যেমন আমার আছে, ঠিক তেমনটি তোমার।

—মানছি তোর কথা।

—তাহলে তুমি দেবেশ দত্তকে বলে ওঁর কনসার্নে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দাও। তোমার কথা আর যে ফেলে দিক, দেবেশবাবু ফেলবেন না, আমি নিশ্চিত জানি।

—বলছিস যখন, কথাটা পাড়তে হয় দেবেশবাবুর কাছে।

—ওখানে কাজ হলে, তোমার আণ্ডারে হবে, তোমার সাহচর্যে থাকবে বুবুন, তাতে ওর ভাল হবে। মঙ্গল হবে।

—ঠিক আছে। ব্যাপারটা দেখছি রাণী। অবস্থা বুঝে কথাটা পাড়ব ঠিক সময়।

—ব্যস, আমার আর কোন চিন্তা রইল না। রাণী চলে গেল তার পুরনো দোকানে। নতুন দোকানে বসে তরুণ। এই দুজনের মধ্যে ভাবভালবাসা খুব। রাণীকে দেবীর মতো ভক্তি করে তরুণ। কেন করবে না? এককালে না চলা একটা গুমটি দোকানের মালিক ছিল তরুণ, সেখান থেকে তাকে তুলে আনল রাণী। গুমটিতে তালা মেরে দিল। শেষপর্যন্ত একজনকে বিক্রি করে দিল। তরুণের অতীত ইতিহাস রাণী মুছে দিল। রাণী শেষে এক আধুনিক বস্ত্র বিপণিতে মালিক করে দিল তরুণকে। এতটা কি ভাবতে পেরেছিল তরুণ? এতটা কি আশা করেছিল! রাণীর সঙ্গে তার প্রেম ভালবাসা না হলে, বিয়ে না হলে, এতটা কি সে উঠতে পারত? সম্ভব ছিল?

সুজয় এবং জুঁই এল উদাসের বাড়িতে। দিন পাঁচ থাকল। সকালে তারা টিফিন খেয়ে বেড়িয়ে পড়ত। দুপুরের খাওয়া বাইরে। ফিরতে ওদের রাত্রি ৮টা অথবা ৯টা। তাদের আরামের জন্যে উদাসের পক্ষে যতটা করা সম্ভব, তা করেছে উদাস। তাদের রাত্রিকালীন আহারটা বেশ উচ্চমানের। জুঁই বলেছে—উঃ উদাসদা, আমাদের নিয়ে আপনি বড় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমরা কি দেবদূত নাকি?

—বাঃ, তোমরা আমাদের বাড়িতে প্রথম এলে, মা নেই, মা থাকলে কত আনন্দ পেতেন, তুমি দেবেশবাবুর মেয়ে, তোমাকে আদর যত্ন করব না? যদি না করি আমি ধর্মে পতিত হব।

—উদাসদা, মাঝেমাঝে আপনি এমন কথা বলেন, শুনলে আমার ভারী অবাক লাগে। বিচিত্র আপনার চিন্তা ভাবনা।

মনার মা কয়েকদিন থাকল উদাসের ঘরে রাত্রিতে। নানা পদ রান্না করল। তার রান্নার হাত ভাল। জুঁই বলল—আর কত খাব মাসি! খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। আর পারছি না। সুজয়ও তাই বলে। মনার মা বলে—খাও খাও, আর একটু খাও। ঠিক পারবে। এটা তো তোমাদের খাওয়ার বয়স। না খেলে চলে?

ওরা গাড়ি নিয়ে ঘুরল। সুজয় গাড়ি চালায়। তখন জানল উদাস, জুঁইও গাড়ি চালাতে পারে। সে শিখেছে। তাকে শিখিয়েছে সুজয়। তার ড্রাইভিং লাইসেন্সও

আছে। এসব তথ্য জানেন না দেবেশবাবু। মেয়ে গাড়ি চালানো শিখুক, এটা দেবেশবাবুর অপছন্দ। জুঁই ঠিক এ্যাক্সিডেন্ট করে বসবে। দেবেশবাবু বলেছেন উদাসকে।

ওরা ঘুরল। নলহাটী, তারাপীঠ, বক্রেশ্বর, ভাণ্ডীরবন, লাভপুরের ফুল্লরা, চৌহাট্টার শিবমন্দির, মশানজোড়, কংকালীতলা, শান্তিনিকেতন। শুধু ঘোরা আর ঘোরা। এতটুকু বিশ্রাম নেয়নি। ঘুরে ঘুরে শ্রান্ত। জুঁই বলল—ঘুরতে ঘুরতে কষ্ট পেয়েছি। তার থেকে বেশি পেয়েছি আনন্দ। অপুর মতো অচেনার আনন্দ। আবিষ্কারের আনন্দ। এ আনন্দের তুলনা নেই উদাসদা।

একদিন রাত্রে এল রাণী। উদাস জানত, রাণী আসবেই। জুঁইয়ের সঙ্গে আলাপ করল। জুঁই বলল—ও তুমিই রাণী!

—তুমি আমাকে চিনলে কি করে?

—উদাসদার মুখে তোমার চেহারার বর্ণনা শুনে। তুমি খুব লড়াকু মেয়ে। উদাসদা তোমার প্রশংসা করছিল। বারবার।

—উদাসদার কথা বাদ দাও, দুনিয়ার লোকের প্রশংসা করা ওর কাজ। শুধু নিজের কথা বলে না। তখন ও নীরব।

উদাস বলল—আমার যে নিজের কথা বলে কিছু নেই রাণী। আমি যে ঝরা পাতা! ঝরা পাতার কি গল্প হয়?

—এই শুরু হল! এবার শোন জুঁই, উন্মাদের আলাপন।

—জুঁই, আকাশে বাতাসে কত আনন্দের সুর। কিন্তু আমি কেন বিষণ্ণতার সুর শুনি? সর্বদাই শুনি। শুনি, মানুষ কাঁদছে। বিলাপ করছে।

—আপনার নাম যে উদাস, তাই মানুষের কান্না ছাড়া আপনি অন্য কিছু শুনতে পান না। কে এমন নাম রেখেছিল আপনার?

—আমার প্রাইভেট মাস্টারমশাই, জীবনবাবু। আমি নাকি ছোট থেকে বড় উদাস। কিছুতেই আমার মন নেই। স্কুলে ভর্তি করার সময় জীবনস্যার, আমার নামটা বদলে দিলেন। রাণী বলল—তা হলে তোমার আসল নাম কি?

—কৃষ্ণ। আমি কালো বলে এই নাম রেখেছিলেন।

—তাহলে রাণী, তুমি উদাসদার এমন বউ করে দাও, যার নাম রাধা। জুঁইয়ের কথা শুনে একচোট হেসে নিল রাণী। বলল—বেশ বলেছ জুঁই। রাধাকৃষ্ণ। যেদিন ওরা চলে গেল, ঘর ফাঁকা হয়ে গেল উদাসের। তার মন খারাপ করতে লাগল। শূন্যতার হাহাকার। এ ক'দিন নিয়মিত সে সাইট গেছে। শিল্পা ইঁট কোম্পানিতে। দেবেশবাবুকে একবারের জন্যে জুঁইয়ের কথা বলেনি। সে কথা দিয়েছে জুঁইকে, তার কথা কিছুতেই বলবে না। দেবেশবাবু জানতে পারলেন না কিছুই। কিন্তু ভবিষ্যতে

দেবেশবাবু যদি কোনদিন জেনে ফেলেন, সত্যি তো কোনদিন চাপা থাকে না, তখন কি হবে? কি বলবে উদাস তখন? ঠিক আছে, আগে থেকে অত ভেবে লাভ নেই, যখন যা হবে দেখা যাবে। কোনরকমে ম্যানেজ করা যাবে দেবেশবাবুকে। ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেই হবে। দেবেশবাবু কি ক্ষমা করবেন না?

যাবার সময় জুঁই বলল—আপনি আর একবার যাবেন আসানসোল। সামনে আমার একটা পরীক্ষা আছে, তারপর আমার ছুটি। আমি আসানসোলেই থাকব বেশির ভাগ।

—আচ্ছা, সে দেখা যাবে।

—দেখা যাবে বললে হবে না। আগে গেছিলেন। উদাসদা, বাবার নিমন্ত্রণে। এবার আমার।

গাড়িতে বিদায় প্রাক্কালে জুঁই প্রণাম করল উদাসকে। সুজয়ও। সুজয় বলল—বড় ভাল লাগল। বড় আনন্দে কাটল। কলকাতা গেলে যাবেন আমাদের বাড়ি। ওই কার্ডটা রাখুন।

—তুমি আবার এসো সুজয়। অবশ্য জুঁইকে নিয়ে।

সুজয় বলল—সুযোগ পেলেই। সে হাসল। ওরা চলে গেল। উদাস বলল মনে মনে—তোমরা এলে, চলে গেলে, রেখে গেলে এক বন্ধন। কত বন্ধনে নিজেকে জড়াব! আর কত বন্ধনে?

॥ ২৪ ॥

দেবেশ দত্তকে কথাটা বলতে কেমন বাধো বাধো ঠেকছিল উদাসের। কি জানি, কি মনে করবেন। হয়তো ভাববেন, উদাস স্নেহের সুযোগ নিচ্ছে। নিজের লোক ঢোকাতে চাইছে। কিন্তু কথাটা না বলেও তো উপায় নেই। এটা যে বুবুনের কেস! তার উপর রাণীর অনুরোধ! সেটা ফেলতে পারছে না উদাস। সে রাণীকে কথা দিয়েছে, কথাটা পাড়বে। কিন্তু কথা হচ্ছে, দেবেশ দত্ত যদি 'না' বলে দেন। তখন কি করবে উদাস? কি করে রাণীকে মুখ দেখাবে? কি কৈফিয়ৎ দেবে? রাণী বিশ্বাস করবে? বলবে না, না উদাসদা তুমি তেমন করে বলনি। জোর দাওনি। তা যদি দিতে, দেবেশ দত্ত কি না বলতে পারেন? তার কি তেমন শক্তি আছে?

শেষপর্যন্ত বলতেই হল দেবেশ দত্তকে। সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে, মনে জোর এনে, গলা পরিষ্কার করে, বলল উদাস—ইয়ে, মামাবাবু, একটা কথা বলছিলাম।

—বল।

—বলছিলাম কি, উদাস থেমে গেল।

—উদাস, একটা কথা বলবে, তার জন্যে এত ভাবছ কেন? তুমি অসঙ্কোচে বলতে পার। সাহস পেয়ে তখন উদাস বলল বুবুনের কথা। তার প্রয়োজনের কথা। ইচ্ছার কথা। চাহিদার কথা। বুবুনের সমাজসেবা, মানুষের প্রতি তার অকৃত্রিম ভালবাসার কথাও বলল উদাস।

—বুবুন সৎ তো?

—একশবার সৎ। ওরকম ছেলে আজকালকার দিনে পাবেন না।

—ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ, একদিন নিয়ে এস, কথাবার্তা বলি, তারপর দেখব কি করা যায়।

—মামাবাবু বুবুনকে আপনি চেনেন। তাকে দেখেছেন।

—কি করে?

—সেই যে কুন্তি বলে একটা মেয়ে আপনার কাছে এসেছিল, মিশনের জন্যে অর্থসাহায্য নিতে, সেই কুন্তির সঙ্গে একটা ইয়াং ছেলে এসেছিল, ওই হচ্ছে বুবুন। ওকে আবার আপনি দেখেছেন, রামকৃষ্ণ মিশনের ভূমিপূজার দিনে। মনে পড়ছে আপনার?

—ফর্সা মতো একটা ছেলে। বয়স বেশি নয়। শরীর স্বাস্থ্য ভাল। হাসিমুখ।

—ঠিক ধরেছেন। ওটাই বুবুন।

—আচ্ছা, তাহলে ওকে একদিন আসতে বল। তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস।

—ঠিক আনব।

দেবেশ দত্তের সঙ্গে কথাবার্তার রিপোর্ট করল উদাস রাণীর সমীপে। রাণী উৎফুল্ল হয়ে বলল—তাহলে তো হয়েই গেল। আমি ঠিক জানি, তুমি বললে তোমার কথা ফেলতে পারবেন না দেবেশবাবু।

—এখনই অতটা সিওর হোস না রাণী। আজকালকার দিনে শেষ কথা বলে কিছু নেই। যেকোন সময়ে যেকোন ঘটনা ঘটতে পারে।

—তা ঘটতে পারে। তবে এখানে তা ঘটবে না। তুমি আছ কি করতে? তুমি সামাল দেবে।

একদিন উদাস বুবুনকে নিয়ে গেল শিল্পা ব্রিকস কোম্পানিতে। অফিসঘরে বসে দেবেশবাবু অনেকক্ষণ কথা বললেন বুবুনের সঙ্গে। সামনে ছিল না তখন উদাস। থাকা উচিত নয়। মালিক প্রকৃতপক্ষে বুবুনের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন। সেখানে কেন থাকবে উদাস? উদাস তখন, পাশের ঘরে কম্পিউটার চালাচ্ছিল। একটা জটিল হিসাবনিকাশ করছিল। কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে, সে জটিল অঙ্ক সহজে মিলে গেল। সত্যি, এ এক আশ্চর্য যন্ত্র। অসাধ্য সাধন করে। একটা যন্ত্র তার সৃষ্টিকর্তাকে ছাপিয়ে গেছে। এ মানুষের বিস্ময়কর আবিষ্কার। উদাস অনুভব করে, মানুষ

ভবিষ্যতে আরও চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর যন্ত্র উদ্ভাবন করবে। মহাকাশে বাসস্থান স্থাপন করবে। পারবে না শুধু মৃত মানুষকে বাঁচাতে। মৃত্যু ব্যাপারটা ঈশ্বরের হাতে। সেখানে মানুষ বন্দী।

বুবুন এসে দেখা করল উদাসের সঙ্গে। পাশের ঘরে। উদাস বলল—সব কথা হয়ে গেল?

—হ্যাঁ উদাসদা। উনি বললেন, দিন সাত পরে তিনি মতামত জানাবেন। তোমাকে বলে দেবেন।

—ঠিক আছে বুবুন। উনি একটু চিন্তা ভাবনা করে নিন। এটা একটা চাকরির ব্যাপার। প্রাইভেট কোম্পানি। তারা তো দশদিক ভাববেই।

—জানো উদাসদা, উনি বললেন, যদি একটা ডেয়ারী ফার্ম খোলা যায়, তাহলে তার দায়িত্ব আমি নিতে পারব কিনা।

—তা তুই কি বললি?

—বললাম পারব। সব কাজ পারি। কোন কাজকে ভয় পাই না।

—উনি কি বললেন উত্তরে?

—খুশি হলেন। বললেন, ঠিক আছে, তোমার কেসটা ভেবে দেখছি। উদাস ভাবল মনে মনে, বুবুন ঠিক কথা বলেনি। বুবুন ব্যবসা করতে চায় না। সে রাণী বস্ত্রালয়ে বসেনি। তার দায়িত্ব নেয়নি। সুতরাং সে সব কাজ পারে, কথাটা ঠিক নয়।

—তাহলে উদাসদা, আমি এখন চলি।

—তুই আয়। আমার ফিরতে সন্ধ্যা হবে। তুই বাস স্টপেজে চলে যা। দশ মিনিট অন্তর বাস। কোন অসুবিধা নেই। তা হ্যাঁ রে, কিছু খেয়েছিস?

—খেয়েছি। দেবেশবাবু টিফিন খাইয়ে দিলেন। একসঙ্গে দুটো ডিম।

—ডিম তো তোর ফেবারিট।

—হট ফেভারিট। ডিম খেয়ে খেয়ে শরীরটা বাগিয়েছি। ডিম খুব উপকারী খাদ্য। উদাসদা তুমি প্রতিদিন দুটো করে ডিম খাও। তোমার এই পাতলা চেহারা সলিড হয়ে যাবে।

—আমার শরীর সলিডই বুবুন। আমার এনার্জি ভাল। আমার কোন ক্লান্তি নেই। অসুখ নেই।

—তা ঠিক। তোমাকে নীরোগ বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক রোগগ্রস্ত। লোকের হাতে পয়সা নেই। ভাল খাবার কিনতে পারে না। দুবেলা ভাত পাওয়াই কঠিন। রোগে ডাক্তার দেখাতে পারে না। নানা রোগ নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে চলে। এটাকে বাঁচা বলে না। মরে বেঁচে থাকা আর কি!

বুবুন চলে গেল বাস ধরতে।

॥২৫॥

দিন চলে যাচ্ছে। ঠিক যেমনটি যায়। দিন হয়। রাত্রি আসে। আবার প্রভাত হয়। একই খেলা মহাকালের। এর কোন বিরাম বা বিচ্ছেদ নেই। উদাস ভাবে, মায়ের মৃত্যু ৯ মাস হয়ে গেল। বর্ষপূর্তি হতে আর তিন মাস বাকি। তাও হবে একদিন। মায়ের কথা মনে পড়ে যখন তখন। উদাস বুকে একটা কষ্ট অনুভব করে। উদাস বলে আপন মনে।

—মা, তুমি এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে, আমি বুঝতে পারিনি। মৃত্যু যে কখন কার আসে! এর কোন বয়স নেই, দিনক্ষণ নেই। সময় হলে আশ্চর্যজনকভাবে সে উপস্থিত। তার কোলে আত্মসমর্পণ করতে হয়। এখন আমার অনেক কাজ, এখন আমি যেতে পারব না, এসব বলে কোন লাভ নেই। সে এসে ঠিক জীবনদীপটি নিভিয়ে দেবে। মা, তোমার সাধ ছিল, ইচ্ছে ছিল, আমার বউ আনবে ঘরে। সে তার অমলিন সৌন্দর্য নিয়ে ঘুরে বেড়াবে সংসারে। তুমি তাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। সে হবে তোমার সাথী। মা, তোমার এই সাধ পূর্ণ হল না। আমার বিয়ে হবে ঠিকই, কিন্তু তুমি দেখে যেতে পারলে না। এ আমার চরম আপশোষ!

মনার মা ঠিক ঠিক আসছে। রান্না-বান্না করছে। উদাসকে যথাসাধ্য আদরযত্ন করে। মায়ের অভাব বুঝতে দেয় না। রাণী একদিন বলল—এবার তোমার বিয়ের উদ্যোগ নেব। তিনমাস পর মাসিমার মৃত্যুর বর্ষ পূর্ণ হবে। কালাশৌচ শেষ হবে। সব দোষ কেটে যাবে।

—তুই এসব বিশ্বাস করিস রাণী?

—করি আবার করি না।

—না রাণী, এসব মানার কোন মানে নেই। যুক্তি নেই। এসব ভুল সংস্কার। এগুলো ত্যাগ করা দরকার। নাহলে দেশ সমাজ এগোবে কি করে?

—তোমার পাত্রী রেডি করে রেখেছি। একবার তুমি দেখে নেবে। পছন্দ হলে, হবেই পছন্দ আমি নিশ্চিত, আর দেরি করব না। সামনে যে বিয়ের দিনটা পাব, লাগিয়ে দেব। তা হ্যাঁ উদাসদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার পয়সার লোভ-টোভ নেই তো? আজকাল পাত্র যেমন হোক, পয়সার লোভ খুব। বউয়ের চেয়ে পয়সা বড়। শোন, মেয়ের বাবার আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। এককালে ছিল। এখন নেই। চিরদিন কারো সমান যায় না। যায় কি?

—তোর দার্শনিক কথা থাক।

—ওটা বুঝি তোমার একচেটিয়া?

—আজ পর্যন্ত তুই বললি না, তোর ঠিক করে রাখা পাত্রীটি কে? দেখতে কেমন, পড়াশোনা কত দূর, ফ্যামিলি কেমন, তারা থাকে কোথায়, কিছুই তো বলছিস না। গোয়েন্দা গল্পের মতো কেবল রহস্যে মুড়ে রাখছিস। গল্পটা টানছিস।

—আরে বলব বলব, না বললে তুমি বুঝবে কি করে? আচ্ছা তুমি বল, কবে পাত্রী দেখতে যাবে।

—যেকোন রবিবার। রবিবারই আমার একমাত্র সময়। কোথায় যেতে হবে বল?

—বেশিদূর নয়। এই উখরা।

—কলিয়ারীর দেশ উখরা? এত কাছে?

—যত কাছে, তত দূর উদাসদা। কথাটা মনে রেখো।

—তা রাখব। বাদবাকিটা বল। পাত্রীর নাম?

—বন্দনা। পাত্রী তরুণের এক দূর সম্পর্কের কাকার মেয়ে। একবার আমি, তরুণের সঙ্গে বিয়ের পর উখরা গেছিলাম কাকাশ্বশুরের বাড়ি। কাকার নাম ভবেশ দাস। তখন প্রথম আমি বন্দনাকে দেখি। বেশ মেয়ে। পছন্দসই মেয়ে। বন্দনা বড়। ভাই ছোট। তা কাকা আমাকে বললেন, একটা পাত্র দেখে দিতে। বন্দনার চেহারা ভাল, কিন্তু কাকার কড়ি নেই, তাই বিয়ে হচ্ছে না। পাত্রপক্ষ আসছে, বন্দনাকে দেখছে, পছন্দ করছে, তারপর টাকা পয়সাতে আটকে যাচ্ছে। বিনামূল্যে কে বিয়ে করবে বল? কোন মামু? একমাত্র করতে পার তুমি। তোমার কথা বলেছি। তা ভবেশ কাকা আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, বন্দনাকে পার করে দাও রাণী। বন্দনা আমার গলার কাঁটা। ওর কথা ভেবে আমার ঘুম হয় না। ভেবে ভেবে শরীর মন আমার ভেঙে গেল। তোমার কাকিমা কাঁদে। দিনরাত কাঁদে। বন্দনারও বয়স হয়ে গেল। পঁচিশ চলছে। যতদিন যাবে বয়স বাড়বে, তার সঙ্গে চেহারার বাহার কমে যাবে। বন্দনাকে নিয়ে আমার বড় দুঃখ। বড় কষ্ট মা। তুমি আমাকে উদ্ধার কর রাণী। চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

—ঠিক আছে। দেখছি কাকাবাবু।

—তবে আমি টাকাপয়সা দিতে পারব না। পারব না মানে আমার সামর্থ নেই। গরিব হয়ে গেছি। তুমি তো জানো রাণী, গরিব হওয়ার মতো দুঃখ পৃথিবীতে আর কিছু নেই।

—আমি সব জানি কাকাবাবু। আমার অভিজ্ঞতা আছে। উদাসদা পয়সা নেবে না। ওর একটা বউ দরকার শুধু। তা বন্দনা ভাল বউ হবে আশা করছি।

—কি নাম বললে, উদাস, তা বেশ নাম। পাত্র না দেখেই আমার পছন্দ। আমি উদাসকেই জামাই করব। রাণী হাসল। বলল—শুধু আপনার কেন, সারা পৃথিবীর লোক উদাসদাকে পছন্দ করে। না পছন্দ করে তাদের যে উপায় নেই। উদাসদা

আমার দাদা। নিজের দাদা না হলেও দাদার থেকে বেশি। উদাসদার জন্যে আমি গর্বিত। তার কথা বলতে গেলে, কথা শেষ হবে না। শুধুই বাড়বে।

উদাস বলল—ওঃ আমার সম্বন্ধে ভবেশবাবুকে এত কথা বললি? আমাকে গাছের মগডালে তুলে দিলি! এখন আমি নামব কি করে? এত কথা বলার কি দরকার ছিল রাণী?

—বেশ করেছি বলেছি। যাকে ভালবাসি, তার কথা বলে আমি আনন্দ পাই। এরপর উদাস কি বলবে? সে চুপ করে থাকে।

তা একদিন, এক রবিবার, ৯টা ৪০ মিনিটের ট্রেন ধরে উদাস গেল উখরা। সঙ্গে রাণী। তার গাইড। সে বকতে বকতে চলল। উদাস একবার বলল—তরুণটাকে সঙ্গে নিলে হত।

—কিছু দরকার নেই। ও কথা বলতে পারে আমার মতো? খুব মুখচোরা। আমাকে ভালবাসে এটা বলতে ওর দীর্ঘদিন লেগেছিল। ভালবাসার কথা বলতে যে যত দেরি করবে, তত তার কষ্ট বাড়বে। বাড়বে না?

—তবে যাই বলিস রাণী, ও তোকে খুব ভালবাসে।

—জানি। ওর ভালবাসাই আমার শক্তি। আমার আনন্দ।

ট্রেন চলেছে ঝমঝমিয়ে। লোকাল ট্রেন। গতির থেকে শব্দ বেশি। বেশির ভাগ যাত্রী অপরিষ্কার। গরিব। পোশাক-আশাক সুচারু নয়। লেবার ক্লাসের মানুষ। নিম্ন আয়ের মানুষ। এদের মধ্যে কয়লা চোরাকারবারীরা আছে। ওরা কয়লা চুরি করতে যায় পাণ্ডবেশ্বর উখরা কাজোরা সিধুলি অণ্ডাল। এটা ওদের পেশা। জীবিকা। এই পেশায় ঝুঁকি আছে। পাবলিকের বিরক্তি আছে। পুলিশের মার আছে। ঘুষ আছে। নিজেদের মধ্যে মারামারি অশান্তি আছে। তবু এ বৃত্তি ওরা ত্যাগ করতে পারে না। মুলে সেই পেটের আগুন। সর্বগ্রাসী ক্ষুধা।

ট্রেনের জানলার ধারে বসেছে উদাস। জানালার ধার তার বড় প্রিয়। বাইরের পৃথিবী দেখতে দেখতে যাওয়া। বাতাস খেতে খেতে যাওয়া। কত কি দেখে উদাস। মাঠ ঘাট পুকুর মানুষজন গরু ছাগল। বৃষ্টি দেখে। রোদ দেখে। সব অন্যরকম মনে হয়। একবার সে জ্যোৎস্না রাত্রে ফিরছিল ট্রেনে। জ্যোৎস্নার মধুর আলোয় বন্যার মতো ভেসে যাচ্ছে সবকিছু। উদাসের মনে হল, সবকিছু তার চেনা, তবু যেন অচেনা। এক স্বর্গীয় সুষমা যেন প্লাবিত হয়ে গেছে বিশ্বময়।

হু হু করে বাতাস ঢুকছে জানলা দিয়ে। উদাসের মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিচ্ছে। তার মাথাভরা চুল। বাতাসের ধাক্কায় তার চোখ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বারবার। রাণী সামনে বসে। বন্দনাকে দেখতে যাচ্ছে উদাস। তার কথা মনে হচ্ছে।

—বন্দনার লেখাপড়া কতদূর রাণী?

—ভাল নয়। আমার মতো হাল। আমি সেভেনে ফেল করে ঘরে ঢুকেছি। বন্দনা তিনবার মাধ্যমিক দিয়েছিল, ওপার ছুঁতে পারেনি। অঙ্ক ইতিহাস আর ইংরেজি ওর যম। অতএব শিক্ষাজগৎ থেকে বিদায়। বলতে পার, রিটায়ার করেছে বন্দনা।

বন্দনার শিক্ষাগত যোগ্যতা শুনে বিমর্ষ হয়ে গেল উদাস। তার ইচ্ছে, অন্তঃত এইচ এস অথবা মাধ্যমিক পাশ কোন মেয়ে বধূ হোক তার ঘরে। সে অনার্স ইতিহাসে। একটু পাশ করা মেয়ে না হলে তার চলে কি করে? বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষা একান্ত দরকার। সংসারের প্রধান স্তম্ভ মেয়েরা। তারা শিক্ষিত না হলে দেশ এগোবে কি করে? সন্তানরা মানুষ হবে কি করে? শিশুদের প্রথম পাঠ তার মা। তার বর্ণপরিচয়। সেখানে যদি ঘাটতি থাকে, খামতি থাকে, অন্ধকার থাকে, তার ছেলেমেয়ের ভবিষ্যৎ ভাল হবার কথা নয়।

—কি উদাসদা, চুপচাপ কেন? নীরব কেন? ও বন্দনা বেশি লেখাপড়া শেখেনি বলে, তোমার খারাপ লাগছে? ডিগ্রি না থাকলে হবে কি, বন্দনা খুব সংসারী। গরিব ঘরের মেয়ে তো। খুব হুঁশিয়ার। পরিশ্রমী মেয়ে। ঘরের সব কাজ করতে পারে। এই ধর বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, রান্নাবান্না করা, কিছুতেই পিছপা নয়। বাজার হাট ভাল করতে পারে। হিসেব নিকেশে তুখোড়। তুমি তো বউকে চাকরি করাবে না। করাবে কি?

—না। তার দরকার হবে না। আমি যা রোজগার করি, সেটাই যথেস্ট। বেশি টাকা নিয়ে কি হবে বল? টাকা যেমন শান্তির কারণ, আবার অশান্তির প্রধান কারণ হয়ে ওঠে। টাকার সঙ্গো উৎপাত আসে। বড়লোকদের অনেক গোপন শত্রু থাকে। বহু বড়লোক ভয়ে ভয়ে দিন কাটায়। গুন্ডা পোষে। সঙ্গো রিভলভার রাখে। নানা অন্যায় করে বলে রাত্রে ঘুম হয় না। ট্যাবলেট খেয়ে কেনা ঘুম কিনে রাত্রি কাটায়। আমি এর কোনটাই চাই না রাণী। মুক্ত জীবন চাই। খাটব, রোজগার করব, সংসার চালাব, দশজনের সঙ্গো মেলামেশা করব, তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গী হব, সবাইকে ভালবাসব, এর বেশি কোন স্বপ্ন নেই, কোন সাধ নেই।

এক একটা স্টেশন আসছে। ট্রেন দাঁড়াচ্ছে, লোক নামছে, উঠছে, ট্রেনের বাঁশি বাজছে, আবার যাত্রা শুরু। এ যাত্রার কোন যেন শেষ নেই। পাণ্ডবেশ্বর এসে গেল। শুরু হল কয়লাকুঠির দেশ। ট্রেন থেকে কলিয়ারীর চানক দেখা যাচ্ছে। কাছে দূরে কলিয়ারী। এমন কলিয়ারী ছড়িয়ে আছে রানিগঞ্জ, তার থেকে ধানবাদ পর্যন্ত। কয়লা না থাকলে সংসারের উনুন জ্বলবে না। যত কয়লা একটা দেশের, ততো তার সমৃদ্ধি। আর যদি পেট্রোল থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। দেশের লোককে সোনা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যায়।

এরপর উখরা স্টেশন। তাও একসময় এসে গেল, এগিয়ে গেল রাণী দরজার দিকে, তার পিছনে উদাস। কাঁধে ব্যাগ। তারা ট্রেন থেকে নেমে পড়ল। তারপর স্টেশনের গেট দিয়ে বাইরে। হাতের টিকিট হাতেই রইল। ট্রেনে কেউ দেখতে চাইল না। স্টেশনেও না। তাহলে লোকে টিকিট কাটবে কেন? সবাই তো ফাঁকি দিয়ে কাজ সারতে চায়। তা রেল কোম্পানির ব্যবসাটা ভালই বটে!

সামনের রাস্তা দিয়ে এক একটা রিক্সা যাচ্ছে। আর চলে যাচ্ছে হড়হড়িয়ে ট্রাক। ডাম্পার। ওরা কয়লা বহন করে। রাণী হাত ইশারা করে একটা রিক্সা ডেকে নিল। তারপর রাণী উদাস সেটাতে চড়ে বসল। রাণী বলল—চল সিনেমা হল। বোঝা যায়, এ এলাকাটা রাণীর পরিচিত। মিনিট ১৫ পর সিনেমা হল এসে গেল। রাণী রিক্সা ভাড়া দিয়ে দিল। চলে গেল রিক্সাওয়ালা। রাণী বলল—চল উদাসদা, এসে গেছি প্রায়। তারপর রাণী, এগলি ওগলি করে এগিয়ে চলল। তার পিছনে উদাস চারপাশ দেখতে দেখতে। একটা জীর্ণপ্রায় ভগ্নদশা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রাণী শিকল বাজাল ঝনঝন করে। খবর আগেই লোকমারফৎ পাঠিয়েছিল রাণী। দরজা খুলে গেল। সামনে দাঁড়াল এক বয়স্ক লোক। লুঙ্গি পরিহিত। খোঁচা খোঁচা সাদা দাড়ি মুখমণ্ডলে। সম্ভবত বন্দনার বাবা। তিনি বললেন—এস এস রাণী, আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। এস বাবা উদাস। আমি গরিব লোক। তোমাদের ঠিকঠাক খাতির যত্ন করতে পারি, এমন অবস্থা আমার নয়। রাণী হাত তুলে বলল—কাকাবাবু এসব কোন কথা বলার দরকার নেই। আমি উদাসদাকে সব বলেছি। জেনে বুঝে উদাসদা বন্দনাকে দেখতে এসেছে। আপনার কোন সংকোচের কারণ নেই।

—দেখ যদি বন্দনাকে পছন্দ হয়। যদি বিয়েটা হয়। রাণী বৌমা, তুমি একমাত্র আমাদের ভরসা।

—আহা হা কাকাবাবু, যদি হবার হয় বিয়ে ঠিক হবে জানবেন। কেউ আটকাতে পারবে না। আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না, আগেই বলেছি।

একটা ঘরে উদাস এবং রাণী বসল। একটা তক্তপোষে মাদুর পাতা। সেখানেই বসতে হল। একটু পর এক মহিলা এলেন। রাণী প্রণাম করল। উদাস রাণীকে অনুসরণ করল। মহিলা বললেন—থাক থাক বাবা। বেঁচে থাক। দেখে মনে হয়, জীবনের অনেকখানি রাস্তা প্রবল দুঃখের মধ্যে হেঁটে এসেছেন। এখনও তাঁর হাঁটা শেষ হয়নি। ভবেশবাবু বললেন—আমার অবস্থাটা খারাপ ছিল না। মোটামুটি কাপড়ের ব্যবসাটা চলত। পর পর কয়েকটা কলিয়ারী বন্ধ হয়ে গেল আশপাশের। আর খুলল না। লোকেরা সব পালিয়ে গেল। এখানে ওখানে ছিটকে গেল। তারা নাই মানে, আমার খদ্দেরও নাই। খদ্দের লক্ষ্মী। দোকান অচল হয়ে গেল। আর এ বয়সে

করবটাই বা কি? কি ব্যবসা করব! সারা দেশে মন্দা ভাব চলছে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক। যা বন্ধ হচ্ছে, তা আর খুলছে না। কত কত লোক বেকার হয়ে গেল। এসব ভাবলে আমার মন খারাপ হয়ে যায়। আমার আর একটাই দায়। বন্দনার বিয়ে। সেটা হয়ে গেলে হাত পা ঝাড়া। নিশ্চিত হয়ে মরতে পারি।

এরই মধ্যে চা জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে। উদাস গুছিয়ে বসল। এখন সে পাজামা পাঞ্জাবী তেমন একটা পরে না। তার পছন্দের পোশাক বিদায়ের পথে। এখন সে প্যাণ্ট এবং হাওয়াই সার্ট পরে। পায়ে জুতো। এ পোশাকে তাকে ভালই দেখায়। সে বেশ লম্বা।

রাণী বলল—আপনার ছেলেকে দেখছি না?

—ও শক্তিমান! ও একটু অণ্ডাল গেছে। একটা কাজের সন্ধানে। এখনও পায়নি। তবে হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। মাঝখানে একজন আছে, সে বলেছে, ব্যবস্থা হয়ে যাবে। সেই আশাতে আছি।

—আপনার ছেলের শরীর বেশ মজবুত।

—শক্তিমানের শরীর স্বাস্থ্য ছোট থেকেই ভাল। এখনও ব্যায়াম করে। খেতেও পারে খুব। হজমশক্তিও ভাল। তোমাদের সঙ্গে আজ আর দেখা হবে না। ফিরতে ফিরতে ময়ূরাক্ষী ট্রেন। রাত্রি হবে।

বেলা একটা দেড়টা হয়ে গেল। বন্দনার মা বললেন—এবার তোমাদের খেতে দিই। বেলা হয়ে গেল।

রাণী বলল—হ্যাঁ দিন কাকিমা। তাহলে এখানেই দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে রাণী! তা ভাল। উদাসের খিদে পেয়ে গেছে। সে সাড়ে ১১টার মধ্যে খেতে অভ্যস্ত। অবশ্য টিফিন খেয়েছে। আয়োজন মোটামুটি। তবে খারাপ নয়। ভাতের সঙ্গে ঘি। দুটি তরকারি। ডাল মুগের। মাছের ঝোল। চাটনি। দই। মনে হয়, এই আয়োজনটাও বড় কষ্টের ভবেশবাবুর পক্ষে। উদাস ভাবল, যদি তার পছন্দ হয় বন্দনাকে, এখানেই সে বিয়ে করবে। একটা গরিব ফ্যামিলির উপকার করবে।

তারাও গরিব ছিল এককালে। বাবার দোকান চলত না। মা একটা গরু পুষে, তার দুধ বিক্রি করে, ঘুঁটে বিক্রি করে, পরবর্তীতে সুপারি কেটে , ঠোঙা তৈরি করে, সেলাই করে, কত কষ্ট এবং দুঃখে সংসার চালিয়েছেন। ভাত ডাল আর একটা তরকারি মাত্র। মাছ নেই। ডিম নেই। মাংস নেই। দিনের পর দিন একধরনের খাওয়া, উদাসকে খেতে দিয়ে মা চোখ মুছতেন। কেন মুছতেন মা চোখ, তা কি জানে না উদাস?

—মা কেঁদ না। একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। চিরকাল কারুর একরকম থাকে? চোখ মোছ মা। শান্ত হও। এত দুঃখ কেন কর মা!

সেসব দিনের কথা কি ভুলে গেছে উদাস? এখন চাকরি করছে সে। বেসরকারি। হাতে পয়সা এসেছে। এখন আর অভাব নেই। তার নিষ্ঠুর চাবুক নেই। তার যন্ত্রণা নেই। এখন উদাস মাটির বাড়ি ভেঙে, দালান গড়ার স্বপ্ন দেখে। একটা টু হুইলার কেনার ইচ্ছে রাখে। না, পুরনো দিনের একটা কথাও সে ভোলেনি। একটা দৃশ্যও না। বুকে সেগুলো দগদগে ঘা হয়ে আছে গোপনে। আবরণ খুললেই তারা বেরিয়ে আসবে। নগ্ন হবে।

বেলা আড়াইটে নাগাদ বন্দনাকে দেখল উদাস। সময়টা জ্যোতিষীর দেওয়া। এটাও রাণীর ব্যবস্থা। এইসময়ে শুভ কর্ম বিধেয়। কার্যসিদ্ধি। বন্দনা নমস্কার করল এসে। তারপর সামনে রাখা একটা টুলের ওপর বসল। চোখ মাটিতে নিবদ্ধ। রাণী বলল—আরে বন্দনা, সহজ হয়ে যাও। উদাসদা আমার দাদা। ওকে আমিই ভয় করি না। ওকে কেউ ভয় করে না। তুমি করছ কেন? এবার সহজ হয়ে গেল বন্দনা। হাসল একবার। সাজানো দাঁত এবং হাসিটা মধুর। উদাস মাঝে মাঝে বন্দনাকে দেখছে। যত দেখছে ভাল লাগছে। না, রাণীর কথাই ঠিক। বন্দনা চমৎকার মেয়ে। বউ করার উপযুক্ত। তবু একটাই খারাপ। পড়াশোনায় ভাল নয়। কোন ডিগ্রি নেই। রাণী বলেছে—সবার দ্বারা সবকিছু হয় উদাসদা? এই ধর, আমি ফ্রকের ভাল ডিজাইন করি। করি তো? সুন্দর সুন্দর ফ্রক বানাই। কিন্তু আমি লেখাপড়ায় লবডঙ্কা। ক্লাস সেভেন। তিনবার পতন। কিন্তু জীবনে তো দাঁড়িয়েছি। পয়সা করেছি। অনেক পয়সা। যেকোন চাকুরের থেকে আমার রোজগার ভাল। কয়েকটা মেয়েকে কাজ দিয়েছি। আমার পয়সায় তাদের সংসার চলছে। শ্বশুরবাড়ি, বাপেরবাড়ি দুটোকেই দেখছি। তরুণকে স্বাবলম্বী করার চেষ্টা করছি। সে ঠিক দাঁড়িয়ে যাবে। তুমি দেখে নিও উদাসদা। গাঢ়স্বরে বলল উদাস—তোর মতো মেয়ে সংসারে ক'টা হয় রাণী?

—বলছ যখন মেনে নিচ্ছি। তোমার কথার মূল্য আমার কাছে অসীম। দৈববাণী বলতে পার।

বন্দনা অনেকক্ষণ বসে আছে। তাকে দেখতে ভালই লাগছে উদাসের। বেশ সুন্দর মেয়েটা। এর মধ্যে জানা হয়ে গেছে, বলেছে বন্দনার মা, বন্দনা ঘরসংসারের সব কাজ পারে। রান্না জানে। বাসন মাজে। কাপড় আছড়ে কাচতে পারে। তার উচ্চতা পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চি। রং ফর্সা না হলেও তার কাছাকাছি। মাথায় ভাল চুল। কিছুটা কুঞ্চিত। হাসলে দুগালে টোল পড়ে। উদাসের পছন্দ। নিশ্চয় পছন্দ। সে বলল—বন্দনা এবার যাও। তোমার ছুটি। আমাদের যাবার সময় একটু চা খাইয়ে দিও।

বন্দনা মুখে হাসির আভাস দিয়ে ভিতরে চলে গেল। এবার কথা বললেন ভবেশবাবু— তা উদাস, বন্দনাকে তো দেখলে, এবার মতামত বল। তোমার পছন্দ তো?

—রাণী আগেই সবকিছু বলেছে আমাকে। হ্যাঁ আমার পছন্দ বন্দনাকে।

—একথা তো বলে সবাই। বলে, ভবেশবাবু আপনার মেয়ে বেশ। পছন্দ আমাদের। এবার আসল কথায় আসি, বলি, কি দিতে থুতে পারবেন? টাকা কি রকম দেবেন, জিনিসপত্র কেমন দেবেন, বলুন সব। আমাদের এই চাই, সেই চাই বলে লম্বা ফিরিস্তি। তারা যা চায়, তার দশভাগের একভাগও দেবার সামর্থ আমার নেই। বিয়ে ভেঙে যায়। আমি কোথা থেকে দেব বল? আমার আয়-চায় আছে? যখন কুড়ি বছর বয়স বন্দনার, তখন থেকে পাত্র দেখা চলছে। এখন পঁচিশ। এই পাঁচবছরে কিছুই হল না। মেয়ে দেখতে ভাল বলে কেউ কিছু ছাড় দেয় না। কাকুতি মিনতি করেছি। লাভ হয়নি। কোথায় পাব খাট আলমারি ফ্রিজ, ড্রেসিং টেবিল? কোথায় পাব নগদ টাকা? বলে পেটের ভাত জুটছে না, তা কেউ দেখবে না। সবকিছু তো শুনলে, এবার বল তোমার দাবী, কি দিতে হবে তোমাকে? উদাস বলল—কোন দাবী নেই। দাবী একটাই। আপনার মেয়ে আমাদের বাড়ির বউ হবে। টাকাপয়সা জিনিসপত্র কিছুই লাগবে না। হাঁ হয়ে গেলেন ভবেশবাবু। বললেন—বলছ কি? টাকাপয়সা, আলমারি, ড্রেসিং টেবিল, গয়নাগাটি কিছু লাগবে না। নগদ—

বাধা দিল উদাস। বলল—এর কোনটাই চাই না। আমি কিছু কিনেছি। বাকিটা কিনে নেব। আপনি শুধু মেয়েকে দুটো শাড়ি দেবেন। আর অন্য কিছু নয়। কিছু না। হঠাৎ ভবেশ দাস উঠে উদাসের হাত ধরলেন। কেঁদে ফেললেন। বললেন—একথা কেউ আজকালকার দিনে বলতে পারে, এই প্রথম শুনলাম। বিশ্বাস করতে পারছি না বাবা। সব আমার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। আমি কি বেঁচে আছি? আমি কি ঠিক শুনছি?

রাণী বলল—সব ঠিকঠাক শুনছেন। উদাসদা এইরকম। সে মানুষের কষ্ট বোঝে, তার দুঃখ বোঝে।

চারটের সময় চা খেল রাণী এবং উদাস। চা ভালই করে বন্দনা। তা বলতে হবে। এখন সে বেশ সহজ। বেশ কথা বলতে লাগল উদাসের সঙ্গে। ফেরার সময় বন্দনা উদাসকে প্রণাম করল। উদাস বলল—আবার প্রণাম কেন? বন্দনার মা বললেন—তোমাকে প্রণাম না করলে ও কাকে করবে বাবা? এই প্রণামের যোগ্য কে আছে সংসারে?

ট্রেনে ফিরছিল উদাস, রাণীর সঙ্গে। তার মনটা ফুরফুরে। অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। ভাল লাগছে নিজেকে। বন্দনা তার প্রথম পাত্রী দর্শন। প্রথমেই পছন্দ এবং

বিবাহ হতে চলেছে। তাকে পাত্রী পছন্দের জন্যে দৌড়াদৌড়ি করতে হল না। হাজার পাত্রীর মধ্যে একটি পাত্রীকে পছন্দ করা সহজ কাজ নয়। ভাল পাত্রী পাওয়া কি সহজ কথা? একটি ভাল পাত্র পাওয়া যেমন কঠিন, একটি ভাল পাত্রী পাওয়া একই কঠিন। মনের মতো পাত্রী। রাণীকে ধন্যবাদ। তার জন্যে সবকিছু।

আবার উদাস জানলার ধারে। তার প্রিয় স্থান। হাওয়া ঢুকছে ট্রেনে। প্রচণ্ড হাওয়া। উদাস বলল মনে মনে—মা, মাগো, তোমার ঘরে বৌমা আসছে। তুমি চেয়েছিলে, বৌমা তোমার সুন্দর হোক। তাই হয়েছে মা। তুমি দেখতে পেলে না, সারাজীবন এই দুঃখ আমার থেকে যাবে।

রাণী বলল—উদাসদা, কি এত ভাবছ?

—কিছু না রাণী। কিছু না।

—বন্দনার কথা ভাবছ? তোমার বউয়ের কথা। তা বেশ, ভাব ভাব। বন্দনাকে যত ভাববে, তত ভাল লাগবে।

॥২৬॥

তা বুবুনের একটা ব্যবস্থা হল। দেবেশবাবু তার কনসার্নে যোগ দিতে বললেন বুবুনকে। তাকে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিলেন। একবছর সে টেম্পোরারি কাজ করবে। এই পিরিয়ডে তার মাইনে কম। তারপর পুরোপুরি স্টাফ হয়ে গেলে, একবছর পর, তখন মাইনে বাড়বে অনেকটাই। রাণী বলল—তুমি আমাকে নিশ্চিন্ত করলে উদাসদা। বলতে গেলে তুমিই চাকরিটা করে দিলে।

—মোটেই না। আমার সাধ্য কি? চাকরি দিয়েছেন দেবেশবাবু। প্রশংসা করতে হলে তাঁর কর।

—তোমরা দুজনেই প্রশংসার যোগ্য। তোমার অনুরোধ দেবেশবাবু ফেলবেন না, এটা আমি জানতাম। আমার ধারণা ভুল ছিল না।

—তুইও আমার ধন্যবাদের পাত্রী রাণী।

—কি কারণে?

—তুই আমার বিয়ে বন্দনার সঙ্গে ঠিক করে দিলি। যেমন বউ আমার কল্পনায় ছিল, ঠিক তেমনটি বন্দনা।

—তোমার হয়ে গেল উদাসদা! এখন থেকেই বন্দনা বন্দনা। বিয়ে হলে তুমি আমাদের পাত্তা দেবে না মনে হচ্ছে। তুমি ঠিক স্ত্রৈণ হবে।

—তোদের পাত্তা দেব না, তাই কি হয়! তোরা আমার আপনজন। তোকে বুবুনকে তরুণকে আমি ফেলতে পারি? তোরা পাশে না থাকলে আজকের উদাস মণ্ডল হতে পারতাম?

—কি জানি বাবা। আগে বিয়েটা হোক। তারপর বোঝা যাবে। একটা অবিবাহিত আর একটা বিবাহিত পুরুষের মধ্যে ব্যবধান আকাশ-পাতাল। তোমার অবস্থা কি দাঁড়াবে কে জানে?

বিয়ে হয়ে গেল বন্দনা উদাসের। বৈশাখ মাস। নিদারুণ দাবদাহ। আকাশ থেকে গরম লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। জলকষ্ট। শহরে জলের আকাল। এ তো প্রতি বছরের চিত্র। ব্যতিক্রম কিছু নেই। সয়ে গেছে। শহরের অর্ধেক লোব পানীয় জল পায়। অর্ধেক বঞ্চিত। এ বঞ্চনা শেষ হবে কবে? এর সঙ্গে যোগ হয়েছে লোডশেডিং। ফলাফল একই। জীবন আরও দুঃসহ, ভয়াবহ, যন্ত্রণাময়। এমনি করে বাঁচে মানুষ। তাকে বাঁচতে হয়। বন্দনার বাবাকে বলতে গেলে, একটা টাকাও খরচা করতে হল না। তাঁর খরচ-খরচার জন্যে উদাস বেশ কয়েক হাজার টাকা রাণীর হাতে দিয়ে পাঠিয়ে দিল উখরা।

সে টাকা হাতে পেয়ে ভবেশবাবু বললেন—রাণী, এমন ঘটনা ঘটে সংসারে? সংসারকে আমার বিষ লাগত, আরও লাগত তার মানুষকে, একেবারে সহ্য করতে পারি না। কিন্তু এ কি দেখছি, একটা মানুষ বিয়েতে বরপণ নিচ্ছে না, জিনিসপত্র নিচ্ছে না, উল্টে শ্বশুরমশাইয়ের কষ্ট হবে ভেবে টাকা দিচ্ছে, এত সৌভাগ্য আমি কোথায় রাখব রাণী! এত আনন্দ রাখব সে পাত্র কই?

রাণী অহংকারের সুরে বলল—দেখুন কাকাবাবু, কেমন চমৎকার বর জোগাড় করে দিয়েছি বন্দনার জন্যে।

--বৌমা, তুমি বন্দনার দিদি। বন্দনার মা। কেঁদে ফেললেন ভবেশ দাস। কিছুতেই থামে না।

উদাস বন্দনার জন্যে ভাল এবং দামি শাড়ি কিনল। ফার্নিচার কিনল। গহনা কিনল। সাদাকালো টিভিটা দোকানে দিয়ে কিছু ছাড় নিয়ে কালার টিভি ২১ ইঞ্চি কিনে ফেলল। সে শুনেছে, বন্দনা কালার টিভি পছন্দ করে। বলা বাহুল্য এই কেনাকাটির ব্যাপারে উদাসের পাশে সবসময় রাণী। তার উৎসাহের অন্ত নেই। প্রকৃতপক্ষে এই বিয়ের অভিভাবক হয়ে উঠল রাণী।

বন্দনার জন্যে একমাত্র দালান রুমের উপর আর একটা ঘর হল। মানে দোতলা। এর পরবর্তী প্ল্যান হচ্ছে উদাসের, মাটির ঘর ভেঙে ফেলে, ওখানে একটা শোবার ঘর বড় করা, একটা বড়মাপের রান্নাঘর করা, আধুনিক বাথরুম বানানো। ব্যাঙ্ক থেকে লোন পেয়ে গেছে উদাস। আজকাল লোন পেতে বেশি ঝামেলা পোহাতে হয় না। ব্যাঙ্ক নিজে থেকেই লোন দিতে আগ্রহী। না দিলে তার ব্যবসা চলবে কি করে? খাবে কি?

১৩ বৈশাখ বিয়ে হল। উদাস ওয়েডস্ বন্দনা। গরম জলকষ্ট লোডশেডিং বিরক্তিকর আবহাওয়ার মধ্যে দশজন বরযাত্রীকে নিয়ে উদাস গেল উখরা, বন্দনাকে বধূ করে আনতে। সে এক উজ্জ্বল দিন উদাসের। তার জীবনের। একটা বিয়ে মানুষের জীবনে অনেককিছু। সে নারী বা পুরুষ যাই হোক। এখানে যদি কোন গোলমাল থাকে, ফাঁকি থাকে, প্রবঞ্চনা থাকে, তাহলে বাকি জীবন হয়ে গেল। সে দাম্পত্য জীবন থেকে দুর্গন্ধ ওঠে। কোন আতর বা মৃগনাভি দিয়ে তা ঢাকা যায় না। এড়ানো যায় না।

বরযাত্রীদের মধ্যে ছিল রাণী, তরুণ এবং বুবুন। রাণী তো দুপক্ষের লোক। বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি। তার খাতিরই আলাদা। ভবেশবাবু—ও রাণী বউমা, শোন, এদিকে এস, একটা কথা বলছিলাম, তোমার মত কি এই বিষয়ে ইত্যাদি করে যেতে লাগলেন। রাণী দেবী দশভুজার মতো সংগ্রাম করে যেতে লাগল। কখনো শান্ত রূপ কখনো রুদ্র। তা বিয়ে হল। অজস্র উলু পড়ল। ঘন ঘন শাঁখ বাজল। রেকর্ডে সানাইয়ের মৃদু সুর, ইলেকট্রিকের ঝলমলে আলো, সব মিলিয়ে এক মায়াময় পরিবেশ। এক যেন রোমাণ্টিক আলেখ্য লোকজনের যাওয়া আসা, খাওয়াদাওয়া, সব মিলে ভিন্ন মাত্রার সৃজন। নিজেকে বড় বেশি মূল্যবান ভাবছে উদাস। তার পাশে বধূবেশে বন্দনা। লজ্জানত মুখ। মুখে হালকা হাসি। সে ভাবেনি তার বিয়ে হবে অথবা উদাসের সঙ্গে। তার ধারণা ছিল তার চেহারা সুন্দর হলেও, বাবার অর্থের অভাবে বিয়ে তার সম্ভব নয়। মাস বছর গড়িয়ে যাবে। বয়স বাড়বে। আস্তে আস্তে তার সমস্ত শারীরিক সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাবে। বয়স বড় কঠিন। সে সুন্দরী নারীকেও শেষ করে দেয়। তার হাত থেকে কেউ বাঁচে না। সুরূপা কুরূপা হয়ে যায়। এইভাবে সংসারের এক কোণে পড়ে থেকে তার জীবন অতিবাহিত হয়ে যাবে। কিন্তু উদাস এসে সব তার হিসেব উল্টে দিল। কার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে বন্দনা, রাণীর প্রতি না উদাসের প্রতি। উদাস তার স্বামী, সত্যিকারের ভালমানুষ, তার এত প্রশংসা শুনেছে বন্দনা, সে যেন কালা হয়ে গেছে। এখন তার কামনা, সে যেন উদাসের যোগ্য হতে পারে। হতে পারে উপযুক্ত গৃহবধূ। দশজন তাকে দেখে যেন বলে—সত্যিকারের একটা ভাল বউ, এরকম একটা ভাল মেয়ে আমার ছেলের জন্যে দিতে পার কেউ? এমনটাই তো খুঁজছি।

বিয়ের পরদিন টাটা সুমোতে ফিরল উদাস বন্দনাকে নিয়ে। বধূবেশী বন্দনাকে অসামান্য দেখাচ্ছে। যেন রাজকন্যা রূপবতী। রাজতনয়া। যখন গাড়ি থেকে নামল উদাস, তার পশ্চাতে বন্দনা, ঝলমলে বেনারসী পরণে, তখন তাকে দেখতে পাড়ার বউ ঝি'রা বলতে গেলে, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। কই, বউ দেখি, বউ দেখি কোলাহল।

পাড়ার এক বয়স্ক মহিলা বন্দনার মুখটা ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বললে—বাঃ সুন্দর, বেশ সুন্দর, এ যে সাক্ষাৎ মা দুর্গা গো। পাড়াতে দেবী এসেছে। শুনে বড় লজ্জা পেয়ে গেল বন্দনা। তার মাথাটা আরো ঝুঁকে গেল সামনের দিকে। কে যেন বলল—না, না, হবে না, মাথা নিচু করা চলবে না। মুখ তোল। দেখব আমরা। তখন বন্দনা মুখ তুলল। হাসতে লাগল। বড় আকর্ষণীয় সে হাসি। মনে ছাপ এঁকে দেয়। পাশে রাণী। এন্তার শাঁখ বাজাছে। কি দম তার! কোন শাঁখ বাজানো প্রতিযোগিতায় সে নামলে, কোন সন্দেহ নেই, প্রথম পুরস্কারটা তারই। রাণী বলল—এখন কেমন লাগছে উদাসদা?

—বেশ ভাল। এক কথায় চমৎকার। নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, আমি যেন একটা ম্যান। সত্যিকারের ম্যান।

বউভাত রাত্রে শ'তিনেক আমন্ত্রিত। দেবেশবাবু এলেন। সঙ্গে শিল্পা কোম্পানির কয়েকজন মানুষ। দেবেশবাবু একটা দামি সোনার হার দিলেন। মালিকের পদমর্যাদা। নিজের হাতে সে হার পরিয়ে দিলেন বন্দনাকে। বন্দনা যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠল। এতক্ষণ যেন একটা ফাঁক ছিল। সেটাও বুজে গেল। বন্দনা প্রণাম করল। দেবেশবাবু আশীর্বাদ করলেন—সুখী হও। তোমরা সুখী হও বন্দনা। ঝলসে উঠল ক্যামেরা। তরুণ ঘুরে ঘুরে ছবি তুলছে। তার হাত কামাই নেই। ব্যস্ততা তুঙ্গে। একসময় সে রাণীর কয়েকটা ফটো তুলে ফেলল।

রাণী বলল—আহা! আমি কি নববধূ, আমার ফটো তুলছ!

—তুমি চিরবধূ। বলল তরুণ। হা হা করে হাসল উদাস। তুমি ঠিক বলেছ তরুণ। বেড়ে বলেছ। আমার দেখা, পৃথিবীর একমাত্র সুখী দম্পতি।

—আপনিও খুব সুখী হবেন উদাসদা। ঠিক আমাদের মতো।

—হলেই ভাল। কিন্তু তাই কি ঘটল!

বুবুন লোক খাওয়ানো এবং তাদের অভ্যর্থনার দায়িত্বে। তার ছোটাছুটির শেষ নেই। কোন্ পাতে কি পড়ল, পড়ল না, কড়া নজর বুবুনের। সে দরকারে ক্যাটারারের ছেলেদের কথা শোনাচ্ছে। এতসব কাণ্ডকারখানার মধ্যেও উদাস স্মরণ করল তার মাকে। মনে মনে বলল—মা, মাগো, আজ আমাদের ঘরে কত মানুষ! দেবেশবাবু পর্যন্ত। তুমি চলে গিয়ে ঘর আঁধার হয়ে উঠেছিল, বন্দনা এসে দীপশিখাটি জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঘর ভরে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত বন্দনা দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখতে পারবে তো? সংসারটা সুন্দর করতে পারবে তো? আমার জীবনে এ এক নব অধ্যায়। অচেনা অজানাশোনা। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর মা। যেখানেই থাক, আছ তো কোথাও, নিশ্চয় আছ, তুমি আমাকে দেখো, বন্দনাকে দেখো, তোমার সংসারকে তুমি দেখো। আমি সুখি হতে চেষ্টা করব মা। তুমি তো

আমাকে সুখী দেখতে চেয়েছিলে। তোমার আশা, তোমার ইচ্ছেকে মা পূর্ণ করব। প্রসন্নময়ী মা আমার! আনন্দময়ী মা!

বন্দনা বলল—অনেক রাত্রি হল। একটা বাজছে। সবাই চলে গেছে। সারাদিন অনেক খাটাখাটনি গেল। এবার তুমি বিশ্রাম নাও। শুয়ে পড়। আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। ঠিক ঘুম এসে যাবে।

—আমি ঘুমাব, তুমি জেগে থাকবে—তা হয় না বন্দনা। তার চেয়ে দুজনেই জেগে থাকি। গল্প করি।

—গল্প!

—তোমার কথা বল। আজ সারাদিন কেমন কাটালে? তোমার কেমন লাগছে এই জীবন? অবিবাহিত জীবন আর বিবাহিত জীবন দুটো আলাদা। সম্পূর্ণ আলাদা। আজকের ফিলিংস বল। আমি জানতে চাই।

বন্দনা বলল গাঢ় কণ্ঠে—স্বপ্নের মতো লাগছে। এত সুখ আগে ভাবতে পারিনি। আমার বিয়ে হবে ভাবতে পারিনি। তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ, আমাদের ফ্যামিলিকে বাঁচিয়েছ। উদাস বন্দনার হাত ধরে বলল—এমন করে বলো না বন্দনা। যা ঘটেছে, একজনের ইচ্ছেতে, আমার ইচ্ছেতে নয়। কিছুতেই নয়।

—কার কথা বলছ? কে তিনি?

॥২৭॥

দেবেশ দত্ত উদাসকে তার নতুন জীবন উপলক্ষে কয়েকদিনের ছুটি মঞ্জুর করলেন। বললেন—বৌমাকে নিয়ে কয়েকদিন ঘুরে ফিরে বেড়াও। এখানে ওখানে যাও। এরপর যখন পুরোপুরি সংসারী হয়ে যাবে, সবাই যেমন হয়, তখন আর সময় পাবে না। তখন শুধু সংসার আর সংসার। উদাস তুমি সুখী হবে। নিশ্চয় হবে। সত্যিই কি উদাস সুখী হবে, না আরও দুঃখী হবে, কি হবে না হবে ভবিষ্যতে, তা তো জানার উপায় নেই। শুধুই অপেক্ষা।

বন্দনাকে নিয়ে কোনদিন বাসে, কোনদিন গাড়িতে করে ঘুরে বেড়াল উদাস। তারাপীঠ, নলহাটি, বক্রেশ্বর, শান্তিনিকেতন, ম্যাসানজোড়। বড় খুশি বন্দনা। সে নদীর মতো উচ্ছল হয়ে উঠল। এ জায়গাগুলো আগে দেখেনি বন্দনা। সে শিশুর মতো অবাক বিস্ময়ে সব দেখল। সবার শেষে ভাণ্ডীরবন। সেখানে ঘোরা রিক্সা করে। বাস আছে। বেশি দূর তো নয়। পাঁচ মাইল। তবে বাসে বড় ভীড় হয়। রিক্সাতে অনেক আরাম। পাড়ার রিক্সাওয়ালা শংকর বলল—উদাসদা, আমার গাড়িতে তোমাদের নিয়ে যাব। আগে কয়েকবার গেছি সওয়ারি নিয়ে। ৫ মাইল রাস্তা। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা লাগবে। বেশ্ জায়গা উদাসদা।

তা একদিন সকাল সাতটায় শঙ্করের রিক্সায় উঠে পড়ল উদাস এবং বন্দনা। ঠিক সওয়া ঘণ্টা লাগল। ফাঁকা রাস্তা। নির্জন। শুনল দুজনে, শংকর বলল—শুনেছি এককালে প্রচুর গাছপালা ছিল রাস্তার দুপাশে। বলতে গেলে জঙ্গল। তার ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে যাওয়া যেত। এখন আর কিছু নেই। মানুষের লোভ সবকিছুকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আচ্ছা উদাসদা, বল তো, মানুষ গাছ দেখলেই কাটে কেন? তার থাকা সইতে পারে না বুঝি? গাছ কি মানুষের শত্রু?

—না শংকর, গাছ মানুষের শত্রু নয়, পরম বন্ধু। বরং মানুষই গাছের শত্রু। তাকে নিকেশ করতে গিয়ে মানুষ নিজের সর্বনাশ ডেকে আনছে। এর পরিণাম ভয়াবহ। একদিন মানুষকে অনুতাপ করতে হবে। কাঁদতে হবে। তখন বাঁচার উপায় থাকবে না।

ডাণ্ডীরবন ঘুরে ঘুরে, গোপালবাড়ি, শিববাড়ি, গোঁসাইয়ের মন্দির, হাফ কিলোমিটার দূরে কালীবাড়ি দেখল উদাস এবং বন্দনা। কালীবাড়ি, বিক্রমপুরের কালী, বড় জাগ্রত। কথিত আছে, তিনি মাঝে মাঝে মন্দির থেকে বেরিয়ে পড়েন। পাশের বিশাল দিঘীতে ডুবে থাকেন। তাই মা যাতে পালাতে না পারেন, ভক্তরা মায়ের পায়ে শিকলের বাঁধন পড়িয়েছেন। সব ঠাকুরস্থানে পুজো দিল বন্দনা। সঙ্গে বেতের ঝুড়িতে ফলমূল, সন্দেশ। ফুল দেবতার চরণে উৎসর্গ করার জন্যে। প্রণাম করতে করতে চলল বন্দনা। তার শরীর মন থেকে ভক্তিধারা উপচে পড়ছে যেন। পরণের গরদের লাল শাড়ি। ভারী ভাল মানিয়েছে তাকে। বন্দনা যে দেখতে সুন্দর। এই দেবভূমিতে সে যেন আরো অপরূপা হয়ে উঠেছে। মাধুর্যমণ্ডিত।

গোপালবাড়িতে তিনজনের প্রসাদ খাবার ব্যবস্থা হল। টাকা জমা দিয়ে দিল উদাস। তারপর তারা দুজনে গেল পাশে বহমান ময়ূরাক্ষীর দিকে। নদী দেখে উচ্ছ্বসিত বন্দনা। সে যেখানে ছিল, সেখানে এমন নদী দেখার সুযোগ নেই। এখানে বিরাট বিস্তৃত ময়ূরাক্ষী। মহাকালের মতো। দক্ষিণ প্রান্তে চড়া পড়ে উঁচু হয়ে গেছে। উত্তরদিকের পাড় ভেঙে এবং গ্রাস করে, নদী চলে যাচ্ছে জলধারা নিয়ে পূর্বদিকে। আপন আনন্দে এবং ছন্দে সে বয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে কার কি ঘটল, কে দুঃখ পেল, কে আনন্দ পেল, তাতে কিছু এসে যায় না তার। উত্তরপাড়ে একটা গ্রাম ছিল। টাংশুলি। ৭৮ সালের বন্যাতে সে গ্রাম চলে গেছে কালের গহ্বরে। এতটুকু তার অস্তিত্ব নেই। বিঘার পর বিঘা জমি বালিচাপা পড়ে ধূ ধূ মরুভূমি করে দিয়েছে। নদীর জলে নেমে পড়ল বন্দনা। তির তির করে বয়ে যাচ্ছে তার জলধারা মধ্যস্থলে, সে জলে পা ডোবাল বন্দনা। শীতল জল। বড় মধুর তার স্পর্শ। মনে হয় যেন নবজন্ম। বন্দনার পায়ের দিকে শাড়ি সায়া ভিজল। নিচু হয়ে হাত দিয়ে নদীর জল ছুঁড়ে দিল উদাসের দিকে। তার সঙ্গে খিলখিল করে হাসি। সে এখন জলকন্যা।

জলপরী। উদাস কিছুটা ভিজে গেল। সে বলল—এ্যাই এ্যাই, বন্দনা কি করছ, ভাল হবে না বলছি।

—আমি আমার ভাল চাই না। বেশ করছি, জল ছুঁড়বো। তোমাকে ভেজাব।

—আবার জল ছুঁড়ছ! কিন্তু বন্দনা কি সে বারণ শোনে? আজ তার বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। নিজেকে প্রকাশ করার, নিজেকে মুক্ত করার দিন। আজ সে নীল আকাশের পরী। কোন বন্ধন নেই। শুধু উড়ে যাওয়া। যথা ইচ্ছা তথা।

গোপালবাড়িতে তিনজনে ভোগ প্রসাদ খেল। বেলা তখন একটা। সাধারণ তবু অসাধারণ। ভোগের স্বাদগন্ধ একেবারে পৃথক। একেই বলে বোধহয় আশ্রমমহিমা। এ ভোগ খাবার জন্যে কত লোক দূর দূর থেকে গাড়ি করে আসে। সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণা কিছুক্ষণের জন্যে তারা ভুলে যায়। জীবন এক দুঃখের নদী।

খাওয়াদাওয়া হল। শংকর বলল—চল বেড়িয়ে পড়ি উদাসদা।

—এত রোদ, তোর রিক্সা টানতে কষ্ট হবে। তুই গোপালবাড়ির আটচালাতে একটু ঘুমিয়ে নে। আমি বন্দনা আর একটু ঘুরে নিই। আবার কবে আসব, বা আসব না, তার ঠিক নেই।

সন্ধ্যাবেলায় বলল রাণী—তুমি তো আমাদের পাত্তাই দিচ্ছ না উদাসদা।

—পাত্তা না দেওয়ার কি দেখলি?

—তুমি আমার দোকান আস না, আমাদের বাড়ি যাও না, খুব ব্যস্ত বুঝি বন্দনাকে নিয়ে?

—এটা তুই ঠিক বলেছিস। নানা জায়গা ঘুরছি বন্দনাকে নিয়ে, বন্দনা চাইছে এসব দেখতে। আগে তো দেখেনি।

—তা ভাল। তবে বন্দনাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে আমাকে আবার গুরুত্বহীন করে দিও না। তা আমার সইবে না। কোন ছোটবেলা থেকে তোমাকে জানি, তোমাকে ভালবাসি, তোমার কাছ থেকে পাল্টা ভালবাসা আশা করেছিলাম, পাইনি। তা না পাই, দুঃখ নেই। শুধু সেই ভালবাসাটুকু তুমি স্বীকার করে নাও! তাও হয়নি। তুমি বল, তুমি কাউকে দুঃখ দিতে চাও না। কিন্তু দুঃখ দাও ঠিকই।

—না রাণী, সত্যি আমি কাউকে দুঃখ দিতে পারি না। এই যে তুই বললি, তোকে আমি দুঃখ দিয়েছি, জানবি ও দুঃখ শতগুণ হয়ে আমার বুকে বাজবে। কত কষ্ট পাই, কাউকে বলতে পারি না। শুধুই নিজের মধ্যে রেখে দেওয়া। এ এক দুঃসহ যন্ত্রণা।

—এইসব কথা তুমি বন্দনাকে বলতে পার এবার। বন্দনাকে আমিই খুঁজে পেতে দিয়েছি। না হলে তুমি বন্দনাকে পেতে?

—সে তো ঠিকই রাণী। তুই ছাড়া বন্দনাকে পাওয়া সম্ভব ছিল না। তোর কাছে তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ রাণী।

—থাক থাক, আর হাততালি দিতে হবে না। বন্দনাকে নিয়ে একদিন আমার শ্বশুরবাড়ি এসো। ওকে দেখলে আমার শ্বশুরশাশুড়ি খুশি হবেন।

—যাব রাণী। কাল বন্দনা উখরা যাবে। একাই যাবে। ট্রেনে চাপিয়ে দেব। নেমে পড়বে উখরায়। কঠিন কিছু নয়। তা বন্দনা একা যেতে চাইছে না, বলছে তুমিও চল।

—তা তুমি যাচ্ছ নিশ্চয়।

—না, যাচ্ছি না। সাইটে অনেক কাজ পড়ে আছে। খাতাপত্রে অনেক এণ্ট্রি বাকি আছে। সেগুলো করতে হবে না? অনেক ছুটি নিয়েছি। আর নয়। এবার পুরোপুরি কাজে।

—এই কয়দিনে তোমার চেহারা বদলে গেছে উদাসদা। তোমাকে চকচকে লাগছে। হাসল উদাস।

—তা বলতে পারিস। তিন কেজি ওজন বেড়ে গেছে। বন্দনা খুব খাওয়াচ্ছে বুঝলি। এটা খাও। ওটা খাও। তোমার স্বাস্থ্য তেমন নয়। আর একটু শরীর ভাল হওয়া দরকার। ভোরে উঠিয়ে দেয়। বলে, যাও একটু খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে এস। হাঁটতে হাঁটতে পুলিশ মাঠ চলে যাও। এক চক্কর দিয়ে এস। তা বন্দনার কথা শুনতে হয়। ঘুরে ফিরে ভালই লাগে। চোখেমুখে ঠাণ্ডা বাতাস মাখি। বেশ আরাম লাগে।

—তাহলে ভালই আছ উদাসদা, কি বল? বলে হাসল রাণী।

—তুই হাসলি যে রাণী? কি কারণে?

—বলব না।

॥ ২৮ ॥

বন্ধু এবং দেবেশবাবুর ভাগ্নে, সুনীলের সঙ্গে দেখা কোর্ট প্রাঙ্গণে। তখন কয়েকটি ফুলগাছের চারা কিনছে উদাস। এখানে ফুল এবং ফুলগাছের অনেক দোকান। বন্দনা কয়েকটা টব কিনেছে। ওর ফুলগাছের শখ। ফুল তো সৌন্দর্যের প্রকাশ। প্রকৃতি কত সুন্দর হতে পারে ফুলগাছ দেখলে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর কে না ভালবাসে ফুল? ফাঁসির আসামিও ভালবাসে।

কোর্ট প্রাঙ্গণের পাশে ব্যাঙ্ক। রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক। তার সামনে স্কুল। সরকারি। ব্যাঙ্কে কাজ করে সুনীল। বেলা দশটায় ব্যাঙ্কের কাজকর্ম শুরু হয়ে যায়।

দুজনে দুজনকে দেখতে পেয়েছে। উদাস বলল—আরে সুনীল, কেমন আছিস ভাই? সুনীল উদাসের বিয়েতে আমন্ত্রিত ছিল। তবে একাই এসেছিল সুনীল। মেয়ের জ্বর হওয়াতে, না এসেছে মেয়ে, না সুনীলের বউ। আসা সম্ভব ছিল না। সুনীলের সঙ্গে বন্দনার আলাপ ঘটেছিল।

—ভাল আছি উদাস। তা বন্দনা কেমন আছে?

—ভাল। বেশ ভাল।

—একদিন আয় তোরা আমাদের বাড়ি বেড়াতে। আমার বউ, তোর বউকে তো দেখেনি। আমার বউ বলছিল, উদাসের বউ কেমন হল? আমি বলেছি, তোমার থেকে সুন্দরী। সে বলেছে, কেমন সুন্দরী, তা দেখতে হয়। ওদেরকে আসতে বল একদিন। হাসল সুনীল। এরপর তোর বন্দনাকে না নিয়ে গিয়ে উপায় নেই। যাস যেন, না হলে আমার বউ আমাকে পেটাবে। বড় মেজাজী এবং রাগী। আমাকে খুব সাবধানে চলতে হয়।

—সব স্বামীর এক অবস্থা। বলে হাসল উদাস।

—হাসছিস? হাসতে পারছিস? দেখবি, তোর এই হাসি একদিন থাকবে না। দেবেশমামা একদিন ফোন করেছিলেন। তোর বড় প্রশংসা করছিলেন। আর একটা খবর দিই তোকে?

—বল?

—তোর সেই কলেজ বান্ধবী আশালতা, আমাদের পাড়ার মেয়ে, ও তো আর ওর স্বামীর ঘর যাচ্ছে না, মানে শিলিগুড়ি। শুনলাম, আমার স্ত্রী বলল, স্থায়ীভাবে এখানেই থাকবে। তা ওর স্বামীর সঙ্গে আশালতার গণ্ডগোলের কারণটা কি? এর মধ্যে তুই নেই তো?

—তুই নিশ্চয় জানবি সুনীল, এর মধ্যে আমার কোন ভূমিকা নেই। এটা ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যক্তিগত মান-অভিমানের ব্যাপার।

—একদিন তাহলে মিটে যাবে। মান-অভিমান স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বেশিদিন থাকে না। থাকার কথা নয়।

—কি জানি সুনীল! শুধু জানি সংসার বড় বিচিত্র জায়গা। এর রহস্য অতল অপার। সংসারের শুরু বা শেষ যে কোথায় তা আমার জানা নেই। ঠিক আছে সুনীল, আশালতাকে ফোন করে সব জেনে নিচ্ছি।

সুনীল চলে গেল। উদাসের মনটা বিঘ্নিত হল। কোর্টপ্রাঙ্গণে এক নির্জন স্থানে গাছতলায় পকেট থেকে মোবাইল বের করল উদাস। কোর্ট প্রাঙ্গণে এবার ভীড় জমতে শুরু করেছে। উকিল মক্কেল মুহুরী দালালদের ভীড়। এ ভীড় চলবে বিকেল পর্যন্ত।

—হ্যালো।

—আশালতা আছে?

—কে আপনি? ওপাশে নারীকণ্ঠ।

—আমি উদাস মণ্ডল। স্টেশন বাজারে থাকি।

—ও আপনি। আমি আশালতার বৌদি। আমি আপনাকে চিনি। আশালতার মেয়ের জন্মদিনে আপনি এসেছিলেন। ঠিক আছে, আপনি ফোনটা হোল্ড করুন। ডেকে দিচ্ছি আশাকে। আবার নারীকণ্ঠ। এবার আশালতা।

—হ্যালো উদাস, কি খবর, কেমন আছ?

—আমি ঠিক আছি। খবর পেলাম, তুমি এখানেই থেকে যাচ্ছ। তার মানে তুমি শিলিগুড়ি যাচ্ছ না?

—না যাচ্ছি না। এখানেই থাকব স্থায়ীভাবে। বাবা বলেছেন, আমার সব ব্যবস্থা করে দেবেন। অপমানের বোঝা আমাকে বইতে হবে না। আমার এখন একটাই কাজ, মেয়েকে মানুষ করা। শোন, তোমার বউকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছে। ভাবছি, কয়েকদিনের মধ্যে যাব আবার।

—নিশ্চয় আসবে। তোমাকে দেখলে বন্দনা খুশি হবে। শুধু আসার আগে আমাকে একটু ফোন করো।

—নিশ্চয়।

—তোমার মেয়ে কেমন?

—ভাল। বেশ ভাল।

—তোমরা ভাল থেক আশালতা। ভাল থেক।

—তুমিও উদাস। লাইন কেটে দিল উদাস। বাড়ি ফিরল সে। বন্দনা বলল—ক'টা গাছের চারা কিনতে তোমার এত সময় লাগল? কখন বেরিয়েছ? খিদে পায় না? ঘরে বাজার নেই। বাজার করবে না? কি ব্যাপার, তোমার মুখ গম্ভীর লাগছে কেন?

—ও কিছু নয়। দাও ব্যাগ দাও। বাজার নিয়ে আসি।

—আগে কিছু খেয়ে নাও। তারপর যাবে। ও হ্যাঁ, তোমার একটা ফোন এসেছিল।

—কে করেছিল?

—আসানসোল থেকে ফোন। নাম বলল জুঁই। জুঁই কে গো?

—জুঁই? জুঁই হচ্ছে দেবেশ দত্তের ছোট মেয়ে। কলকাতায় মেডিকেল পড়ে।

—তা তোমার সঙ্গে পরিচয় হল কি করে?

—দেবেশবাবু একবার পুজোর সময় ওঁর বাড়িতে যেতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। গেছিলাম। তখন মা বেঁচে। দেবেশবাবুর বাড়িতে তিনদিন ছিলাম। তখন আলাপ জুঁইয়ের সঙ্গে। খুব ইনটেলিজেন্ট মেয়ে জুঁই। মেডিকেল পাশ করে হায়ার স্টাডিজের জন্যে লণ্ডন যাবে শুনেছি।

উদাস কিন্তু একবারও উল্লেখ করল না, তার মায়ের মৃত্যুর পর জুঁই এ বাড়িতে এসেছিল। সঙ্গে ছিল তার প্রেমিক সুজয়, যাকে সে বিয়ে করবে। তারা দিনসাত

ছিল এ বাড়িতে। কথাটা বলল না এই কারণে, বন্দনা যদি কাউকে ব্যাপারটা বলে ফেলে এবং তা শেষপর্যন্ত দেবেশবাবুর কানে চলে যায়। এরকম তো হতেই পারে। কত তো হয়। তখন বিপদে পড়ে যাবে উদাস। দেবেশবাবু বলবেন, সে কি উদাস, একথাটা তুমি চেপে রেখেছিলে, কাজটা তোমার ঠিক হয়নি। তুমি তোমার কর্তব্য পালন করতে পারনি। জুঁই জানলে বলবে, সে কি উদাসদা, বাবার কানে কথাটা চলে গেল? আমি না বারণ করেছিলাম, ব্যাপারটা কাউকে বলবেন না, আপনি কথা দিয়েছিলেন কেউ জানবে না, তবু বাবা জানলেন কি করে? ছিঃ উদাসদা, আমি আপনাকে আপনজন ভাবি, আপনাকে শ্রদ্ধা করি, এই তার প্রতিদান!

না, এ খবর কিছুতেই বলবে না বন্দনাকে উদাস। বন্দনা যদি পেটে কথা না রাখতে পারে! তাহলে তার বিপদ। তাকে বিশ্বাসঘাতক হতে হবে। অবশ্য ব্যাপারটা রাণী জানে। রাণীর পেটে কথা থাকে। কথাকে ও বিলকুল হজম করে দিতে পারে। রাণীর অনেক গুণের মধ্যে এটা একটা গুণ।

—শোন, জুঁই বলল, কখন তোমাকে পাওয়া যাবে। আমি বললাম, রাত সাড়ে ন'টা থেকে দশটার মধ্যে পাওয়া যাবে। তখন ফোন করবেন। জুঁই বলল, তাই করব। উদাসদার সঙ্গে কথা আছে। উদাস ভাবল, জুঁই কি তার মোবাইল নম্বর জানে না? না, তাকে জানানো হয়নি। ল্যাণ্ড ফোনের নম্বর জানে। তাই ল্যাণ্ড ফোনে করেছিল।

বন্দনা রুটি তরকারি মিষ্টি নিয়ে এল। একটা থালিতে। বলল—সব খেয়ে নাও। বলবে না, আর খেতে পারছি না বন্দনা, পেট ভরে গেছে। আমি কোন কথা শুনব না।

সন্তানসম্ভবা হয়েছে বন্দনা। সে খবরে উদাস নিদারুণ খুশি হয়ে উঠল। এই ঘরে এক শিশু জন্ম নিচ্ছে। তার কণ্ঠের চিৎকারে, তার হাসিকান্নায় সংসার পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে। গমগম করবে গৃহ। মা চেয়েছিলেন, উদাসের বিয়ে হোক, তার সন্তান হোক। তাই হয়েছে। ছেলে বা মেয়ে যাই হোক না কেন, সে স্বাগত। ছেলে মা মেয়ে, সন্তান হলেই হল, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, ব্যবধান নেই। দুটোই সমান সত্য। অনেক শিক্ষিত, অশিক্ষিত পরিবারে, গরিব ধনী পরিবারে, মেয়ে জন্মালে তারা খুশি হয় না। কিন্তু কেন এই বৈষম্য? এর কোন মানে হয়? এসব মনের সঙ্কীর্ণতা। কবে এইসব পাপ দেশ থেকে দূর হবে? আর একটা বিদ্যাসাগরের প্রয়োজন।

উদাস বলল—ছেলে হলে জানব, বাবা ফিরে এলেন। মেয়ে হলে মা। মা'ই আসে আসুন। মা আমাকে কোলে করে ঘুরে বেড়াতেন। এবার আমি মাকে নিয়ে কোলে করে ঘুরে বেড়াব। মাতৃঋণ শোধ করব।

—আমি মেয়ে চাই না। বলল বন্দনা।

—কেন, কেন?

—মেয়ে হলে তাকে বিয়ে দিতে হবে। টাকা ছাড়া বিয়ে হয় না। অনেক অনেক টাকা লাগবে।

—সবসময় তা ঠিক কি বন্দনা? যদি তোমার মেয়ে সুশিক্ষিতা হয়, যদি চাকরি-বাকরি করে, তাহলে কি পাত্রের অভাব হবে? আসল কথা মেয়েদের ঠিকমতো মানুষ করা। মা বাবারা তা কি করে? কেবল মেয়েদের বোঝা ভাবে। এমন ভাবনা তো অন্যায়। পাপ। তারপর বলল উদাস, আমি তো বিনা পণে, বিনা খরচে, তোমাকে বিয়ে করেছি,করিনি?

—সে আমি সুন্দরী বলে।

হাসল উদাস—তা ঠিক বন্দনা। তোমার পঁচিশ বছরের চেহারা দেখে আমি আপ্লুত। তোমার ১৬/১৭ বছরের চেহারা কেমন ছিল, ভাবতে আমার অবাক লাগে। সে বয়সের ফটো কি আছে তোমার কাছে?

—আছে। পাসপোর্ট সাইজের ফটো।

—সে ফটো দেখাও আমাকে।

হাসল বন্দনা—সে কি এখন আমার কাছে আছে! উখরার বাড়িতে থাকবে। মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ফটো লেগেছিল। কবেকার কথা।

—ঠিক আছে, এবার উখরা গেলে সে ফটো নিয়ে এসো।

—খুঁজেপেতে দেখতে হবে।

—আনতেই হবে তোমাকে।

—তুমি একটা পাগল মানুষ। ঠিক আছে বাবা, আনব।

উদাসের বাড়ির অবয়বে পরিবর্তন এল। বড় মাটির ঘরটা ভেঙে ফেলা হল। সে জায়গায়, একটি নয়, দুটি শোবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি আধুনিক বাথরুম বানানো হল। উদাস চেয়েছিল, তার বাথরুম হোক হাল ফ্যাশানের, যেমনটি সে দেখেছে বন্ধু সুনীলের বাড়ি, মোজাইক মেঝে, কালো টাইল দেওয়ালে, ঝকঝকে তকতকে বাথরুম। ঠিক তেমনটিই হল তার বাথরুম। উদাস বলল—কেমন বাথরুম?

—খুব সুন্দর। একেবারে মনের মতো।

—সবকিছু তোমার জন্যে বন্দনা। সবকিছু তোমার।

—জানি গো জানি।

জলের ট্যাঙ্ক বসানো হল। কুয়োতে পাইপ লাগিয়ে, ছোট পাম্পের সাহায্যে, মাথার ছাদে রক্ষিত বিশাল ট্যাঙ্কে জল উঠতে লাগল। এছাড়া, পৃথকভাবে অনেক

টাকা খরচ বরে উঠানের এক পাশে ডিপটিউবওয়েল বসানো হল। না করলে চলবে না। গ্রীষ্মকালে কুয়ো শুকিয়ে যায়। তখন জল পাবে কোথায়? গোটা শহরে জলের কষ্ট। সরকারি জল শহরের অর্ধেক লোক পায় না। পৌরসভা কাজ করে না। শুধু বিবৃতি দিয়ে যায়। আর স্বপ্ন দেখায়। জলসমস্যা মিটল বলে। বিগত দশবছর ধরে তারা এই স্বপ্নকথা বিক্রি করে আসছে। আজও তা সত্য হল না। কোনদিন হবে কি? মায়ের আমলে জলের খুব অসুবিধা ছিল। জলের জন্যে মা বড় কষ্ট পেয়েছেন। বন্দনাকে সে অসুবিধা ভোগ করতে হবে না। জল ছাড়া সংসার চলে? সংসারে ভাতের চালের যেমন দরকার, জলও তেমন দরকার। গোটা বাড়ি রং করা হল।

রাণী বলল—তুমি নতুন বাড়ি বানিয়ে ফেললে উদাসদা। চমৎকর লাগছে দেখতে বাড়িটা। অনেকটা স্বপ্নের মতো। দেখে কে বলবে, সেই বাড়ি? অনেক টাকা খরচা হয়ে গেল না উদাসদা?

—তা হয়েছে। হোক তা। ব্যাঙ্কের লোন ঠিক পরিশোধ করতে পারব, আমি সব সামলে নেব। এবাড়ি আমার স্বপ্নের বাড়ি রাণী। নাম দিয়েছি সেঁজুতি।

—এর মানে?

—সন্ধ্যাপ্রদীপ। এ বাড়ি আমি উৎসর্গ করেছি বন্দনাকে। ভাল করিনি বল?

—সবসময় তুমি বন্দনা আর বন্দনা। এত কি ভাল? বন্দনা বাদ দিয়ে পৃথিবীতে আর কেউ নেই; কেন তুমি আমার নাম কর না, আশালতার নাম কর না, জুঁইয়ের কর না? আমরা তোমার কেউ না? আমাদের কি তুমি মুছে দিলে? লজ্জা পেয়ে গেল উদাস। বলল—না, না, তা কেন? তোরা ঠিক আছিস আমার সঙ্গে। আমার হৃদয়ে।

—কি জানি বাবা, আমার বিশ্বাস হয় না। কথাটা অন্যায় বলেনি রাণী, সত্যি তো সে এখন বন্দনাময় হয়ে উঠেছে। বন্দনার সুন্দর মুখটার বেড়াজালে সে আটকে পড়েছে। এটা ঠিক নয়। বাকিদের সে তুচ্ছ করছে, তাদের খোঁজখবর করছে না। পরদিন সে সাইট থেকে ফোন করল আশালতাকে।

—হ্যালো। বলল আশালতা।

—আশালতা আমি উদাস বলছি।

—গলা শুনে বুঝতে পারছি। তা বল উদাস কি বলবে?

—কেমন আছ তুমি? কয়েকদিন খবর নেওয়া হয়নি।

—ভাল আছি উদাস।

—কন্যারত্ন?

—সেও ভাল।

—শিলিগুড়ির খবর?

—যোগাযোগ নেই।

—সঞ্জয়বাবু ফোন করেন না বা তুমি?

—না, আমরা কেউ কাউকে ফোন করি না। সঞ্জয় কোনদিন ফোন করবে না আমাকে। উদ্ধত অহংকারী এবং জেদী লোক।

—তুমি তার বউ, তোমাকে সে ফোন করবে না, তা কি হয়?

—হয় হয় উদাস। পৃথিবীতে সবকিছু হয়। সবকিছু সম্ভব। এখানকার কোন ব্যাপারে আশ্চর্য হতে নেই। আমি হই না।

—আমি মানতে পারছি না আশালতা। কোন স্বামী তার বউকে ফোন করবে না, খবর নেবে না। তা কি হওয়া উচিত!

ও প্রান্তে হাসল আশালতা—আমার মতো বউ সঞ্জয়ের অনেক আছে।

—এ কি কথা বলছ আশালতা?

—বানিয়ে বলছি না। আমার হাতে প্রমাণ আছে। ওর ভালবাসার জন্যে নারী দরকার নেই। শুধু তার শরীর দরকার। সেভাবে আমাকে সঞ্জয় ব্যবহার করেছে।

—থাক থাক আশালতা, এসব কথা থাক। আমি শুনতে পারছি না। কষ্ট হচ্ছে।

—পৃথিবীতে সবাই তো উদাস মণ্ডল নয়, হতে পারে না। যে বউকে জীবন মন প্রাণ দিয়ে ভালবাসবে।

—অন্য কথা বল আশালতা। সারাদিন কি করছ?

—সকালে স্কুল। সেখানে পড়িয়ে ফিরতে বেলা এগারোটা ধর। স্কুলে কিন্তু ভাল খাটনি আছে। কত কত খাতা দেখতে হয়। কারেকশন করতে হয়। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে একটু বিশ্রাম নিয়ে মেয়েকে পড়াতে বসাই। মেয়ে আমার ইনটেলিজেণ্ট। ওকে পড়িয়ে আনন্দ পাই। তারপর বিকেলে একটু ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে যাই। সঙ্গে মেয়ে থাকে। কোন কোনদিন বৌদি। পরিচিত এর ওর বাড়ি যাই। ফিরে এসে মেয়েকে নিয়ে আবার বসি। ঘণ্টাখানেক। তারপর টিভি, গল্পের বই, খবরের কাগজ। ভালই কাটছে উদাস। শিলিগুড়িতে রাত্রে আমার ঘুম হতো না। ওষুধ খেতাম। সবসময় চিন্তার রাশি মাথায় বিজবিজ করত। কোনদিন সঞ্জয় ফিরত, কোনদিন না। আমার খুব ভয় লাগত। আস্তে আস্তে মানসিক রোগী হয়ে যাচ্ছিলাম, এখন সেসব কিছু নেই। স্বাধীন সুস্থ বাঁধনহারা জীবন। খাঁচার পাখি থেকে আকাশের পাখি। আমি শুধু আমার কথা বলে যাচ্ছি। এটা ঠিক নয়। তোমার কথা বল।

—আমি ভাল আছি আশালতা। বেশ আছি। শোন, বন্দনার বাচ্চা হবে।

—আরে তাই! এ তো দারুণ খবর। খুশির খবর। আমার মিষ্টি পাওনা রইল।

—একশবার।

—উদাস, বাবাকে বলেছি, আমি টিউশনি পড়াব। হাতে তো সময় থাকে। যেমন তুমি পড়াও।

—তা তোমার বাবা কি রাজী?

—বাবা বললেন, এ বাড়িতে বসে আমি টিউশনি পড়াতে পারব। তবে কারুর বাড়িতে গিয়ে নয়। বুঝছ না, প্রেস্টিজের ব্যাপার। কয়েকজন গার্জেনের সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁরা রাজি। সামনের মাসের এক তারিখ থেকে শুরু করব। তোমার সমর্থন আছে তো?

—কেন থাকবে না আশালতা? নিশ্চয় আছে। বিদ্যাদান, অন্নদান এসব তো মহৎ কাজ। সব মানুষের করা উচিত। একদিন এস আমার বাড়ি।

—হ্যাঁ যাব। যেতে হবে। তোমার সোনার সংসার এখন। তা দেখতে যাব না?

—সোনার সংসার! সে আবার কি?

—যে সংসারে দুঃখ থাকে না, যন্ত্রণা থাকে না, সবটাই আনন্দ, আমি তাকে সোনার সংসার বলি। বন্দনাকে আমি মনে মনে সখী করে নিয়েছি। তুমি আমার সখা। সখা হে—

—ভারী অদ্ভুত কথা বল তুমি আশালতা। তোমার কথা শুনতে আমার ভারী ভাল লাগে। মনে হয়, তোমার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। আমার দুঃখ, সঞ্জয়বাবু তোমাকে ঠিক চিনতে পারলেন না।

—তার কি চোখ আছে, না মন আছে? ওগুলো যার নেই, সে অন্যকে চিনবে কি করে? সে চেনে শুধু টাকা। ঠিক আছে, আমার সোনার সংসার হয়নি, দুঃখের হয়েছে, তা হোক তোমার তো হয়েছে। তাতেই আমার আনন্দ। সুখ।

—আশালতা নিজেকে এমন করে দুঃখ দাও কেন? আমি যে দুঃখ পাই।

—জানি, জানি উদাস। সেটাই আমার দুঃখ। তোমাকে আমি আনন্দ দিতে পারি না। তবে যখন আমি ভাবি, তুমি আমার পাশে আছ, সব দুঃখ আমার চলে যায়।

—তুমি ঠিক বলছ আশালতা?

—হ্যাঁ উদাস। আমি একদম ঠিক বলছি। সখাকে সখী কি ভুল কথা বলে? খিলখিল করে হাসল আশালতা। কতদিন, হ্যাঁ কতদিন পর, আশালতার মুখ থেকে হাসি উদয় হল। মনে ভারী আরাম পেল উদাস। হাসছে যখন আশালতা, তার মনের কষ্ট কমে যাচ্ছে। দুঃখ চলে যাচ্ছে দূরে। তাই হোক। তবে তাই হোক। মনের মধ্যে স্বর্গীয় প্রশান্তি অনুভব করুক আশালতা।

ঘর সাজানোর অনেক কিছু কিনল উদাস। খাট পালঙ্ক নতুন ঘরের জন্যে, ভাল বিছানা, ভাল মশারী, ভাল পর্দা সব কিনল উদাস। সবকিছু ছিমছাম। রুচিশীল। সুন্দর। বিয়ে উপলক্ষে আগে কিছু কেনা হয়েছিল। বাকিটা এখন।

একদিন বলল বন্দনা—বাবাকে এনে এখানে রাখব ভাবছি।

—কেন বন্দনা? কি হয়েছে?

—বাবার সঙ্গে শক্তিমানের বনিবনা হচ্ছে না। শক্তিমান উদাসের একমাত্র শ্যালক। এই ছেলেটিকে তেমন পছন্দ করে না উদাস। বয়স বেশি নয়। এই ২২/২৩। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। বাবড়ি। গালে দাড়ি। হাতে বালা। স্বাস্থ্য গাঁট্টাগোট্টা। ব্যায়াম করে। প্রচুর খায়। শক্তিমানের নামে অনেক অভিযোগ শুনেছে উদাস। সে কলিয়ারীতে তোলা তোলে। লোককে হুমকি দেয়। মারপিট করে। বোমা বাঁধে। সে অন্যায় কোনটাই পছন্দ করে না উদাস। সে অন্যায় কাজ দেখতে পারে না। শক্তিমানের কর্মগুরু থাকে অণ্ডালে। যেদিন বন্দনাকে দেখতে যায় উদাস, সেদিন উখরাতে ছিল না শক্তিমান। ভবেশবাবু বললেন, কাজের খোঁজে শক্তিমান গেছে অণ্ডালে। কথাটা ঠিক নয়। সে গেছিল মাফিয়া ডন সিংজীর কাছে। দু-এক রাত্রি হাজতবাস করেছে শক্তিমান। তার গুরু তাকে ছাড়িয়ে এনেছে। এতে শক্তিমানের সাহস আরও বেড়ে গেছে। সব মিলিয়ে শক্তিমান সমাজবিরোধী। তাকে কি করে মেনে নেবে উদাস? একমাত্র শ্যালক হলেও না। কোথায় বুবুন, কোথায় শক্তিমান! একজন সমাজবান্ধব, অন্যজন সমাজশত্রু। এই শক্তিমানের একটা চাকরি যাতে হয় ইঁট কোম্পানিতে, তার কথা বলেছিল বন্দনা উদাসকে। উদাস এড়িয়ে গেছে। বলেছে, এখন কোম্পানির আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। কোম্পানি লোকসানে চলছে। চারদিকের অবস্থা দেখছ তো? কারখানাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। বোধহয় ইঁট কোম্পানিতে লোক ছাঁটাই করতে হবে। এই পরিস্থিতিতে নতুন লোক নেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। পরিস্থিতি ভাল হলে তখন চেষ্টা করব।

বন্দনা চুপ করে গেল। স্থির নিশ্চয় উদাস, সে শক্তিমানকে কোনদিন কোম্পানিতে ঢোকাবে না। মিথ্যা কথা বলতে হল বন্দনাকে। না বলে উপায় নেই। বৃহৎ স্বার্থের কথা ভেবে ভুল বার্তা দিল বন্দনাকে। সে শক্তিমানকে ঢুকিয়ে কোম্পানির ক্ষতি করতে পারে না। তার কোম্পানির আর্থিক অবস্থা যথেষ্ট মজবুত। এই কোম্পানির ইঁট শুধু এই জেলাতে নয়, জেলার বাইরে অন্য জেলাতেও সাপ্লাই করে। হবে নাই বা কেন? শিল্পা কোম্পানির ইঁটের গুণগত মান যেকোন কোম্পানির থেকে ভাল এবং দামেও কম। যে একবার ব্যবহার করেছে, সে আবার চাইছে। দেবেশ দত্ত লোভী ব্যবসায়ী নন। তিনি ন্যায্য লাভের মানুষ। বন্দনা বলল—তোমাকে আমার অনেক কথা বলা হয়নি।

—কি কথা?

—শক্তিমানকে নিয়ে। ভাই পাড়ার একটা মেয়েকে লাভ ম্যারেজ করে ঘরে তুলেছে। মেয়েটার নাম আলতা। ওর বাবা একটা শয়তান লোক। আমার বাবা আলতাকে ঘরে ঢুকতে দিতে রাজি হননি। এমন মেয়েকে বৌমা বলে মানতে চাননি। ভাই জোর করে ঢুকেছে। বাবার সঙ্গে হাতাহাতি করেছে। তারপর দোকানের তালা ভেঙে দোকানের দখল নিয়েছে। যা মাল ছিল বাবার, গেঞ্জি গামছা লুঙ্গি, সেগুলো হাফ দামে বিক্রি করে টাকাটা নিয়ে নিয়েছে। ঐ ঘরে লটকনার দোকান খুলেছে। ওর এক শ্যালক দোকানে বসছে। বাবা বসতে চেয়েছিলেন, ভাই দেয়নি। ভাইয়ের শ্বশুর লটকনা ব্যবসায়ী। সেই সবকিছু তদারক করছে। ভাইকে ওঠাচ্ছে বসাচ্ছে। বাবাকে নিঃস্ব করে দিয়েছে শক্তিমান।

—এসব ঘটনা কবেকার?

—তা মাসখানেক হবে।

—এসব জানলে কি করে? তুমি তো উখরা যাওনি, অন্ততঃ একমাস।

—বাবা আমাকে ফোন করেছিলেন। খুব কাঁদছিলেন।

—তোমার বাবা থানায় যেতে পারতেন।

—থানায় গিয়ে কোন লাভ নেই। শক্তিমানের হাতে মস্তানবাহিনী আছে, পিছনে আছে সিংজী। শক্তিমানের কেউ কিছু করতে পারবে না। চেষ্টা করেও না। ডেঞ্জারাস ছেলে।

—তাহলে আর কি করা? তোমার বাবাকে এখানে আসতে বল। থাকুন এখানে। আর তোমার মা?

—মাকে ভাই কিছু বলে না। যত রাগ বাবার উপর। বাবাকে হুমকি দিয়েছে, থানাপুলিশ করলে তুমি মার্ডার হয়ে যাবে। বাবা ভয়ে চুপ করে আছেন। উখরাতে থাকতে চাইছেন না। তাহলে তুমি মত দিচ্ছ বাবাকে আনতে?

—তা দিচ্ছি। না দিলে তোমার বাবা খাবেন কি? অনাহারে মারা যাবেন। জামাই হয়ে তা আমি চুপ করে দেখতে পারি না।

রাণীর দোকানে গিয়ে উদাস তার সমস্যার কথা বলল। রাণী সব শুনল। তারপর বলল—তোমার শ্বশুর প্রায় আসে তোমার বাড়ি।

—সে কি! বন্দনা তো তা বলল না। সে বলল, বাবা টেলিফোনে সব জানিয়েছেন।

—বন্দনা ব্যাপারটা লুকোচ্ছে। তুমি যখন সাইটে চলে যাও, দুপুরে এই ধর একটা নাগাদ, দুপুরের ট্রেনে ভবেশবাবু আসেন। তারপর পাঁচটার ট্রেনে চলে যান। তুমি জানবে কি করে? না বললে?

—তুই ঠিক দেখেছিস রাণী?

—চেনা মানুষকে চিনতে পারব না? তোমার শ্বশুর তো আমার কাকাশ্বশুর, তাকে চিনতে পারব না? তাকে দেখেছি ঠিক।

—এসব কিছু আমি জানি না। বন্দনা কিছু বলেনি। কেন বলেনি বল তো?

—কি জানি?

—একটা কথা, বন্দনা প্রায় আমার কাছে টাকা চায়। ওকে মাসপয়লা সংসারের সব খরচের টাকা দিয়ে দিই। কম টাকা দিই না। তবু কিছুদিন পরে বলে, আরও টাকা দাও। শেষ হয়ে গেছে।

—দেখগা হয়তো ভবেশবাবুকে টাকা দেয়।

—তা হতে পারে রাণী। শক্তিমানকে কি দেয়? ওকে দিলে আপত্তি করব। আমার সততার রোজগার। অসৎ কেউ ভাগ বসাবে, মানতে পারব না। বন্দনাকে সাবধান করে দিতে হবে।

রাণী বলল—এখন কিছু বলো না। ব্যাপারটা চুপচাপ দেখে যাও। আমিও দেখছি। কোথাকার জল কোথায় মরে। আমার মনে হচ্ছে, আজ শ্বশুর তোমার কাছে শেল্টার নিচ্ছে, কাল দেখবে তোমার শাশুড়ি এসে হাজির।

—তুই বলিস কি রাণী! ভাবনা ধরিয়ে দিলি?

—অবাক হচ্ছ কেন উদাসদা। এই পৃথিবীতে কোন ব্যাপারে অবাক হতে নেই। সব ঘটনাই সম্ভব। উদাস কেমন ভাবনায় পড়ে যায়। এর মধ্যে বন্দনার কোন হাত নেই তো? কোন কৌশল?

রাত্রে ফোন এল জুঁইয়ের। আসানসোল থেকে।

—হ্যালো?

—উদাসদা বলছেন?

—বলছি।

—আমি জুঁই।

—কণ্ঠ চিনতে পেরেছি। কি বলবে বল।

—উদাসদা আমি সুজয়কে বিয়ে করেছি, রেজিস্ট্রি। না করে উপায় ছিল না। বাবা-মার অনুমতি নিইনি। আমি জানি তাঁরা অনুমতি দেবেন না। বিয়ে করেছি, এ খবরটা আমি দিইনি। ঘরে অশান্তি লেগে যাবে। শুধু আপনাকেই বললাম। আপনি আবার বাবাকে বলে দেবেন না যেন।

—তুমি যখন বারণ করছ, বলব না। তুমি এসেছিলে, সেটা বলিনি।

—আপনার উপর আমি খুব ভরসা করি উদাসদা। আপনজন ভাবি। আমি ঠিক জানি, আমি বিপদে পড়লে বাঁচাতে আসবেন আমাকে, আসবেন না?

—তোমার কোন বিপদ ঘটবে না। তাও যদি ঘটে, আমি আছি। তুমি ভাবনা করো না।

—আঃ বাঁচলাম উদাসদা আপনার কথা শুনে। ভরসা পেলাম। বাড়ির তিনতলা থেকে গোপনে ফোন করছি মোবাইলে। আপনার কোন অসুবিধা ঘটালাম না তো?

—এতটুকু না। ঠিক এই সময়ে তুমি ফোন করবে দরকার হলে। রাত্রি ১১টা পর্যন্ত জেগে থাকি।

—বন্দনাবৌদি কি করছে?

—মেয়েরা যা করে। রান্নাঘর সামলাচ্ছে। আগামীকাল কি কি রান্না হবে, তার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বন্দনা খুব ভোরে ওঠে। রাত্রি চারটা। তারপর সংসার যুদ্ধে নেমে পড়ে।

—বৌদিকে দেখতে সাধ জাগছে। বাবা বলছিলেন, বৌদি বড় সুন্দরী। কেমন সুন্দরী সেটা দেখতে হয়।

—তুমি যে কোনদিন আসতে পার। দরকার হলে সুজয়কেও আনতে পার।

এর মধ্যে আশালতা ঘুরে গেছে। অনেক গল্প করেছে আশালতা। তার খবর একই চলছে। স্কুলে চাকরি এবং মেয়েকে যথার্থ দাঁড় করানো। আমাদের দেশে মেয়েদের ওপর নির্যাতন হয়। বলতে গেলে ঘর ঘর কা কাহানী। গরিব লোক, মধ্যবিত্ত, ধনীরা, সমাজের সব সেকশনের পুরুষরা স্ত্রীদের উপর অত্যাচার করছে। পিছনে আছে বাড়ির নারীরা। তারা উৎসাহদাতা। এই অত্যাচার মূলতঃ অর্থের কারণে। একটাই কথা, বাপের বাড়ি থেকে টাকা আন। আবার আনো। যাও আবার আন। এ অর্থক্ষুধা কি মিটানো সম্ভব? মেয়ের বাবারা কি টাকা ছাপানোর কল? শুধুই টাকার জন্ম দেবে? এসব বন্ধ হওয়া উচিত। এখনই উচিত। এ অন্যায়। এ পাপ। দেশ ডুবছে। আরো ডুববে। মেয়েদের কি জন্যে বিয়ে দেওয়া হয়? নিশ্চয় সংসার করার জন্যে। তার বদলে কি পায় তারা? প্রহার পায়। মানসিক নির্যাতন পায়। প্রতিবাদ করলে তাদের আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় দেহে, অথবা গলা টিপে শেষ করে দেওয়া হয়। অনেক মেয়ে প্রাণে বাঁচতে নিজের গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়, কাপড়ে আগুন লাগায়। যারা নির্যাতন করে, তারা কি মানুষ? এদেরকে ফাঁসিকাঠে ঝোলানো উচিত। তাহলেই একমাত্র এই নিষ্ঠুরতা সমাজে বন্ধ হবে।

একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছে উদাস। আশালতাকে দেখলে বন্দনার মুখ ভারি হয়ে যায়। কেমন করে যেন তাকায়। তাকে এ্যাভয়েড করে। প্রায় রান্নাঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আশালতাকে চা বিস্কুট ছাড়া আর কিছু খেতে দেয় না। উদাস নিশ্চিত, ঘরের ফ্রিজে মিষ্টি আছে। ভালই আছে। তাহলে সে দেয় না কেন আশালতাকে? তাকে

তার পছন্দ নয়? একথা কি জানে আশালতা? অথবা জেনেও উপেক্ষা করে? সে অন্তরের টানে দেখা করতে আসে উদাসের সঙ্গে, তাকে খাতির করা উচিত, তাকে সম্মান দেওয়া উচিত, তা দেয় না বন্দনা। মনে কষ্ট হয় উদাসের। যিনি বাড়িতে আসেন, তিনি তো নারায়ণ। তাকে কি অসম্মান করা চলে? না চলা উচিত?

উদাস একবার বলেছিল—চল আশালতার বাড়ি বেড়িয়ে আসি বন্দনা। অনেকদিন ধরে বলছে। এই রিক্সাতে যাব, একঘণ্টা কথা বলব, তারপর রিক্সায় ফিরব।

—আমি যাব না।

—কেন?

—যার তার বাড়ি যাই না। ডাকল আর যেতে হবে? তার কোন মানে নেই। নিমন্ত্রণ সে করল, যাব, না যাব, সেটা আমার ব্যাপার। তুমি যাচ্ছ যাও, আমাকে টেন না। আমার ভাল লাগে না। বন্দনার কথা শুনে যেন অন্ধ হয়ে যায় উদাস।

কুন্তির সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। এই যেমন, বাসস্ট্যাণ্ডে, সিনেমা হলের কাছাকাছি বিপনী রামকৃষ্ণ প্রচারপীঠে, সবজি বাজারে, সুপার মার্কেটে, নিউ মার্কেটে, জেলা গ্রন্থাগারের সামনে। যখন দেখা হয়, তাকে দেখে আনন্দের হাসি হাসে কুন্তি। বলে— উদাসদা কেমন আছেন?

—ভাল আছি কুন্তি।

—ঠাকুর আপনাকে ভাল রাখবেন। সবাইকে রাখেন।

—তুমি কেমন কুন্তি? তোমার সন্তান?

—সবাই ভাল উদাসদা। তাঁর কৃপা থাকলে সব অন্ধকার দূর হয়ে যায়। কুন্তি যেন উদাসের শিক্ষক। এক একসময় তাকে বলেছে—রিক্সায় চড়বেন উদাসদা, বাইরে দাড়ি কাটবেন, জুতো পালিশ নিজে না করে, যারা করে তাদেরকে দিয়ে করাবেন।

—কেন কুন্তি? কি কারণে?

—আপনি কাজ না দিলে, পয়সা না দিলে, ওরা খাবে কি করে বলুন? কেমন করে সংসারের হাঁড়ি চড়াবে? ওরা যে গরিব মানুষ, ওদেরকে আপনি দেখবেন না? আপনি চাকরি করেন, ভাল অর্থ রোজগার করেন, নিজের উত্তম ঘরবাড়ি আছে, ওদের কি আছে বলুন? একটা দুঃস্থ লোক হাত পাতলে তাকে একটা টাকা দেবেন না?

—তোমার মতো এমন করে কেউ তো আমাকে বলেনি। সবাই বলেছে, সঞ্চয় কর। খরচ করো না। না কুন্তি, খরচ করার দরকার আছে। তুমি যা বললে, তাই আমি করব ঠিকঠিক। কত ভাব তুমি কুন্তি?

—আমি ভাবি না উদাসদা। তিনি ভাবেন।

॥৩০॥

রাণীর অনুমান যথার্থ। সংসারকে রাণী ভাল বোঝে। উদাস বোঝে না। কথায় কথায় রাণী ইঙ্গিত দিল, প্রথমে তোমার বাড়ি ঢুকবে শ্বশুরমশাই। কিছুদিন পর শাশুড়িমাতা। কোথায় যেন একটা অদৃশ্য প্ল্যান রচিত হচ্ছে। তুমি সাবধান উদাসদা।

—সাবধান হয়ে লাভ নেই রাণী। যা হবে মেনে নেব।

শ্বশুরমশাই এসে গেলেন উদাসের সংসারে। প্রথমে একটু কান্নাকাটি করলেন, নিজের ঘর সংসার ছেড়ে এসেছেন বলে, জামাইয়ের কাছে আশ্রয় নিতে হচ্ছে বলে। উদাস বলল—কাঁদবেন না। কান্নার কি আছে? জামাই তো ছেলের মতো।

—হ্যাঁ বাবা, তা ঠিক, একশবার ঠিক। সব শোক একদিনেই কেটে গেল। ভবেশবাবু স্ফূর্তিতেই থাকতে লাগলেন। উখরায় যখন ছিলেন, খাওয়া পরার অভাব ছিল। এখানে সে দুঃখ দূর হয়েছে।

শ্বশুরমশাইকে শুধু খাওয়া দাওয়া নয়, মাস গেলে হাতখরচাও দিতে হয়। বন্দনা বলে—তুমি না দিলে বাবা পাবেন কোথায়? ঠিক কথা। শ্বশুরমশাই কয়েকটি কাজ করেন। তিনি চেয়ে নিয়েছেন। বিশেষ করে বাজার করা। বিশেষ খুশি হন বাজার করতে দিলে। বাজার করার এত আনন্দ কেন শ্বশুরের, তা বুঝে উঠতে পারে না উদাস। তিনি বলেন— বাবা উদাস, আমি বেকার লোক। বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছি। আমার উচিত তোমার কাজকর্ম করে দেওয়া। আমি থাকতে তুমি বাজার করতে যাবে কোন দুঃখে? বাজার করতে শ্বশুরমশাই ঘণ্টা দুই সময় নেন। এছাড়া টেলিফোনের বিল, লাইটের বিল, রেশন আনা এগুলো তিনি করে থাকেন।

রেল লাইনের ওপারে একটা বুড়োদের ঠেক আছে। একটা বড় গাছকে মাঝখানে রেখে চালাঘর, তার ভিতরে বাঁশ এবং বাতা দিয়ে তৈরি তিনটি বেঞ্চ। সে বেঞ্চে বুড়ো লোকগুলো বসেন। সংসারে বাতিল হয়ে যাওয়া মানুষ সব। অন্ততঃ এক ডজন। সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৮ পর্যন্ত এই প্রবীণদের পাওয়া যায়। ওদের একটা কমিটি আছে। তার মাথায় ভবেশবাবু। দি প্রেসিডেন্ট। শ্বশুরমশাই সেই বেঞ্চে বসে ফুরফুর করে বিড়ি টানেন। এখানে হুকোর ব্যবস্থাও আছে। এক কলসী জল থাকে। পাশে চায়ের দোকান। প্রয়োজনে সেখান থেকে চা আসে, সঙ্গে লেড়ে বিস্কুট। খুব মৌজ করে চা খান শ্বশুরজী, আর তার দুঃখের পাঁচালী বর্ণনা করেন। তবে এখন যে তিনি ভাল আছেন, সুখে আছেন, আনন্দে আছেন, সে কথাও বলেন। তবে কথা হচ্ছে, এত সুখ কপালে সইলে হয়!

বাকী বুড়োরা বলেন, তোমার ভাগ্য ভাল হে ভবেশ, কপাল ভাল, না হলে এমন খাসা জামাই পাও! হাতধরা কন্যা পেয়েছো। ছেলের কথা বাদ দাও। অমন হারামী ছেলে সংসারের ঘরে ঘরে। তোমাকে জামাই আশ্রয় দিয়েছে, আমাদের কে দেবে? ছেলেরা দেবে? কাঁচকলা। সব কেড়ে নিয়েছে। এখন বলছে, সরে পড়। বৌমারা বলে, আর কতদিন বাঁচবেন? আর কতদিন খাবেন? সংসারকে ছাড়েখারে দিচ্ছেন কেন? মরে গিয়ে সমাজ সংসারের উপকার করুন।

—মরণ যে হয় না বৌমা, সে যে আসে না।

—তাহলে নিজেই ব্যবস্থা করুন। সামনে ট্রেনের লাইন রয়েছে। ট্রেন ঢুকবার মুখে, হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেই হল। কচুকাটা। কোন কষ্ট নেই। বুঝতেই পারবেন না। কত সুখ!

—আর দুচারদিন দেখি বৌমা। পৃথিবীটাকে বড় ভালবাসি। সেই ছোট থেকে দেখছি তো। বড় মায়া পড়ে গেছে।

—এই দেখতে দেখতে বয়স বেড়ে যাবে। বয়স হলে মানুষ বিছানায় পড়ে যায়। কত কি রোগ ধরে। তখন কিন্তু সেবা করতে পারব না। চিঁ চিঁ করে মরবেন।

বুড়োরা বলেন—আমরা সংসারে ব্রাত্য জন। না ঘরকা, না ঘাটকা। তাকিয়ে আছি শ্মশানের দিকে। হরি হে মরণ কর—তা সে কখন আসবে? আর কতদিন দেরী করবে? আর যে পারি না প্রভু। দুটো ভাতের জন্যে এত লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, অপমান সইতে পারি না। কেঁদে কেঁদে চোখের জল শেষ। এখন আর কান্নাও আসে না। তুলে নাও ঠাকুর, আশ্রয় দাও, একেবারে স্বর্গীয় নিশ্চিন্ত জীবন।

রাণীর কথা ফলে গেল। একদিন সকালের ট্রেনে, একটা রিক্সা করে বিছানা বালিশ সুটকেশ, টিনের বাক্স নিয়ে হাজির শাশুড়ী-মাতা। বন্দনা বলল—এসো মা, এসো। সে যেন রেডি হয়েই ছিল। শাশুড়ী-মা বললেন—বাবা উদাস, ছেলের কাছে থাকতে পারলাম না। ছেলে-বউমার কি অত্যাচার, কত আর বলব! পৃথিবীতে আমার কেউ না থাক, উদাসবাবা আছে, আমার বড় ছেলে। সবাই আমাকে তাড়িয়ে দেবে, দূর করে দেবে, সে কিন্তু মাতৃজ্ঞানে আমাকে আশ্রয় দেবে। আমি ঠিক বলছি না বাবা?

—ঠিক আছে মা, যতদিন ইচ্ছে আপনার, আপনি থাকুন মা।

—না বাবা, যতদিন ইচ্ছে নয়, চিরস্থায়ী চলে এলাম। এখানেই শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করব। কাছেই শ্মশান শুনেছি। তোমার বাবা অসুবিধা হবে না। শাশুড়ী রিক্সাভাড়া দিতে যাচ্ছিলেন। উদাস বলল—থাক মা, আমি দিয়ে দিচ্ছি।

—বাবার আমার সবদিকে দৃষ্টি। শাশুড়ী খুশি হলেন। এমনি করে তুমি আমার সব খরচ খরচা দিয়ে দিও।

—তাই হবে মা।

—আমি আশীর্বাদ করছি বাবা, যত দিন যাবে তোমার সংসার ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

বন্দনা শাশুড়ীকে উঠানের পাশে নতুন ঘরে তুলল। ও ঘরে শ্বশুরমশাই থাকেন। সেখানে একটাই রুম করতে চেয়েছিল উদাস। বড়। কিন্তু বন্দনা বলল—দুটো কর। বলা তো যায় না কখন কি কাজে লাগে!

—বেশ বন্দনা, তুমি যা বলছ, তাই হবে। তুমি এই ঘরের লক্ষ্মী। তুমিই সব। তোমার উপরে আমি কথা বলতে পারি না।

উদাস ভাবল এখন, তাহলে, তাহলে কি জানত বন্দনা আগে থেকে, এমন একটা ব্যাপার ঘটবে? তার আগাম প্রস্তুতি নিয়েছিল? কে জানে? সংসার এক রহস্যময় জায়গা। একে বোঝা কঠিন। এক দায়।

সংসারের সর্বময় কর্ত্রী বন্দনা। সে তার ইচ্ছেমতো সংসার চালায়। খরচ করে। টাকা শেষ হলে বলে উদাসকে—আমার হাতে টাকা নেই। টাকা দাও। উদাস টাকা দেয়। সে ভাবে, এত কিসে খরচ করে বন্দনা? সংসার তো খুব বড় নয়। তাহলে এত টাকা লাগে কেন? তার মা, কত কম টাকায় সংসার চালাতেন, কত সুন্দর করে চালাতেন। বন্দনা পারে না কেন? সে তো গরিব ঘরের মেয়ে। টাকার মর্যাদা তার বেশি করে বোঝা উচিত। মাসের শেষে বেঁচে যাওয়া টাকা মা ফেরৎ দিতেন উদাসকে। বলতেন—যা বাবা পোস্ট অফিসে জমা দিয়ে আয়।

—মা, তোমার কাছে রাখ না।

—টাকা জমাতে শেখ। আছে বলেই খরচ করে দিবি? টাকা খুব দামী জিনিস বাবা। এলোমেলো খরচা করতে নেই। টাকা জমলে ঠিক একদিন তা উপকারে লাগে। এই টাকার জন্যে লোকে রাস্তাঘাটে কেঁদে বেড়াচ্ছে। এই টাকা ছিল না বলে, আমাদের জীবন কত কষ্টে কেটেছে, কত দুঃখে কেটেছে, ভুলে গেলি বাবা?

—না মা, ভুলিনি। এতটুকু না। সব আমার মনে আছে। কতদিন মা তুমি শুধু ডাল মেখে ভাত খেয়েছ। একটা তরকারী পর্য্যন্ত জোটেনি তোমার। আর চাল বাঁচাতে তুমি যে পেট ভরে খেতে না, তাও জানি আমি। মা কোন কথা না বলে আঁচল তুলে দেন চোখে।

উদাসের মাইনের বৃদ্ধি ঘটেছে আরও। সে তুলনায় তার টাকা জমার পরিমাণ কম। অবশ্য কম তো খরচ হয়নি। বন্দনাকে বিয়ে করার সব খরচ সে বহন করেছে। শ্বশুরকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছে। দোতলা হয়েছে একটা রুমের। উঠানে দুটো রুম, বড় একটা রান্নাঘর, আধুনিক বাথরুম বানিয়েছে। ঘরে জলের অসুবিধা ছিল মায়ের আমলে, এখন জলের প্রাচুর্য। অফুরন্ত। মায়ের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ সেবা

করিয়েছে। সেও তো কম টাকার ব্যাপার নয়। ব্যাঙ্ক থেকে লোন করেছে। করতে হয়েছে। না করলে এত কাণ্ড কি করে সে করবে? রাণী চেয়েছিল, তার কাছে টাকা ধার নিক উদাস। সে নেয়নি। তার মনে হয়েছে, রাণীর কাছে টাকা নেওয়া ঠিক হবে না। দেবেশ দত্তের কাছে চাইলে তিনি দিতেন। মামাবাবু হলেও তার কাছে হাত পাততে উদাস সঙ্কোচ বোধ করেছে। যতই হোক তিনি মালিক। উদাস কর্মচারী। এ ব্যবধান তো থাকবেই। কিছুতেই যাবার নয়। কিছুতেই নয়।

গ্রীষ্মকাল এলে উদাস বলল—কেউ জল নিতে এলে, তাকে জল দিও বন্দনা। কাউকে না বলবে না। তৃষ্ণার্ত মানুষকে জল দেওয়া মহৎ ধর্ম। মানবিক কর্তব্য। ঘরে এখন প্রচুর সুবিধা। ফ্রিজ, গ্যাস সিলিণ্ডার, রুমে রুমে ফ্যান, এমনকি একটা এয়ারকুলার পর্যন্ত। বন্দনা একেবারে গরম সইতে পারে না বলে এত ব্যবস্থা উদাসের।

এতসব জিনিস বন্দনা বাপের বাড়িতে দেখেনি। এখন এগুলো দেখে, এগুলোর মালিক হয়ে, তার মন কি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে? সে কি অহংকারী হযে যাচ্ছে? না হলে পাড়াতে সে গল্প করে কেন, আমার এই আছে, সেই আছে? তোমাদের কি আছে এসব? অহংকার একদম সইতে নারাজ উদাস। সে চিন্তিত হয়। মহাভারতের দুর্যোধনের অহংকারের জন্যে কি দশা হয়েছিল, সকলের সেটা জানা, তবু মানুষ অহংকার করে কেন? কি আশ্চর্য! এসব থেকে মানুষের শিক্ষা নেওয়া উচিত। তবু একশ্রেণির মানুষ নেয় না। যারা নেয় না, তাদের নির্বোধ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে?

কয়েকদিন পর, অন্ততঃ তিনদিন পর, উদাস লক্ষ্য করল, মনার মা, যে রান্না করে সে আসছে না। তার জায়গায় শাশুড়ী রান্না করছেন। উদাস বলল—বন্দনা, মনার মা আসছে না? কেন কি হয়েছে? ও তো কামাই করার লোক নয়। কোন অসুখ বিসুখ? কাউকে দিয়ে খবর নিয়েছ?

বন্দনা বলল—আমি জানি না। খবর নিইনি।

—তাহলে মনার মায়ের একটা খবর নিতে হয়। কি বিপদ আপদ হল দেখতে হয়। আমাকে যেতে হয়।

—ওর খবর নেওয়ার দরকার নেই তোমার।

—কেন? নেই কেন?

—ওকে আমি ছাড়িয়ে দিয়েছি। কথা শুনে উদাসের মনে হল, সে বজ্রপাতের শব্দ শুনল।

—সে কি বন্দনা, ওকে ছাড়ালে কেন? ও তো বেশ ভাল রান্না করে। মানুষটাও ভাল। ওর দোষ কি?

—দোষত্রুটি জানি না বাবা। ওকে দুবেলা খেতে দিতে হচ্ছিল, মাইনে দিতে হচ্ছিল, এখন মা এসে গেছেন। আমি মা রান্না করে নেব। ওকে ফালতু রাখতে যাব কেন? ওকে আমি বিদেয় করে দিয়েছি।

—কিন্তু মনার মা খাবে কি? ওর ছেলে আত্মহত্যা করেছে, দুই মেয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে, ও কোথায় যাবে, কি করবে, ও যে না খেয়ে মরে যাবে বন্দনা।

—তা আমি কি জানি? মরে মরবে। রাস্তাঘাটে এমনি কত লোক মরে পড়ে থাকে। অতশত ভাবলে চলে না। আগে আমি নিজের স্বার্থ দেখব। আপনি বাঁচলে বাপের নাম। চুলোয় যাক মনার মা।

—তাই বললে হয় বন্দনা! ওকে দেখতে হবে না? বিপদের দিনে মনার মা আমাদের বাড়ি এসেছিল। মায়ের মতো রান্না করে খাইয়েছে। দুপুরে ঘরবাড়ি পাহারা দিয়েছে। কোনদিন একটা জিনিস বা একটা টাকাও সরায়নি। অথচ কত অভাবী মনার মা। ওকে বিদায় করা ঠিক হয়নি। একেবারে ভুল কাজ করেছ। অন্যায় করেছ।

তীক্ষ্ণতম গলায় বলল বন্দনা—তাহলে ওর ঘরে যাও। মনার মায়ের পায়ে ধরে নিয়ে এস। ওকে সোহাগ কর। বসে বসে গাণ্ডেপিণ্ডে গিলুক। মাইনে দাও। কোথায় আমার প্রশংসা করবে, ঘরের খরচ কমিয়ে দিলাম, তা নয়, আমার নিন্দে! সংসারে কাব্লুর ভাল করতে নেই। যার ভাল করবে, সেই শত্রু হয়ে যাবে।

বন্দনার কথাবার্তা শুনে হতবাক হয়ে গেল উদাস। এ কার গলা শুনছে সে? এ কি সেই মিষ্টিমুখী, সুন্দরী, প্রেমময়ী বন্দনার গলা? না, তার প্রেতাত্মার? চমকে উঠল উদাস। বন্দনার মা বাবা এই সংসারে খাচ্ছে না? তাদের হাতখরচ যোগাচ্ছে না উদাস? কই বন্দনা কি কোনদিন তাদের বিদায় করে দেওয়ার কথা বলবে? তখন বলবে, আমার মা বাবা খাবে কি? কেন তুমি ওদের দেখবে না? কেন আশ্রয় দেবে না? কেন টাকা দেবে না? দিতেই হবে তোমাকে। তুমি জামাই। এটা তোমার কর্তব্য নয়?

একদিন বলল উদাস—বুঝলে বন্দনা, তোমার ভাই শক্তিমান ঠিক কাজ করছে না। অন্যায় করছে। মা বাবাকে দেখা প্রতিটি সন্তানের কর্তব্য। বাবা মা সন্তানকে মানুষ করেন, কত কষ্ট দুঃখ যন্ত্রণা সয়ে, অনেক সময় নিজেরা না খেয়ে, সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেন। আমার মা আমাকে তরকারি ভাত দিতেন, নিজে খেতেন শুধু ডাল ভাত, এগুলো কি আমি কোনদিন ভুলতে পারব? কোন সুবাদে মা বাবাকে দেখবে না সন্তান? কি কারণে?

—আমার ভাই খারাপ ছেলে নয়। যাকে বিয়ে করেছে, আলতা, ওই খারাপ। ওর বাবাটা শয়তান। আলতা বড় ডেঞ্জারাস মেয়ে। মুখরা। কথায় কথায় ঝগড়া

করে। গালাগাল দেয়। খিস্তি করে। নাটক করে। মানুষকে ধরে মারে। ওর তিন দাদা, বাবা, সবাই ক্রিমিন্যাল। চুরি-ডাকাতি করে পয়সা করেছে। একাধিক খুনের সঙ্গে জড়িত।

উদাসের বলতে ইচ্ছে হল—তোমার ভাই শক্তিমান কি এমন ভাল! সেও তো গুণ্ডা, ছিনতাই করে, তোলা আদায় করে, বোমা তৈরি করে। কিন্তু এসব কথা তো বন্দনাকে বলা সম্ভব নয়। তাহলে বন্দনা দুঃখ পাবে। উদাস কাউকে দুঃখ দিতে চায় না। নিজে প্রচুর দুঃখ পায়। সব সহ্য করে নেয়। কাউকে পাল্টা আঘাত করে না। ওর বিবেকে লাগে।

রাণীকে বলল উদাস। রাণী বলল—তোমার অনুমতি ছাড়া, মনার মাকে কেন ছাড়িয়ে দিল বন্দনা? এটা ওর ঠিক হয়নি। মাকে দিয়ে রান্না করাচ্ছে, আমি ঠিক জানি, মনার মায়ের মাইনের টাকাটা ওর মাকে দেবে। ওর মা চাইবে, আর ও ঠিক দেবে। এটা একটা গোপন চুক্তি।

—কি বলছিস রাণী? এ যে অবিশ্বাস্য।

—এখন দেখছি, বন্দনার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে ভুল কাজ করেছি আমি। বন্দনাকে আমি সরল মেয়ে বলে ভাবতাম, এখন দেখছি খুব জটিল মেয়ে। কেমন বাবা মাকে ডেকে এনে তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিল, এখন ওদের বোঝা সারাজীবন টান তুমি। ও ভাইকে বাঁচাল।

—না, না, রাণী। বন্দনা ডেকে আনবে কেন? ওরা দুজন ছেলে বউয়ের অত্যাচার, অপমান সইতে না পেরে, আমার কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। আমি আশ্রয় না দিলে কোথায় যাবেন ওঁরা। ফুটপাতে ভিক্ষা করবেন?

—অত সহজ ব্যাপার নয় উদাসদা। আমার তো মনে হয়, গোটাটা গট আপ গেম। একটা প্ল্যান। না হলে তোমার উঠানের জায়গায় একটা বড় রুম করার কথা, সেখানে বন্দনা বলল, না একটা নয়, দুটো রুম কর। কেন বলল একথা? কোন উদ্দেশ্য ছিল নিশ্চয়। না উদাসদা, নিজেকে অপরাধী লাগছে। তোমাকে সুখী করতে গিয়ে আমি দুঃখী করে দিলাম।

—না, না, রাণী, দুঃখ করিস না। বন্দনা ভাল নয় কে বলল? বন্দনা ভাল। বেশ ভাল।

—বন্দনা ছাই ভাল। বউকে বাঁচাচ্ছ। এত ভালবাস তুমি বন্দনাকে? তুমি আশালতা, জুঁই, আমাকে এর সামান্য অংশ যদি ভালবাসতে, আমরা সবাই ধন্য হয়ে যেতাম। তা তুমি পারলে না কেন? দূরে রেখে দিলে কেন আমাদের উদাসদা? তোমার মতো ভালমানুষ সংসারে হয় না। কত ধৈর্য, কত সহিষ্ণু তুমি। কই আমি তো এতটা নই। বুবুনও বোধহয় এতটা নয়।

—রাণী, একবার মনার মায়ের কাছে যাওয়া উচিত আমার বল? ওর একটা খোঁজ নেওয়া আমার কর্তব্য। এখন মনার মা কি করছে, কি খাচ্ছে, কেমন আছে, জানা প্রয়োজন। তুই কি বলিস?

—বেশ তো যাও না উদাসদা। না গেলে, না খোঁজ নিলে, তুমিই কষ্ট পাবে। মনার মা যা কষ্ট পাচ্ছে, তার থেকে তোমার কষ্ট বেশি।

—মনার মা কোথায় থাকে রাণী? জায়গাটা আমাকে বুঝিয়ে দে। রাণী বুঝিয়ে দিল।

বিকেলে দেখা করল উদাস। ওর কুঁড়েতে দেখা করল। নামেই ঘর, আসলে ধ্বংসস্তূপ। গরিবের দেশ ভারতবর্ষ। দুঃখের দেশ ভারতবর্ষ। এসব এলাকায় এলে, সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। চালে খড় খুবই কম। যেটুকু আছে সেটা জরাজীর্ণ। বোঝা যায়, দিনে ঘরে রোদ ঢোকে, জ্যোস্নার রাত্রে আলো, এ আলো আনন্দের নয়, বেদনার। দরজা একটা আছে বটে, সেটা ভাঙাচোরা টিনের, তবে একটা লাথি মারলে, তা মহাকাশে বিলীন হয়ে যাবে। এই ঘরটা মনার মায়ের প্রতীক যেন। মানুষ যেখানে বসবাস করতে পারে না, অযোগ্য স্থান, সেখানে আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ বসবাস করে। মনার মা ঘরেই ছিল। সে বলল—উদাসবাবা তুমি? তুমি আমার খোঁজ নিতে এসেছ! আহা কি ভাগ্যি আমার।

—তুমি কেন কাজ ছেড়ে দিলে মনার মা?

—না ছাড়লে চলছিল না। আমাকে বাধ্য করা হয়েছে। প্রতিদিন দুপুরে, যখন তুমি কাজে চলে যেতে, তখন তোমার বউ বন্দনা আমার সঙ্গে ঝগড়া করত। আমাকে আধপেটা খেতে দিত। মুখ ঝামটা দিত। বলত, বের আমার ঘর থেকে মাগী। বলত, তোর ছেলে মরেছে বেশ হয়েছে, এবার তুই মর। কতদিন আর সহ্য করব। সবের তো একটা সীমা আছে।

—তা ঠিক মনার মা, সহ্যেরও একটা সীমা থাকে। তার বাইরে সহ্য করা যায় না। ঠাণ্ডা রক্ত আগুন হয়ে ওঠে। তা মনার মা, তুমি আমাকে বললে না কেন?

—তাতে কি হতো উদাসবাবা? তোমার বউ তোমার সঙ্গে ঝগড়া করত। তোমাকে অশান্তি দিত। সে আমার সহ্য হত না। তোমার শাশুড়ী ভাল লোক নয়, বড় সেয়ানা। মেয়েকে উস্কে দেয়। খুব সাবধান উদাসবাবা, তোমাকে ওরা ফকির করে ছাড়বে।

—তুমি এখন কি করছ মনার মা? কোন কাজ?

—আমি, আমি আবার একটা রান্নার কাজ পেয়েছি। বড় ঘর। অনেক লোকজন। সকাল সাতটায় যেতে হবে। বিকেলে রুটি গড়ে দিয়ে সন্ধ্যা ছ'টায় ছুটি। দুবেলা

খাওয়া দাওয়া। মাইনে। বছরে তিনখানা কাপড়। তেল সাবান। অসুখ করলে ডাক্তার দেখাবে। ওষুধ দেবে। তুমি আমার জন্যে ভেব না উদাসবাবা। আমার ঠিক চলে যাবে। আর বাঁচবই বা কতদিন! মরণ হলেই ভাল। আমার বেটার কাছে চলে যাব। তার জন্যে বসে আছি। ভগবান যে কবে ডাকবে!

উদাস পকেট থেকে কিছু টাকা বের করল। মনার মার হাতে দিল। একরকম জোর করেই দিল। মনার মা বলল—আমাকে টাকা দিচ্ছ কেন বাবা? টাকা নিয়ে আমি কি করব?

—কেন মাসি, ফল খাবে, মিষ্টি খাবে, ভাতের চাল কিনবে। গরম গরম ভাত খাবে। শরীরে জোর পাবে।

—টাকা দিচ্ছ, এসব জানলে তোমার বউ অশান্তি করবে। কুরুক্ষেত্র করে ছাড়বে।

—এ তো আমার রোজগারের টাকা। পরিশ্রমের টাকা। আমার টাকা আমি যা খুশি করতে পারি। যাকে খুশি দিতে পারি। বন্দনা বলার কে? এই টাকা কি ওর বাপের বাড়ির টাকা! মাসি, তুমি আমার মায়ের মতো। মা মারা গেলে, তুমি আমাকে রান্না করে খাইয়েছ, কত যত্ন করেছ, ভালবেসেছ। আমি কি সেসব ভুলতে পারি? তোমাকে ছাড়িয়ে বন্দনা খুব অন্যায় করেছে। আমি কষ্ট পেয়েছি মাসি। দুঃখ পেয়েছি।

—আমি তা জানি বাবা। মনে কষ্ট রেখ না। আমি তো কাজ পেয়ে গেছি। একটা তো পেট, ঠিক চলে যাবে। তোমার শরীর অনেক খারাপ হয়ে গেছে বাবা উদাস। শরীরের প্রতি যত্ন নিও। মনে অশান্তি রেখ না।

—মাসি, এখন আমি যাই। আমার কাজ আছে। আবার আসব।

—ঠিক আছে বাবা। আবার এসো। যখন ইচ্ছে করবে, চলে এস।

—তোমার হাতের রান্না একদিন খাব মাসি।

—সে তো আমার সৌভাগ্য বাবা।

বন্দনা আজকাল অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে এমন? এখন সে মায়ের পাশে পাশে থাকে সবসময়। তার সঙ্গে গল্প করে। মাকে নিয়ে বাজারে যায়। জিনিসপত্র কেনে। সিনেমায় যায়। সঙ্গে মা। আগে সব ব্যাপার বলত উদাসকে, সব ঘটনা, তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ও, এখন বলে না। আগে বলত—এই তো ঘটনা, আমি কি করি বল তো? উদাসকে বন্দনা এড়িয়ে চলছে এখন। কিন্তু কেন? মাকে গুরু করেছে বন্দনা। বাবাকে ভগবান। কথা কম বলছে বা বলছে না। তবে হাতের টাকা ফুরালেই বলে—টাকা দাও। আরও টাকা চাই আমার।

—এত টাকা কি কর বন্দনা?

—কেন সংসারে খরচ নেই? হাওয়াতে চলবে সংসার? বাতাস খেয়ে বাঁচবে? টাকা বের কর বলছি।

—এত টাকা নিলে, এত খরচ করলে, চলবে কি করে? আমার তো টাকার গাছ নেই।

—টাকার গাছ লাগাও তুমি। আগের থেকে ঘরে লোক বেড়েছে। তাদের আদরযত্ন আছে, টাকা লাগবে না? টাকা ছাড়া কি হয় সংসারে? শ্বশুর-শাশুড়ি যথেষ্ট আরামে আছেন। তাদের আহার বেড়েছে। শরীর ভাল হচ্ছে। চেকনাই দিচ্ছে। মাছ মাংস ডিমের ছড়াছড়ি। তাছাড়া ফলমূল। শ্বশুর-মশাই ভিটামিন ট্যাবলেট খাচ্ছেন। ভিটামিন সি। ভাল ভাল ধুতি শাড়ি পরণে। তাঁদের সুখের বন্যা বইছে। খরচ তো হবেই।

এর মধ্যে একদিন ভবেশবাবু বললেন।

—বাবা উদাস কুমার।

—হ্যাঁ বাবা, বলুন।

—ইয়ে, এ মাসের ইংরেজি ১৮ তারিখে আমার জন্মদিন। আমাদের বুড়োর ঠেকের সদস্যরা ধরেছে, তারা সেটা পালন করবে, আমি তো সভাপতি। আমাকে ফুল দেবে। মিষ্টি দেবে।

—এ তো ভাল খবর। তা পালন করুন না কেন? আমি আপনাকে একটা ভাল ধুতি দেব। রাণীর দোকানে ভাল ভাল ধুতি পাওয়া যায়।

—সে না হয় দিলে। কিন্তু যারা আসবে, তাদের একটু খাওয়া-দাওয়া করাতে হবে তো?

—বেশ তো। টিফিনের ব্যবস্থা থাকবে।

—তা টিফিন দিলে হবে না বাবা। পেট পুরে খাওয়াতে হবে। এই ধর, মাংস, ঘুগনী, লুচি, সন্দেশ, পায়েস, দই—এইসব আর কি।

—কতজনকে খাওয়াতে চান?

—এই ধর ২০/২৫ জন। তার বেশি যাব না। তোমার খরচ হয়ে যাবে অনেক।

—মেয়েকে বলেছেন?

—বলেছি! তা মেয়ে বলল, আমি জানি না। তোমার জামাইকে বল। টাকা কি আমি দেব? দেবে তোমার জামাই। আরে বাবা, জামাই হচ্ছে ছেলের মতো বা তার থেকেও বেশি। সে কি না করবে! উদাস তা করতেই পারে না। সে কর্তব্যপরায়ণ ছেলে। উদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—ঠিক আছে বাবা, তাই হবে। আপনি যা চান, যা আপনার ইচ্ছে, তাই হবে। আপনি নিমন্ত্রণ করে দিন, কি কি খাওয়াবেন, তার একটা লিস্ট করে দিন। আমি বুবুনকে দিয়ে সব ব্যবস্থা করে দেব।

—না বাবা, বুবুনকে দিয়ে নয়, সব বাজার করব আমি। তুমি শুধু বিল মেটাবে।

—বেশ তাই করবেন।

—হেঁ হেঁ, এই না হলে জামাই! বহু তপস্যা করলে এই ধরনের জামাই মেলে। তাহলে যাই বাবা। তুমি অনুমতি দিয়েছ, এইবেলা ঠেকের বুড়োদের নিমন্ত্রণটা করে আসি। এসময় সবাইকে পাওয়া যাবে। শ্বশুরমশাই হৃষ্টচিত্তে চলে গেলেন আড্ডাস্থলে। বন্দনাকে বলল উদাস—উখরাতে কি তোমার বাবা জন্মদিন পালন করতেন? লোককে নিমন্ত্রণ করে পাত পেড়ে খাওয়াতেন।

—একদম না। পয়সা কোথায় বাবার? খরচ নেই? শুধু মা একবাটি পায়েস করতেন। আমরা সবাই ভাগ করে খেতাম।

—তোমার বাবা সমারোহে জন্মদিন পালন করতে চাইছেন। লোক খাওয়াবেন।

—বাবা বলছিলেন আমাকে। আমি বললাম, ঘরের মালিক আমি নই। তোমার জামাইকে বল। তুমি রাজি হয়েছ?

—তোমার বাবা যখন, আমার গুরুজন যখন, তখন রাজি হতেই হয়। না হলে তাঁকে অপমান করা হয়।

এরপর উদাস সাইটে যাবার প্রস্তুতি শুরু করল। স্নানও করল। ভাত খেল। শাশুড়ী থালাতে ভাত সাজিয়ে টেবিলে দিয়ে গেলেন। একটি ভাজা, দুটি তরকারি, ডিমের ঝোল, একটু চাটনি। ডিম উদাসের প্রিয়। খুব তৃপ্তি করে ভাত খেল উদাস। সে যা খায়, তা প্রসন্ন মনেই খায়। তারপর বাস ধরার জন্যে স্টেশন বাজারের মোড়ের স্টপেজে দাঁড়াল। কাঁধে তার সাইড ব্যাগ। তার ভিতরে চামড়ার ব্যাগ। ওর মধ্যে থাকে চশমা, একটা কলম, প্যাড,একটা মোবাইল। আর একটা ডায়েরী। একটা পান খেল উদাস। নেশা নয়। পান চিবতে চিবতে বাস দৌড়ে এল। এক্সপ্রেস বাস। ক্লীনার বলল—বাঁধকে। জেনানা হ্যায়। উদাস বলল মনে মনে—কিস্‌কা জেনানা?

॥৩১॥

একটা নতুন সাইকেল কিনল উদাস। বাবার সাইকেলটা অচল হয়ে গেছে। সারাচ্ছে। কয়েকদিন পর আবার ভগ্নদশা। অকারণে পয়সা খরচ। উদাস ঠিক করল, বাবার সাইকেলটা সে অবসরপ্রাপ্ত করে দেবে। চিরকাল তো কোন জিনিস চলে না। সবার ক্ষয় আছে। যেমন মানুষের, তেমন যন্ত্রের। সবের মরণ ঘটে। পুরনো সাইকেলটা বিক্রি করে লাভ নেই। কতই বা দাম মিলবে? তার থেকে কাউকে দান করা ভাল। কোন অভাবী মানুষকে দিয়ে দেবে। অভাবী মানুষের অভাব নেই। চারপাশে। সর্বত্র তাদের দেখা মেলে। দানের মধ্যে একটা আনন্দ আছে। নতুন সাইকেল দেখে বলল বন্দনা—সাইকেল কেনার কি দরকার? একটা হিরো হণ্ডা কিনতে পারতে। তাতে

সবাই চড়তে পারতাম। উদাস বলল গম্ভীরভাবে—মোটর সাইকেল নয়, একেবারে চারচাকা কিনব ভাবছি।

—সত্যি! বন্দনার চোখ চকচক করে উঠল। কণ্ঠে খুশির হাওয়া। কবে কিনবে গো? কবে সেইদিন আসবে!

—যখন কিনব, তখন দেখতে পাবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিনব।

—উঃ কি মজা! ভাবতেই পারছি না। জানো, আমার অনেকদিনের শখ। বহুদিনের বাসনা। তুমি গাড়ি চালাবে। আমিও শিখে নেব চালাতে। তারপর তুমি আমি বাবা মা সেই গাড়িতে চড়ে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়াব, ভাবতে শরীরে আমার শিহরণ হচ্ছে। কি যে আনন্দ হচ্ছে, আমার ভাষা নেই। বলতে পারছি না।

উদাস কি সত্যিই গাড়ি কিনবে? না, তার গাড়ি কেনার কোন প্ল্যান নেই। মোটর সাইকেলও না। তার দরকার নেই। তাহলে সে বলল কেন? স্রেফ একটা মজা করতে। মাঝে মাঝে কি মজা করতে ইচ্ছে করে না! কিন্তু মজা করতে গিয়ে সে ফেঁসে গেল। প্রায় বলে বন্দনা--কি গো, গাড়ি কেনার কতদূর?

—ঠিক আছে। দেখছি। দেখছি।

—মাকে বলেছি। মা বললেন, তাহলে তো দারুণ ব্যাপার হয়। যখন তখন উখরা যাব। আবার একদিনেই ফিরে আসব। আমার দুকূল বজায় থাকে।

ওদিকে শ্বশুরমশাই ব্যাপারটাকে ঘোল করে দিলেন। বাজারে কথাটা ছেড়ে দিলেন। বলে বেড়ালেন—জামাই আমার গাড়ি কিনছে। যে সে গাড়ি নয়। একেবারে পাক্কা বিদেশী। কিনবে নাই বা কেন! হাজার হাজার টাকা রোজগার। জামাইয়ের কাছে কয়েক লাখ টাকা কিছু নয়। হাতের ময়লা বলতে পার। জামাইয়ের গাড়ি মানে তো আমারও গাড়ি। এবার প্রতিদিন বিকেলে হাওয়া খেতে যাব। ঠেকের বুড়োরা আকুল হয়ে বলে—তাহলে ভবেশদা, সভাপতিমশাই, আমাদের কি হবে? এই আড্ডার কি হবে?

—সবই ঠিক থাকবে। কোন চিন্তা নেই। পালা করে তোমাদেরকে সঙ্গে নেব। বিনি পয়সায় হাওয়া খাবে হে। দাঁতহীন বুড়োরা, হা হা করে হাসে। বলে—উঃ কি সুখ! কি সুখ!

বুবুন বলল—উদাসদা, তুমি বিদেশি মডেলের গাড়ি কিনছ? মানে চারচাকা?

—কে বলল এসব তোকে?

—রাণীদি বলেছে।

—কই রাণীকে এসব তো কিছু বলিনি! সে জানল কি করে?

—ভবেশবাবু বলেছেন রাণীদিকে। দিদি থেকে আমি। তুমি কি সত্যি গাড়ি কিনছ? কয়েক লক্ষ টাকা দাম কিন্তু।

—জানি বুবুন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি। না বুবুন, আমি গাড়ি কিনছি না। কিনলে প্রথমে তোকেই বলতাম। পয়সা কোথায় বল? আর কেনার দরকারটাই বা কি? বিয়ে করতে, বাড়ি করতে সব জমানো টাকা শেষ। শাশুড়ি-শ্বশুরকে টানতে হচ্ছে। খরচ বাড়ছে। জিনিসপত্রের কত দাম! সব তো দেখছিস? এখন আমার শুধু মাইনে ভরসা।

—তাহলে কথাটা উঠল কি করে? জন্মাল কিভাবে?

—সে এক মজার ব্যাপার। কথার কথা। ইয়ার্কি ধরতে পারিস। আচ্ছা, তোকে বলব সব।

ইতিমধ্যে এসে গেল ১৮ তারিখ। ভবেশবাবুর জন্মদিন। পালিত হল মহাসমারোহে। অনেক, তা প্রায় ২৫ জন বৃদ্ধ, অতি বৃদ্ধ এসে গেলেন। দাঁত নেই। প্রায়জনের চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ। শরীর বেতালা। লাঠি ভরসা। ভবেশবাবু বড় সেজেছেন। বিয়ের মতো কপালে চন্দনের ঘেরাটোপ। সেন্টের গন্ধ। গরদের পাঞ্জাবী। ধাক্কা পাড় ধুতি। ধুতি দিয়েছে উদাস। পাঞ্জাবী বন্দনা। বাইরের ঘরে খাটের উপর আলো করে বসে আছেন ভবেশবাবু। বুড়োরা একে একে এগিয়ে এসে বলতে গেলে লাইন দিয়ে. ভবেশবাবুর কপালে চন্দনের ফোঁটার টিপ পরিয়ে দিলেন। ভবেশবাবু গলা বাড়িয়ে দিলেন। মালা পড়ল একাধিক। হাতে ফুলের তোড়া জুটল। কিছু কিছু উপহার। এক বুড়ো লাঠি উপহার দিলেন। সেটা নিতে ভবেশবাবুর মুখ বেঁকে গেল। বোঝা গেল, তিনি প্রসন্নচিত্তে নিচ্ছেন না। একপাশে অবহেলে সেটা সরিয়ে দিলেন। লাঠি ব্রাত্য হল। এরপর বুড়োরা ভবেশবাবুকে গোলাকার ঘিরে নাচতে নাচতে গান গাইলেন—হ্যাপি বার্থ ডে টু ইউ। সে নাচ দেখার মতো। কোমর দুলিয়ে নাচ। রাণী এবং তরুণ ও বুবুন নিমন্ত্রিত ছিল। রাণী বলল—উদাসদা বুড়োদের কাণ্ড দেখ। সিনেমাতেও এত হয় না। উদাস বলল—এটা সিনেমাই। ভাল করে দেখ। চিত্ত ভরে উঠবে। বন্দনা বাবাকে প্রণাম করল। শাশুড়ী তার স্বামীকে। অগত্যা উদাসও। হাসি পাচ্ছে তার। কিন্তু তার হাসার উপায় নেই। রাণী হাসছে। তার পেটে খিল ধরে যাচ্ছে। বিরক্ত হচ্ছে বন্দনা। সে বলল—এত হাসছ কেন রাণীদি? বুড়ো হয়েছে বলে আনন্দ করবে না? তরুণ বলল—সে তো ঠিকই। হাসি থামাল-রাণী। সে ব্রেক কষতে জানে।

এরপর বুড়োরা খেতে বসলেন। কানা উঁচু শালপাতায় পড়ল গরম গরম লুচি, আলুর দম, মাংসের ঘুগনি, পুরু মুগের ডাল। সবার শেষে সন্দেশ। পরিবেশনে বন্দনা, শাশুড়িমাতা এবং রাণী। সে বসে থাকার মেয়ে নয়। সব ব্যাপারে এগিয়ে যায়। এক বুড়ো হঠাৎ বললেন—ভবেশদা, একটু আইসক্রীম হবে না? খেতে বড়

সাধ জাগছে। কবে পটল তুলব ঠিক নেই। একটু যদি পাই—বড় করুণ তাঁর কণ্ঠস্বর। বেদনায় ভরা। ভবেশবাবু তাকালেন উদাসের দিকে। বললেন—বাবা উদাসকুমার।

—ঠিক আছে। আমি আনছি। বুবুন বলল—না উদাসদা, তোমাকে যেতে হবে না। আমার চেনা দোকান আছে। কিছু কম দাম নেবে।

—ঠিক আছে। তাহলে তুই যা। চটপট বেরিয়ে পড়ল বুবুন। ১৫ মিনিটে ফিরে এল। ব্যাগের মধ্যে আইসক্রীম। বুড়োরা কোলাহল করে আইসক্রীম খেতে লাগল। বারবার লুচি, মাংসের ঘুগনি, সন্দেশ দিতে দিতে বন্দনা, শাশুড়ীমাতা ক্লান্ত হয়ে গেলেন। বন্দনার চোখেমুখে ঘাম। ভবেশবাবু বললেন—তা কেমন হচ্ছে তোমাদের? একটু বল?

—চমৎকার। দারুণ। জবাব নেই। সাড়া এল। এক বুড়োর দুচোখে ছানি। তিনি তেমন দেখেন না। হাতড়ে হাতড়ে খেলেন। সর্বাধিক। একজন বললেন—বল সবে, ভবেশবাবু কি?

অন্যরা বলল—জয়।

—আসছে বছর।

—আবার হবে। বারবার হবে। এইরকম উল্লাস হাসি ঠাট্টা গল্পগুজবে কেটে গেল তিন ঘণ্টা। সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত্রি দশটা। সবাই চলে গেলেন। এগিয়ে দিতে গেল বুবুন। বুড়োগুলোকে ঠিকঠাক পৌঁছে দিতে হবে তো!

উদাস ভাবল, খরচ হল বটে, তা বলে আনন্দও তো কম হল না! শুধু প্রতিদিনের দুঃখ নিয়ে বাঁচা যায় না। মাঝে মাঝে আনন্দও দরকার। তাকে ডাকতে হয়। না হলে সে আসবে কেন?

সাইটে বলল বুবুন—শোন উদাসদা, আজ বাস ধরার আগে দেখলাম, তোমার বিখ্যাত শ্যালক, কি নাম যেন, হ্যাঁ শক্তিমান, তোমার বাড়ির দিকে যাচ্ছে। হাতে একটা ব্যাগ।

—ঠিক দেখেছিস তুই?

—ঠিক দেখেছি। শক্তিমানকে চিনি না? মাথায় ঝাঁকড়া চুল, হাতে বালা, গালে দাড়ি, চেহারা গুণ্ডা গুণ্ডা, ওকে যে একবার দেখবে, সারাজীবন মনে রাখবে।

—কি মতলবে এল কে জানে! ওর তো আসার কথা নয়। বাড়ি ফিরে জানতে হবে। দেখতে হচ্ছে ব্যাপারটা।

বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে বলল উদাস—বন্দনা শোন। এল বন্দনা। এতক্ষণ রান্নাঘরে ছিল। সে এসে বলল—কিছু বলছ?

—হ্যাঁ। আজ শক্তিমান এসেছিল দুপুরে?

একটু চুপ করে রইল বন্দনা। কি যেন ভাবল। তারপর বলল—এসেছিল।

—কি ব্যাপার?

—ব্যাপার কিছু নয়। বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। মা বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়।

—এতো ভাল কথা। আনন্দের খবর। তা তোমার বাবা মা কি বলছেন?

—খবরটা মোটেই আনন্দের নয়। মা বললেন, আলতা কোন প্ল্যান এঁটেছে। সহজ মেয়ে নয় আলতা। ওর কোন উদ্দেশ্য আছে নিশ্চিত।

—কি উদ্দেশ্য?

—মায়ের মতো আমারও মনে হয়, কোন কুমতলব। দেখবে হয়তো, বাবা মাকে উখরা নিয়ে গিয়ে মিষ্টিকথায় ভুলিয়ে, হাতে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে, উখরার ভাঙাচোরা বাড়িটা নিয়ে নিতে চায়। আলতার বাবার টাকার অভাব নেই। সেই টাকাপয়সা দেবে। তারপরে বাবা মাকে ঘাড় ধাক্কা।

—তোমার মা বাবা রাজী হবেন কেন?

—মিষ্টিকথায় না হলে তখন ছুরি বের করবে। খুনের ভয় দেখাবে। লিখে দেবে না মানে, পেটে ছোরা ঢুকিয়ে দেব। বাবা মা দুজনের মৃত্যুভয় খুব।

—তাহলে তোমার বাবা-মার উখরা গিয়ে কাজ নেই। গেলে যখন বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে, তখন তা এড়িয়ে চলাই উচিত।

—বাবা বললেন, যাব না। শক্তিমান পারে না এমন কোন কাজ পৃথিবীতে নেই। সে পেশাদার গুণ্ডা। তার সঙ্গে আছে আলতা, তার সঙ্গে আলতার বাবা। উখরাতে সবাই ওকে ভয় পায়। এক নম্বরের মাফিয়া। আর আলতার কি মুখ! কি ঝগড়াটে, ঝগড়া এত ভালবাসে তুমি চিন্তা করতে পারবে না।

কলহপ্রিয়া নারীকে বড় ভয় করে উদাস। সুন্দরী নারী যখন ঝগড়া করে, তখন সে অসুন্দরী হয়ে ওঠে। কুৎসিত দেখায়। তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। যে সংসারে কলহপ্রিয়া নারী থাকে, সেখানে শান্তি নামক বস্তু উধাও। সেখানে দেবী অন্নপূর্ণা ভয় পান। তিনি গৃহত্যাগ করেন। মেয়েরা যেমন সংসারের লক্ষ্মী, পরিবারের সৌন্দর্য, আবার কোন কোন নারী শ্মশানপেত্নী। কে না ভয় পায়?

কিছুদিন পর আলতা এল। একা। এই তার প্রথম পা দেওয়া। তাকে প্রথম দেখল উদাস। মোটাসোটা। বেঁটে। কালো। দাঁত উঁচু। চেহারায় পুরুষআধিক্য। ঠোঁট পুরু। মোটেই সুশ্রী নয়। চোখ চঞ্চল। তা সবসময় রাউণ্ড খাচ্ছে। এসে শ্বশুর-শাশুড়ীর মন ভেজাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদল।

বলল—আমাকে আপনারা নিজগুণে ক্ষমা করে দিন। অনেক অকথা কুকথা বলেছি। ঝগড়া করেছি। আপনার ছেলে তার জন্যে আমাকে খুব মেরেছে। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে। আমি শুধু আপনাদের বৌমা নই, মেয়েও বটে। দয়া করুন। ফিরে চলুন উখরা। আমি আপনাদের মাথায় করে রাখব। আমার বাবার দিব্যি। শ্বশুর-শাশুড়ী চুপ। রা'টি কাড়লেন না। আলতা হাত জোড় করে বসে আছে। এত ভক্তি কেন? উদাসের মনে হল, সবটাই অভিনয় আলতার। তা অভিনেত্রী ভালই। এখন দর্শকরা নিলে হয়! আলতা পরে বলল—জামাইবাবু, আপনি ওঁদের একটু বুঝিয়ে বলুন না?

—বলছ, ঠিক আছে বলব। তবে আজ না। রয়ে সয়ে পরিস্থিতি বুঝে কথাটা পাড়তে হবে। আজ তুমি থেকে যাও আলতা। কাল সকালে যাবে।

—না জামাইবাবু, থাকা যাবে না। ওর আবার সকাল থেকে জ্বর এসেছে। মাথায় যন্ত্রণা। এবেলা থাকছি। খাওয়াদাওয়া করে তিনটের ট্রেনটা ধরব। রাত্রে ওকে আজ রুটি করে দেব। তাই কত খায়। এইসব বলে দুপুরে মাছভাত তরকারি বিপুলভাবে খেয়ে বিদায় নিল আলতা। উদাস বলল—আবার এসো আলতা।

—ঠিক আসব। আমাকে তো আসতেই হবে। মা বাবা এখানে, উখরার বাড়ি শূন্য, সেখানে কি থাকা সম্ভব? মন বসে? মাঝে মাঝে আসব। ওঁদের না নিয়ে যেতে পারলে মন ভরবে না। অনেক অন্যায় করেছি, গালমন্দ দিয়েছি, এখন ভুল বুঝতে পেরেছি। বড় কষ্ট জামাইবাবু। বলতে বলতে আলতা চোখের জল বের করে ফেলল।

—আহা হা, কাঁদছ কেন আলতা। ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোমার কেসটা আমি দেখছি।

আলতা চলে যেতে, বাইরের দরজা বন্ধ করে, ফিরে এসে বলল বন্দনা—ঢং দেখলে? কি রকম অভিনয় করে গেল! ওঃ মেয়ে বটে একখানা! একটা চীজ। ওকে দেখলে আমার হাড়-পিত্তি জ্বলে যায়। তুমি ওকে আবার আসতে বললে কেন?

—না বললে খারাপ দেখায়। মন থেকে বলিনি।

বন্দনা বলল—তোমার তো সবার কাছে ভাল সাজা। উদাসের মতো মানুষ হয় না। এসব তোমার আর এক ঢং বুঝলে? উদাস চুপ করে থাকে। তার মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে, রাণী যখন খুব হাসছিল, জন্মদিনে বুড়োদের কাণ্ডকারখানা দেখে, হাসতেই পারে সে, ব্যাপারটা তো হাসির, তখন কি বলল বন্দনা, এত হাসছ কেন রাণীদি, এতে হাসির কি আছে? একথাটা বলা বন্দনার কি ঠিক হয়েছে? উচিত হয়েছে? না, হয়নি। রাণী নিশ্চয় আহত হয়েছে মনে মনে। চাপা

স্বভাবের মেয়ে। দুঃখটা কাউকে বুঝতে দেয়নি। কিন্তু উদাস ঠিক বুঝেছে। ঠিক আছে, সে উদাসের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে পারে, উদাস তা মেনে নেবে, আজকাল প্রায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল নয়। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, গালমন্দ, হাতাহাতি, রেষারেষি এসব আছে, তারপর আছে কোর্টকাছারী, থানা পুলিস, মামলা ডিভোর্স, কি যে সব চলছে সমাজে, এসব করলে যা হয়, তলায় তলায় সমাজে ভাঙন ধরছে। রাণীকে দেখতে পারছে না বন্দনা। কিন্তু কেন? বন্দনা কি জানে না, তার বিয়ের মূলে রাণী? তার তো একটা কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত! তল খুঁজতে চেষ্টা করে উদাস। পায় না।

এমনি করে দিন যায়। চাইলে যায়। না চাইলেও যায়। দিনরাত্রি, মহাকাল তো কাব্রুর মুখ দেখে পথ হাঁটে না। সে আপন ছন্দে, আপন নিয়মে চলে। এর মধ্যে কার ভাল হল, কার মন্দ হল, কে উঠল, কে পড়ল, কে বাঁচল, কে মরল, এতে তার কি আসে যায়? সামান্যতমও না।

বন্দনা আসন্নপ্রসবা। তার চেহারা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। চোখের চারপাশে কালি। দুর্বল শরীর। ও যে সুন্দরী বউ, এখন দেখে তা মনে হয় না। মনে হয়, জীবনের অনেক পথ হেঁটে বন্দনা এখন ক্লান্ত, বিপর্যস্ত। এখন সে বিশ্রাম চায়। এখন বন্দনা, যখন তখন রেগে ওঠে। মেজাজ হারায়। উদাসকে কথা শোনায়। বক্র কথাবার্তা বলে। উদাস চুপচাপ থাকে। যেন সে একটা মৃতদেহ।

একদিন প্রসবযন্ত্রণা উঠল বন্দনার। এর জন্য আগের থেকে প্রস্তুত ছিল উদাস। বেঙ্গল নার্সিং হোমে সীট বুক করেছে। আগাম টাকা জমা দিয়েছে। সে ফোন করল নার্সিং হোমে। চটপট ওরা চলে এল। সঙ্গে এ্যাম্বুলেন্স। গাড়িতে দুজন পুরুষ। একজন নার্স। ওরা স্ট্রেচারে শুইয়ে নিল বন্দনাকে। তারপর গাড়িতে ওঠাল। বন্দনা কাঁদছে। ভয় পেয়েছে। উদাসকে বলছে—আমি আর বাঁচব না। শাশুড়ী মা বললেন—ভয় কি মা? সব ঠিক হয়ে যাবে। সব মেয়ের এসময়ে কষ্ট হয়। উদাস বলল—তুমি ঠিক বাঁচবে বন্দনা। কোলে বাচ্চা নিয়ে ফিরবে। কোন ভয় নেই। আমরা সবাই আছি তোমার পাশে। দেখতে দেখতে বুবুন এসে গেল। ঠিক খবর পেয়ে গেছে সে। এসে বলল—উদাসদা কোন চিন্তা নেই। আমি বৌদির সঙ্গে যাচ্ছি। আজই তুমি ভাল খবর পাবে! মিষ্টি রেডি রাখ আমার জন্যে। একটা নয়, অনেক খাব।

—তোর ইচ্ছেমতো খাবি।

বন্দনা বলল—আমি মরে গেলে তুমি কি আবার বিয়ে করবে? তার কথা শুনে হেসে ফেলল উদাস। সে বলল—আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়লাম তো! তোমাকে যে ভালবাসে, সে আর কাউকে বিয়ে করতে পারে? সম্ভব?

বুবুন বলল—সিনেমার ডায়লগ চলছে।

॥৩২॥

বন্দনার বাচ্চা হল। কন্যাসন্তান। উদাস বড়ই খুশি। তার মা ফিরে এসেছেন। নিশ্চয়ই এসেছেন। আবার কি চাই তার? সে বলল মনে মনে—মাগো, মা, আমি চেয়েছিলাম তুমি ফিরে এস, তুমি আমার প্রার্থনা শুনেছ। তুমি দয়া করে এসেছ। মা তুমি দয়াময়ী।

কিন্তু মেয়ে হওয়াতে বন্দনা খুশি নয়। একদম নয়। তার মুখময় আষাঢ়ের ঘন মেঘ। উদাসের কাছে তার হার হয়ে গেল। সে চেয়েছিল পুত্র। উদাস ভাবল, এমন করছে কেন বন্দনা? সে তো নিজে মেয়ে। তাহলে মেয়ে হয়ে একজন মেয়ের আগমনকে কেন মেনে নিতে পারছে না? বিস্ময়কর।

উদাস এত খুশি হল, সে তার খুশিকে মোবাইলে ছড়িয়ে দিল। ওপাশ থেকে সে বলল—হ্যালো।

—আশালতা, আমি উদাস। তা তুমি কেমন আছ?

—ভাল উদাস। বেশ আছি।

—শোন, একটা খবর আছে দারুণ।

—কি?

—আমি বাবা হয়েছি। উদাস মণ্ডল বাবা হয়েছে। আমার কন্যাসন্তান হয়েছে। তোমার মেয়ে, আমারও মেয়ে। চমৎকার ব্যাপার বল?

—অভিনন্দন উদাস। বন্দনা কোথায়?

—বেঙ্গল নার্সিং হোমে।

—ঠিক আছে। আমি একবার ওকে দেখতে যাব।

বন্দনাকে নার্সিং হোমে দিন দশ থাকতে হল। সিজারিয়ান কেস। তাকে দেখাশোনার অভাব নেই। রাণী যাচ্ছে, বুবুন যাচ্ছে, শাশুড়ী যাচ্ছেন, উদাস তো আছেই। এছাড়া নার্স দিদিমণি। বেশ ভাল। আন্তরিক ব্যবহার। এই দশদিনে দুবার নার্সিং হোমে আশালতা দেখা করে গেছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে ফুলের স্টিক। রজনীগন্ধা। অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে মিষ্টি ফল হরলিক্স। বন্দনা বলল উদাসকে—

—দেখা করতে এসেছে কেন? আমাকে দেখার কি দরকার ওর? আমার মেয়ে হয়েছে বলে?

—এ কি কথা বলছ বন্দনা! তোমাকে ভালবাসে আশালতা, স্নেহ করে। তাই দেখা করতে এসেছে। এতে কোন দোষ নেই। তুমি ব্যাপারটা খারাপভাবে নিচ্ছ কেন? ভুল বুঝছ কেন?

—আমাকে কেউ দেখতে আসুক, আমি তা চাই না।

—তুমি না চাইলেও, তারা আসবে। তুমি কি তাদের বারণ করতে পার! না করা উচিত! তোমার মনটা এমন হয়ে যাচ্ছে কেন বন্দনা।

—আমার মন নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তোমার নিজের মনটা দেখ।

এরপর বাড়ি এল বন্দনা। বেশ রোগা হয়ে গেছে। শরীরে রক্তের অভাব। আয়রণের ঘাটতি। চোখমুখ বিশুষ্ক। একটা বাচ্চা প্রসব করে বেশ ঘায়েল হয়ে পড়েছে বন্দনা। ডাক্তার ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন একগুচ্ছ। বলেছেন—পূর্ণ বিশ্রাম। পুষ্টিকর খাদ্য খাবে অথচ সহজপাচ্য। ডিম দুধ ফলমূল খাবে। মন ভাল রাখবে। হাসিখুশি থাকবে। আস্তে আস্তে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। বাচ্চা হলে সব মেয়ের শরীর ভেঙে যায়। আবার ঠিক হয়ে যায়।

শাশুড়ী খুব যত্ন করছেন। যতই হোক নিজের মেয়ে বলে কথা। তারপর বন্দনার আশ্রয়ে আছেন ওঁরা। বন্দনা বলল—মেয়ে আমার মতো দেখতে হবে না। গায়ের রং কালোর দিকে। তোমার সঙ্গে মিল আছে।

উদাস বলল—আমার মেয়ে আমার মতো হবে না? শুনেছি, মেয়েরা পিতৃমুখী হলে সুখী হয়।

—ছাই হয়। কচু হয়। কি জানি কেন, এই কন্যার জন্মে একেবারে সুখী হতে পারছে না বন্দনা। তা মেয়েটার দোষ কি! একটা কথা মনে হল উদাসের। সংসারে মেয়েদের যে এত নেহস্থা, এত অপমান, এত অত্যাচার সইতে হয়, তার মূলে নারীরা। মেয়েরাই মেয়েদের দুর্গতির কারণ। পরস্পর চিরকালের শত্রু।

আবার একদিন এল আশালতা। সঙ্গে বেতের ঝুড়ি। মিষ্টি, ফলমূল। মেয়ের জন্যে তিনসেট জামা। বন্দনা বলল—এসব কেন আবার?

—আমি মেয়ের পিসি। আনব না? আমার অধিকার নেই? তা উদাস মেয়ের কি নাম রাখলে?

—বন্দনার মেয়ে, তাই বিন্দিয়া। ডাক নাম বিন্দু। কেমন?

—এককথায় চমৎকার।

আবার একদিন এল আলতা। এখনও শ্বশুর-শাশুড়ী যাননি উখরা। বিন্দুকে দেখার নাম করে এক দুপুরে তার আসা। উদাস বলল—এস, এস আলতা।

একথা সেকথার পর আলতা বলল জামইবাবু, কই মা বাবা তো উখরা গেলেন না। ওঁরা কি যাবেন না? স্বীকার করছি, ওঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিনি। আপনি তো জানেন, আপনার শালাবাবু, মাথা গরম করা লোক। মেজাজী। একবার রাগ হয়ে গেলে যা তা বলে, যা তা করে। জানেন, কতদিন ওর হাতে মার খেয়েছি! যা

মারে তা আপনি চোখে দেখতে পারবেন না। আপনি কি মা বাবাকে বলেননি উখরা যেতে?

—না এখনো আমার বলা হয়নি। এই বলব বলব করছি। ঠিক পরিস্থিতি পাচ্ছি না। আলতা যা বলল, উদাস তা বিশ্বাস করল না। শক্তিমানের সাধ্য কি, আলতার গায়ে হাত তোলে? আলতার বাবা ঐ এলাকার এক মাফিয়া। বলেছে বন্দনা। শক্তিমান যদি কাউকে মারধোর করে, তাহলে সে তার মা বাবার গায়ে হাত তুলবে।

আলতা আবার বলল—মা বাবা চলে আসাতে ও আমাকে দুষছে। আমাকে গালমন্দ করছে। জামাইবাবু, আপনি আমাকে বাঁচান। বুঝিয়ে সুঝিয়ে একবার ওদের উখরা পাঠিয়ে দিন। দয়া করুন আপনি।

—ঠিক আছে, এবার বলতে হবে। বলব। তবে রাতারাতি কাজ হবে না। তোমাকে ধৈর্য্য ধরতে হবে। এসব মনের ব্যাপার। জোর করে কিছু করা যাবে না।

বন্দনা বলল—তোমাদের উদ্দেশ্যটা কি বল তো আলতা? মা বাবাকে নিয়ে যেতে এত জেদাজেদি কেন? তোমাদের কি কোন গোপন ব্যাপার আছে? মতলব আছে?

—কি সব বলছেন দিদি! এসব কথা শুনলেও পাপ! আসল কথা কি জানেন, উখরার লোকেরা আমাদেরকে ছিঃ ছিঃ করছে। বলছে, রোজগেরে ছেলে থাকতে, বউমা থাকতে, মা বাবাকে কিনা আশ্রয় নিতে হল মেয়ের বাড়িতে! জামাইয়ের রোজগারে খেতে হবে! এমন ছেলে বউ থাকার থেকে না থাকাই ভাল।

—লোকে তো ঠিকই বলছে। বলার মধ্যে ভুল কোথায়? অন্যায় কি?

—দিদি, বদনাম নিয়ে কি বাঁচা যায়? কলঙ্ক নিয়ে কি থাকা যায়? আমরা একটা প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ চাইছি। তা কি পাব না?

—দেখ আলতা, আমি মা বাবাকে কিছু বলতে যাব না। ওদের ইচ্ছে হলে যাবেন, না হলে যাবেন না। আমার কিছু করার নেই। তোমরা যত সাধাসাধি করবে, তত বাবা-মার সন্দেহ বাড়বে। তার চেয়ে চুপচাপ থাক।

উদাস বলল—সেই ভাল আলতা। আমি কিছু বলতে যাব না। বলাটা বোধহয় ঠিক হবে না। ওরা যা ভাল বুঝবেন করবেন। আমি জামাই মানুষ, এসব ব্যাপার তোমাদের আভ্যন্তরিণ ব্যাপার, আমি নাক গলাতে যাব কেন? বন্দনা ঠিকই বলেছে। আপাততঃ তোমরা চুপচাপ থাক; পরে দেখা যাবে।

তাহলে জামাইবাবু আমি চলি। এখন ট্রেন আছে, ধরেনি।

—কি বলছ আলতা! এত রোদ গরমে কোথায় যাবে? দুপুরে খাওয়া দাওয়া কর। বিশ্রাম নাও। তারপর বিকেলের ট্রেনে যাবে। না হয় সন্ধ্যার ট্রেনে।

বিকেলের ট্রেনে ফিরে গেল আলতা। তার বোধহয় বিশ্বাস ছিল, এবারে সে সফল হবে। মা বাবার কাছ থেকে কথা আদায় করতে পারবে। তার চোখমুখ বিষণ্ণ, হতাশ। কিন্তু কেন? সত্যিই কি আলতা এবং শক্তিমানের কোন পরিকল্পনা আছে? কোন গোপন প্যাঁচ?

॥৩৩॥

মন ভাল নেই উদাসের। একদম ভাল নেই। তার মনে একটা বিষণ্ণতা জন্ম নিযেছে। যাকে বলে ডিপ্রেশন। এটা তার একটা ব্যাধি। কলেজ জীবনে সে মাঝে মাঝে এটা টের পেত। মাঝখানে ছিল না। এখন আবার দেখা দিচ্ছে।

—কি হয়েছে বন্দনার? হদিশ করতে পারছে না উদাস। তার কথায় কথায় রাগ। মেজাজ। তার শরীর দুর্বল বলে এমনটা হচ্ছে কি? সত্যি তো, মানুষের যখন শরীর ভাল থাকে না, সে হতাশ হয়। মেজাজ হারায়। কেমন যেন হয়ে যায। পরিচিত থেকে অপরিচিত।

বন্দনা বাইরের ঘরে বড় খাটে শুত মেয়েকে নিয়ে। তার একপাশে উদাস। বড় খাট। চারজন শোয়া যায়। কোন অসুবিধা নেই। তবু বন্দনা বলল—এ ঘরে আমি থাকব না।

—কেন? কি হয়েছে? বলল উদাস।

—এ ঘরে আমার ভাল লাগছে না। আমার ঘুম হচ্ছে না। আমি মা বাবার পাশের রুমে এবার থেকে থাকব। বলে বন্দনা উঠানের পাশে তৈরি কবা দুটো নতুন রুমের একটাতে চলে গেল। বন্দনা চেয়েছিল, উঠানের ধারে একটা রুম নয়, দুটো রুম হোক। তাই করেছে উদাস। বন্দনার সিদ্ধান্তে হতভম্ব হয়ে গেল উদাস। সে কি উদাসকে এড়িয়ে চলতে চায়? উদাসকে কি তার আর প্রয়োজন নেই? বাধা দিল না উদাস। বাধা দিয়ে কি লাভ! বন্দনা শুনবে? সে কি উদাসকে বুঝবে? সে সবসময় তার জেদ বজায় রাখে। প্রচণ্ড একগুঁয়ে বন্দনা। তাকে নিয়ে ক্লান্ত উদাস। বিষণ্ণ। বিধ্বস্ত। চিন্তাগ্রস্ত।

আজকালকার দিনে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ভাল হয় না। বিয়ের একবছরের মধ্যে তাদের তিক্ততা, হাতাহাতি, মারামারি। তারপর বিচ্ছেদ। কোথায় ভালবাসা? কোথায় প্রেম? সে কি কেবল গল্পে? উপন্যাসের পাতায়? ভাবল উদাস।

অনেকদিন পর উদাস স্টেশনে এসেছে এমন করে সে আসে মাঝে মাঝে। আগে বেশী। এখন কম। এখানে এসে সে একটা মুক্তির স্বাদ উপলব্ধি করে। স্টেশনের

দক্ষিণদিকে তাকালে চোখে পড়বে কয়েকটি বস্তি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে। স্কুলে যখন পড়ত, তখন থেকে দেখে আসছে। এতদিন হয়ে গেল, এত এত বছর পেরিয়ে গেল, এই ঘেটোগুলোর কোন পরিবর্তন ঘটল না। বরং মনে হয়, বস্তির সংখ্যা বাড়ছে। তার মানে, দেশে গরিব লোকের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। এখানে মানুষ অন্ধকারের জীবন যাপন করে। এখানে স্বাস্থ্য নেই, খাদ্য নেই, পানীয় জল নেই, আছে ব্যাধি শারীরিক, মানসিক। আর আছে জন্ম এবং মৃত্যু। এখানেই জন্ম, বস্তিতেই বর্ধন, পরিশেষে মৃত্যু। একই চক্র। এই বস্তিগুলোর কোন বিবর্তন নেই। পরিবর্তন নেই। অথচ পরিবর্তন জীবনের ধর্ম। ইতিহাসের চাকা। উদাস মনে মনে বলল, যেমন সে বলে থাকে মাঝে মাঝে—হে আমার জনমদুঃখিনী দেশ, হে আমার ভারতবর্ষ, কবে তোমার দারিদ্র ঘুচবে? কবে বস্তিজীবন শেষ হবে? দেশের ৭০ ভাগ মানুষ এখনও অর্ধাহারে বা অনাহারে জীবন যাপন করে, এরই বা কবে নিরসন হবে? কত শতাব্দী পরে? আদৌ হবে কি? হে দেশ, তোমার অলঙ্কার কি দারিদ্র্য?

এখন আবার শিল্পায়নের জোয়ার। উর্বর কৃষিজমি জোর করে কেড়ে নেওয়া। চাষীদের কিছু আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া। যারা তা মানছে না, নিচ্ছে না, তাদের জন্যে বুলেটের ব্যবস্থা। এমনি করে সারা দেশজুড়ে যদি হাজার হাজার কৃষিজমি কেড়ে নেওয়া হয়, তাহলে খাদ্যশস্য কোথায় উৎপাদন হবে? আকাশে? দেশে জনসংখ্যা বাড়ছে, হু হু করে বাড়ছে, তাদের মুখে অন্ন তুলে দিতে হবে? সে অন্ন আসবে কোথা থেকে? কোন্ মন্ত্রে? তাহলে কি, তাহলে কি, পলাশী যুদ্ধের ১৩ বছর পর ১১৭৬ বাংলা সনে যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ নেমে এসেছিল, যার ফলশ্রুতি বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ স্রেফ না খেয়ে মারা গেল অথবা ১৯৪৩ সালের ঘটনা, ৫০ লাখ মানুষ না খেয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কি আবার? উদাস শিউরে ওঠে। দেশে কি অকৃষি জমির অভাব? কত চাই? তাহলে কেন এমন চলছে? এমন হবে? বস্তির উন্নয়ন হয়নি ঠিকই, কিন্তু শহরের রেল স্টেশনের উন্নতি ঘটেছে অনেক। নতুন প্লাটফর্ম হয়েছে একাধিক। ওভার ব্রীজ। বড় টিকিটঘর। রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা। কম্পিউটার। সব আধুনিক পদ্ধতি। দূরপাল্লার গাড়ি বেড়েছে। পাটনা জামশেদপুর অন্ধ্রপ্রদেশ তামিলনাড়ু। মানুষ স্টেশনে ভীড় করছে আগের থেকে বেশি।

স্টেশনের পশ্চিমদিকের শেষে একটা সিমেন্টের বেঞ্চে বসে উদাস। এ জায়গাটুকু বড় প্রিয় উদাসের। এই বেঞ্চে বসে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছে। তখন সে বেকার। মাথার উপর নিমগাছ। সে গাছ এখন বেশ ডাগর-ডোগর হয়ে উঠেছে। সে হাওয়া ছড়ায়, পরিবেশ দূষণমুক্ত করে। কত কি ঘটে গেল তার জীবনে।

প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি হল। মা চলে গেলেন। তার আগে বাবা। সে বিয়ে করল বন্দনাকে। বাড়ি কিছুটা ভেঙে পুরনোর সঙ্গে নতুন মিশিয়ে ঘর হল। কন্যা হল। বিন্দুকে খুব ভাল করে মানুষ করবে উদাস। তাকে লেখাপড়া শেখাবে। গান শেখাবে। নাচ শেখাবে। সে একদিন অধ্যাপিকা হবে অথবা কোন স্কুলের শিক্ষিকা। মাথার উপর নিমগাছ থেকে প্রাচীন পাতা ঝরে পড়ে। উদাসের মাথায় অথবা পায়ের কাছে অথবা দূরে। ঝরাপাতা। প্রবীণ চলে যায়, নবীন আসে।

নিজে যা হতে পারেনি, বিন্দুকে তাই করবে। বিন্দুর জন্ম বন্দনাকে আনন্দ দেয়নি। বিন্দু মেয়ে বলে কি সে মানুষ নয়? অদ্ভুত ব্যাকডেটেড আইডিয়া বন্দনার। এর কোন যুক্তি আছে? যত রাজ্যের কুসংস্কার। বিদ্যাসাগর, আবার তোমার জন্ম নেওয়া প্রয়োজন। এখনও বাড়িতে প্রাইভেট কোচিং চালিয়ে যাচ্ছে উদাস। এখন ছাত্রছাত্রী বেশ। উদাস পড়ায় ভাল। তাকে অনেকে মাস্টারবাবু বলে। এই সম্বোধনে উদাস গর্বিত বোধ করে। নিজেকে সম্মানিত মনে করে।

বেঞ্চে বসে উদাস। সে নিমগাছকে আশ্রয় করে বসে আছে। উদাসের মধ্যে এক বিপন্নতা এখন। নিজের মধ্যে সংগ্রাম। কেন সে সুন্দরী বন্দনাকে নিয়ে সুখী হতে পারে না? সুন্দরী বন্দনার কত পরিবর্তন ঘটে গেল। দেহে এবং মনে। তিনদিন আগে বন্দনা কত কি বলে গেল! এসব বলার কোন মানে হয়! কোন ভিত্তি আছে? কোন সত্যতা? সে কি বলছে তার অর্থ জানে? বন্দনা বলল—

—তোমার কাছে আমি জানতে চাই।

—কি জানতে চাও বল?

—তোমার সঙ্গে আশালতার কিসের সম্পর্ক?

—বিশেষ কোন সম্পর্ক নয়। আশালতা আমার সহপাঠিনী, ব্যস, এইটুকু।

—কেন সে শ্বশুরবাড়ি যায় না? কেন এখানে পড়ে আছে?

—এটা তাদের পারিবারিক ব্যাপার। সে শ্বশুরবাড়িতে থাকবে, না বাপের বাড়িতে থাকবে, তারাই ঠিক করবে। শুধু জানি, আশালতার সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক ভাল নয়। তার স্বামী আশালতার উপর অত্যাচার করে। কেন আশালতা অত্যাচার সইবে? তার স্বামীকে অত্যাচার করার অধিকার কে দিয়েছে? তবে এটা কোন আশ্চর্য ঘটনা নয়। আজকালের দিনে ৯০ ভাগ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই হাল। অত্যাচার, ঝগড়া, মারামারি লেগেই আছে।

—আমার মনে হয় আশালতা এখানে থাকে তোমার জন্যে। তোমাদের মধ্যে গোপন প্রেম আছে। আমি মরে গেলে তুমি ওকে বিয়ে করবে।

—ছিঃ বন্দনা, এসব কথা বলে! একথা বলে তুমি আমাকে অপমান করছ, আশালতাকে করছ, নিজেকেও করছ।

—গায়ে লাগছে বুঝি?

—মিথ্যে বলেই লাগছে। সত্যি হলে লাগত না। আমি মিথ্যা কথা বলি না, তুমি জানো। যদি কখনো বলে থাকি, অন্যের উপকারের জন্যে। কাউকে বাঁচাতে।

—ওঃ কি সত্যবাদী! একেবারে মহাভারতের যুধিষ্ঠির এলেন! সাধুপুরুষ! মহাপুরুষ! বলি, রাণীর সঙ্গে কেন এত ভাব তোমার? কেন রাণী এত করে! যখন তখন আসে। সব কিছুতে মাথা হয়ে দাঁড়ায়। বলি, ভিতরের ব্যাপার কি?

হেসে উঠল উদাস—এবার তুমি আশালতাকে ছেড়ে রাণীকে নিয়ে পড়লে! পারোও বটে তুমি!

—একদম কথা ঘোরাবে না। স্পষ্ট জবাব চাই।

—রাণী আমার বোনের তুল্য। তুমি দেখনি, প্রতিবছর ও আমাকে ভাইফোঁটা দেয়?

—সে তো লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্যে। লোকে আসলটা বুঝতে যেন না পারে। প্রায় রাণী এসে আমাকে উপদেশ নির্দেশ দেয়। কিন্তু কেন?

—তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে, সে তোমার রাণীর জন্যে। তোমরা কি আমাকে চিনতে? আমি চিনতাম তোমাদের? রাণী তোমার পর নয়। তরুণের সূত্রে ও তোমাদের আত্মীয়। উপদেশ দেয় বলছ, ও তোমার চেয়ে বয়সে বড়। জীবনে অনেক ধাক্কা খেয়েছে, ঝড়-ঝাপটা সয়েছে। শুধু মনের জোরে, জেদের জোরে, রাণী এত বড় হতে পেরেছে। ওর দোকানে এখন একুশখানা মেসিন। একুশজন মেয়ে রাণীর দৌলতে রোজগারের মুখ দেখেছে। তারা তাদের সংসারকে সাহায্য করতে পারছে। আগে তরুণের কি ছিল? রাণী তাকেও 'রাণী বস্ত্রালয়'-এর মালিক করে দিয়েছে। এগুলো তুচ্ছ করছ কেন?

—রাণীর প্রতি তোমার অসীম মমতা। এত মমতা কিসের?

—তোমার সব সন্দেহ ভিত্তিহীন বন্দনা। তোমার শরীর দুর্বল, তাই মনও দুর্বল, তার থেকে এইসব ভাবনা চিন্তা। এসব দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিও না। মন থেকে মুছে ফেল। নইলে তোমার ক্ষতি হবে।

—আমি নিশ্চয় জানি, তুমি চরিত্রহীন লোক। তুমি আমার চেহারাকে বিয়ে করেছ, আমার মনকে নয়।

—তোমার সবকিছুকে নিয়ে তুমি। আমার মনে তুমি ছাড়া কেউ নেই। তোমাকে আমি সুখী করতে চাই। নিজে সুখী হতে চাই।

—তোমাকে বিয়ে করে, কোন মেয়ে সুখী হতে পারে? আমি সুখী নই। তুমি আমাকে ভালবাস না। তুমি রাণীকে, আশালতাকে ভালবাস। যে পুরুষ নিজের স্ত্রী

থাকতে, অন্য মেয়ের দিকে ঢলে, সে একটা শয়তান। রাণী তোমার রক্ষিতা। নিজের কান চেপে ধরল উদাস। কাতর কণ্ঠে বলল—তোমার পায়ে পড়ি বন্দনা, এমন করে বলো না। রাণীকে কলঙ্ক দিও না। তোমার পাপ হবে। ভয়ঙ্কর পাপ। পৃথিবীর সব ফুলের গন্ধ দিয়ে তোমার হাত পরিষ্কার করলেও, তোমার হাতের দুর্গন্ধ যাবে না। উদাসের কথা শুনে বন্দনা রেগে গেল। রাগে সে তম্‌তম্‌ করতে লাগল। নিজেকে বড় অসহায় অনুভব করল উদাস। মনে হল, তার পায়ের নিচে মাটি নেই। সে শূন্যে ঝুলছে। পরে একসময় সে বলল বন্দনাকে—তুমি কি জানো, রাণীর দুঃখের খবর।

—কি?

—রাণী বন্ধ্যা। ওর কোন বাচ্চা-কাচ্চা হবে না। বাচ্চা হচ্ছে না বলে রাণী ডাক্তার দেখিয়েছিল। ডাক্তারী রিপোর্ট, তরুণ সুস্থ, কিন্তু মা হবার উপযুক্ত নয় রাণী। ওর শরীরে ঘাটতি আছে। তরুণ আমাকে খবরটা দিয়েছে।

—ঠিক হয়েছে। আচ্ছা হয়েছে। হাততালি দিয়ে উঠল বন্দনা।

—তুমি এটা নিয়ে আনন্দ করছ বন্দনা! রাণীর কথা একবার ভাব। কত বেদনাবহ খবর ওর কাছে! মা হতে না পারলে একটা মেয়ের রইল কি? শুধুই শরীর। তা দিয়ে কি হয়! কোন্ কাজে লাগে?

—রাণীদি পাজী মেয়ে। ভগবান ওকে জব্দ করেছে।

হতাশ হয়ে গেল উদাস। বন্দনাকে কিছুতেই বোঝান যাবে না। এইভাবেই কি উদাসের জীবন কাটবে? বাঁচার এত যন্ত্রণা সে সইবে কি করে? বন্দনা কি ছিল, কি হয়ে গেল! এত ক্ষুদ্রমনা বন্দনা? এত নীচ! হায়, কোন্ মেয়েকে সে বিয়ে করেছে!

পূর্বপ্রান্ত থেকে একটা মালগাড়ি ছুটে এল। বেশ জোরে জোরে। ডিজেল ইঞ্জিন। মহা শক্তিধর। স্টেশন কাঁপছে। এ স্টেশ্‌নে সে দাঁড়াবে না। দাঁড়াবার কথাও নয়। মালগাড়িটা কোথায় যাচ্ছে জানে উদাস। সে যাচ্ছে কলিয়ারী ফিল্ডে। পেটে কয়লা ভরে নিয়ে আসবে। তারপর সে কয়লা যাবে দূর-দূরান্তে। সে কয়লা গরিবের উনান জ্বালাবে। তার জীবনের মতো ধোঁয়ায় ভরবে চারদিক। কলকারখানা সে কয়লায় সচল হবে। শ্রমিক উৎপাদন করবে। মানুষ কিনবে সে দ্রব্য।

সূর্য অস্ত যাচ্ছে পশ্চিম দিকে। প্রায় অন্ধকারের চাদর টেনে লাল বলের মতো দ্রুত বিদায় নিচ্ছে সূর্যদেব। আবার কাল তার দেখা মিলবে। দেখতে দেখতে অন্ধকার চিলের মতো দ্রুত নেমে এল। স্টেশনে টিউবলাইট, হ্যালোজেন জ্বলে উঠল। আলোর বন্যায় স্টেশন ঝকঝক করতে লাগল। চেনা স্টেশন অচেনা হয়ে উঠল।

উদাস ভাবছে, বন্দনার বড় ইচ্ছে, উদাস একটা চারচাকা কেনে। উদাস পরিহাস করে বলেছিল, হ্যাঁ সে কিনবে চারচাকা। সেটা ছিল কথার কথা। এখন মনে হল, বন্দনা যখন চেয়েছে, সে ঠিক কিনে দেবে। তবে এখন নয়। এখন সে পারবে না। বছর দুই পরে। গাড়ি কিনলে নিশ্চয় খুশি হবে বন্দনা। আনন্দে হাততালি দেবে। কিন্তু সে আবার অন্য কথা বলবে না তো? বলতে পারে—এ গাড়ি তুমি আমার জন্যে কেননি। কিনেছ আশালতার জন্য, রাণীর জন্য। আমি এ গাড়িতে চড়ব না। তুমি তাদেরকে নিয়ে আনন্দ ফূর্তি করে বেড়াও। লোকে দেখুক আমি যা বলেছি, তা সত্যি কিনা, লোকে বিচার করুক।

বন্দনার মনের গঠন এমনই এখন, যে কোন কটূক্তি সে করতে পারে।

কত স্বামী তার স্ত্রীদের ওপর অত্যাচার করে। এর মধ্যে শিক্ষিত লোকের সংখ্যাই বেশি। কেউ কেউ আবার ডক্টরেট। হয় মানসিক পীড়ন নয় দৈহিক। মেয়েদের ওপর অত্যাচার করা, তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া, বাধ্য করা, এখন সমাজের লেটেস্ট ফ্যাসন। স্টাইল। প্রতিযোগিতা চলছে স্বামীদের মধ্যে। তার পিছনে আছে নিশ্চিত কোন নারী। কিন্তু উদাস তো কোন অত্যাচার করে না। উদাসের ধারণা ছিল, তার জীবনের সব দুঃখ শেয়ার করে নেবে বন্দনা। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের প্রতি এটাই কর্তব্য। কিন্তু একি হল! সত্যনাশ হয়ে গেল! আর কত অপমান সহ্য করবে উদাস? আর কত অপমান করলে বন্দনার আনন্দকলস পূর্ণ হয়ে উঠবে? আর কতবার সে বলবে, "তুমি একটা লম্পট, মেয়েখোর, মাতাল, টাকা চুরি কর দেবেশবাবুর ব্যবসা থেকে।" উদাস বলে মনে মনে—এসব কি বলছ তুমি বন্দনা? তুমি যা বলছ, তার মানে জানো? তোমার কথা যদি একটাও সত্যি হতো, আমি তোমাকে সেকথা বলার সুযোগ দিতাম না। আমার মাথা এবং শরীর আলাদা হয়ে লাইনের দুদিকে পড়ে থাকত। তোমার সব কথা ভুল বন্দনা! অসত্য। মিথ্যে অপবাদ।

বন্দনা স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করে। সে তার মা-বাপাকে আশ্রয় দিয়েছে। এ নিয়ে কোনদিন কোন কথা বলেছে কি উদাস? না, বলেনি। ওর বাবা-মা সারাজীবন থাকুন ওর বাড়িতে। হাসিমুখে সে দায়িত্ব বহন করে যাবে উদাস। বন্দনার বাবা-মা মানে তারও বাবা-মা। উদাস কাউকে দুঃখ দিতে চায় না। কষ্টও না। কেন সে দেবে?

অনেক সময় কেটে গেল স্টেশন চত্বরে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে। কিন্তু মন চায় না ফিরতে। বাড়ি ফিরলে দেখবে বন্দনার থমথমে মুখ। উদাসকে দেখলে তার একরাশ বিরক্তি। তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ করা। সুযোগ পেলেই তাকে অপমান করা। নির্মম সে অপমান।

কিন্তু রাণী বা আশালতাকে সে কি করে ত্যাগ করবে? রাণী তার সুখ-দুঃখের সঙ্গী। সবসময় পাশে পাশে থাকে। কোন ঘটনা ঘটলে দৌড়ে আসে। এমন মানুষকে ত্যাগ করা সম্ভব? আশালতা তার সহপাঠিনী। বান্ধবী। তার জীবনকে ঘিরে ওদের অবস্থান। বিনা কারণে কাউকে ত্যাগ করা শাস্ত্রবিরোধী। ধর্মবিরোধী। উদাস অধার্মিক হতে পারে না। কিছুতেই না।

তবু ঘর ফিরতে হবে উদাসকে। অন্য কোথাও পালিয়ে গেলে চলবে না। তার কন্যা আছে। বিন্দুকে বড় করতে হবে, মানুষ করতে হবে, স্কুল বা কলেজের শিক্ষিকা করতে হবে। উদাস যদি অন্য কোথাও চলে যায়, চাকরি ছেড়ে দেয়, তাহলে কি খাবে বন্দনা? কি খাবে তার বাপ-মা? অনাহারে তারা যে মারা যাবে! তা হতে দিতে পারে না উদাস। সেটা যে পাপ। অন্যায়। সিমেন্টের বেঞ্চ থেকে উঠে পড়ল উদাস। গুটি গুটি পায়ে গেট অতিক্রম করে, টিকিটঘরকে পিছনে ফেলে, স্টেশনের বাইরের উঠানে সে পা দেয়। এই স্টেশনের স্টাফরা সকলে চেনে উদাসকে। তারা জানে, এই মানুষটা মাঝে মাঝে স্টেশনে চলে আসে। স্টেশনের একপাশে পশ্চিমদিকের শেষ বেঞ্চে বসে বিশ্বসংসার দেখে আর কি যেন ভাবে।

উদাস রাস্তায় পা রাখে। দুদিকে সারি সারি রিক্সা। আর মিনিট পনেরো পরে একটা ট্রেন আসবে। তার সওয়ারিদের নিয়ে রিক্সাগুলো ছড়িয়ে যাবে শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। ঘনঘন বাজবে হর্ণ অথবা বেল।

উদাসের বাঁদিকে কয়েকটা দোকান। হরেক কিসিমের। একটা চায়ের দোকানে লোকে চা খাচ্ছে। পাশে লাটকনার দোকান। সেখানে অনেক লোকে মাল কিনছে। তার পাশে মনোহারি। সেখানেও ক্রেতা। সন্ধ্যা থেকে এইসব দোকানে কেনাবেচা বেশি। রাস্তার মোড় ছাড়িয়ে উদাস পূর্বদিকে চলল। তার বাঁদিকে নিষিদ্ধ পল্লি। সারাদিন এ পল্লি ঘুমায়। সন্ধ্যা হলে কথা কয়। তখন সমাজে ব্রাত্য নারীরা সাজগোজ করে। কপালে চকচকে টিপ দেয়। মুখে পেন্ট করে। চোখে গভীর কাজল। তারপর ঝলমলে সিন্থেটিক শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে ঘরের বাইরে। তার অন্নদাতার অপেক্ষায়। কোন কোন ঘর থেকে হারমোনিয়ামের সুর ভেসে আসে। ঘুঙুরের বোল। কোন মেয়ে গাইছে। নাচছে। কি গাইছে? ঠুংরি কি?

মনে মনে বলল উদাস—বন্দনা, তোমার কাছে যে আমার কোন মূল্যই নেই। এখন আমি কি করব? বন্দনা, আমি আশালতা রাণী জুঁই কাউকেই ভালবাসি না। একসময় তুমি জুঁইকেও ইঙ্গিত করেছিলে। শুধু ভালবাসি তোমাকেই। তোমার ভালবাসা না গেলে আমি যে মরে যাব! আমার কি উপায় হবে বন্দনা?

কিছুটা হাঁটতে উদাসের নজরে পড়ে গেল তার নিজের বাড়ি। সেঁজুতি। দোতলার জানলা খোলা। রাস্তার হ্যালোজেন লাইটে বাড়িটা যেন ধুয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে বাড়িটা রং করেছে উদাস। আগাগোড়া দামি পেন্ট দিয়ে। কি সুন্দর বাহারী সে রং। বাড়িটার চেহারাই বদলে গেছে। চেনা দায়। কঠিন।

কিছুক্ষণ উদাস থমকে দাঁড়িয়ে রইল। তার বাড়িটাকে মন দিয়ে দেখল। খুঁটিয়ে দেখল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর মনে মনে বলল উদাস, এই আমার স্বপ্নের বাড়ি। এই আমার দুঃখের ঘর।

————